সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : XI, Issue : XXIII
10 May, 2025

মনোজ মিত্র স্মরণ সংখ্যা

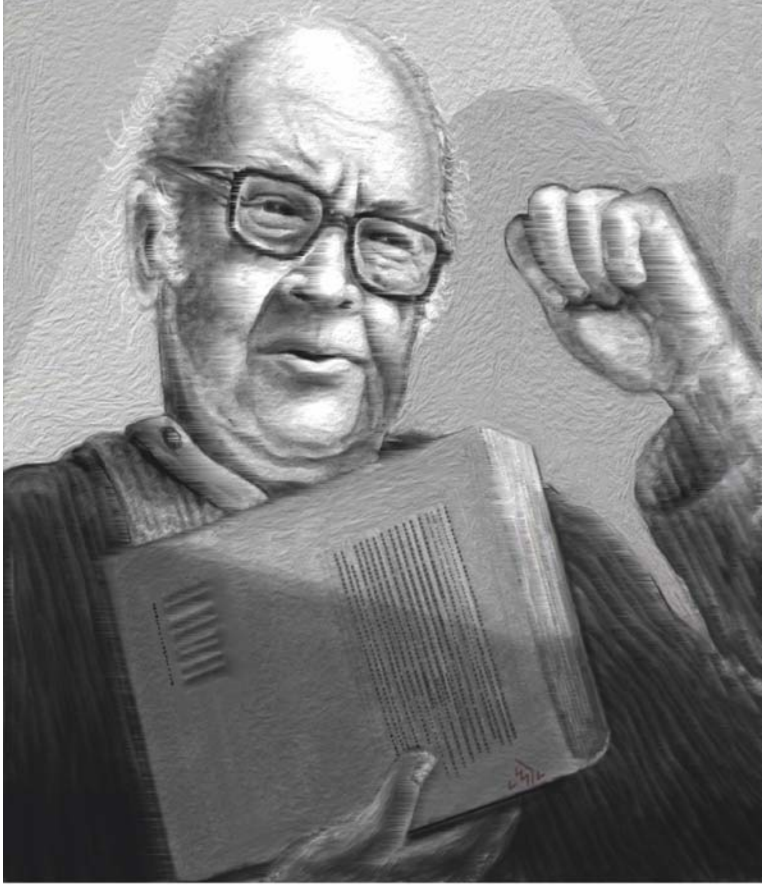

সাহিত্য অঙ্গন • মনোজ মিত্র স্মরণ সংখ্যা

SAHITYA ANGAN

R : 300.00

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal

Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad–828127, Jharkhand

ISSN : 2394 4889 Vol : XI, Issue : XXIII, 10 May, 2025

কয়েকটি মুহূর্তে মনোজ মিত্র—

Published by : Dr. Jaygopal Mandal
Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad–828127, Jharkhand
Mobile No. 9830633202 / 7003488354
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : XI, Issue : XXIII 10 May, 2025

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

কার্যকরী সম্পাদক

ড. জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০৯

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual
Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : XI, Issue : XXIII 10 May, 2025

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Working Editor :
Dr. Jayanta Sinha Mahapatra

© Publisher

Cover Drawing : Pradip Sarkar

Type Setting & Cover Setting :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
Granco Press

Price : 300.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P. S. Saraidhela, Dhanbad-828109
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U. P.
Prof. (Dr.) Barendu Mondal, Dept. of Bengali, Jadavpur University
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Sahitya Academy Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, Bankura University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Working Editor :

Dr. Jayanta Sinha Mahaptra, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Working Editorial Board :

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Kutubuddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W. B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay, Dept. of Bengali, Saltora Netaji Centenary College, Bankura
Dr. Ujjwal Pramanik, Dept. of Bengali, Saltora Netaji Centenary College, Bankura
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Dr. Soma Mukherjee, Hridaypur, North 24 Parganas

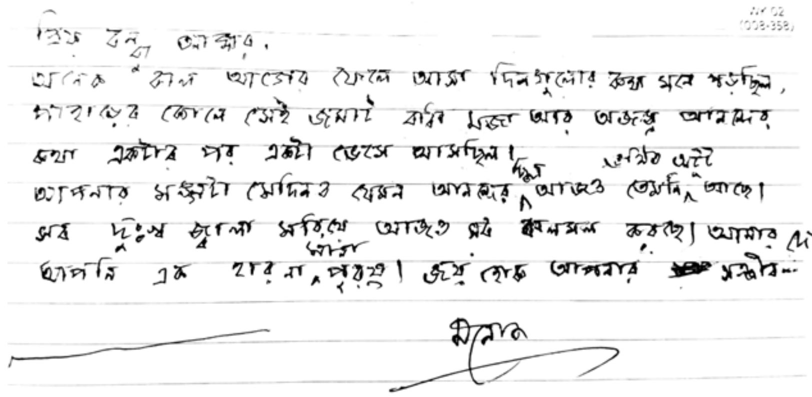

প্রিয় বন্ধুবর [illegible],
অনেক কাল আগের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল,
পাহাড়ের কোলে সেই জমাট বাঁধা মজা আর অজস্র আনন্দের
কথা একটার পর একটা ভেসে আসছিল। কিন্তু [illegible]
আপনার সঙ্গটা সেদিনের যেমন আনন্দের, আজও তেমনি আছে।
সব দুঃখ জ্বালা সরিয়ে আজও সেই ঝলমল করছে। আমার দেখা
আপনি এক [illegible] হারানো পুরুষ। জয় হোক আপনার [illegible]...

[illegible]

ডাইরির পাতায় লেখা মামুনূর রশিদকে লেখা পত্র।

We proud to know that
three articals has been referred from the
'Sahitya Angan' Patrika, Vol. IV, Issue : VIII,
31st July 2018 to 'Ful Futuk', Published by Paschimbanga
Bangla Academy, Tathya Sanskriti Daftar, Govt. of West Bengal,
Edited by Renowned Poet Joy Goswami on 12th
February 2019. Except this fact
our jurnal honoured by
many Researchers.
They teke evidence as
reference from this journal. In this rescept the
'Sahitya Angan Patrika' may be honoured as referred journal.

সূচি

পুরাতনের পাতা থেকে :
কুমার রায়।। মনোজের মনোভূমি / ৯
মনোজ মিত্র।। বাংলা মৌলিক নাটক / ২২
সাক্ষাৎকার—বিভাস চক্রবর্তী ও চন্দন সেন।। মনোজ মিত্র এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় মুখোমুখি /২৮
আনন্দবাজার অনলাইন সংবাদদাতা / ৩৮
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়।। উৎস : উইকিপিডিয়া / ৪০
স্মৃতিকথা :
শ্যামল সেনগুপ্ত।। অনুভবে সিক্ত স্মৃতি / ৪৩
দুলাল লাহিড়ী।। স্মৃতিকথায় অভিনয় জীবনের গুরু মনোজ মিত্র /৫০
অমর চট্টোপাধ্যায়।। এক নাটককার / ৫২
ময়ূরী মিত্র।। সে বরণে / ৫৫
রজত মল্লিক।। 'মনের মানুষ মনোজ মিত্র' / ৬০
মন ও মননে :
অমর মিত্র ।। সাজানো বাগান শুকোবে না / ৬৭
দেবাশিস মজুমদার।। মনোজ মিত্র : পাঁচ / ৭০
আলোক দেব।। আমাদের বাঞ্ছারাম / ৭৭
অপূর্ব দে।। রামায়ণ—মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক : সর্বকালীন আবেদন / ৯২
জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র।। বুদ্ধদেব থেকে মনোজ মিত্র : এক আশ্চর্য জীবন / ১০৩
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।। মনোজ মিত্রের কয়েকটি নাটকে হাসির উপাদান / ১১১
অহীনা দে।। মনোজ মিত্রের কতিপয় নাটকে প্রতিবাদী নারী / ১১৬
মানিক বিশ্বাস।। নাট্যগীতে সমাজচেতনা : মনোজ মিত্রের সুরেলা বিন্যাস / ১২৩
কেশবচন্দ্র সাহা।। সত্যজিৎ সমীপে অভিনেতা মনোজ মিত্র / ১২৩
জিনিয়া খাতুন।। 'চাকভাঙা মধু' : মননে ও বিশ্লেষণে / ১৩২
জয়ন্ত কুমার মণ্ডল।। মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' : একটি পর্যালোচনা / ১৩৮
নিত্যানন্দ মণ্ডল।। আখ্যানের আলেখ্য : তেঁতুল গাছ / ১৪৪
শর্মিলা ঘোষ।। অলকানন্দার পুত্রকন্যা : এক চিরায়ত মায়ের কথা / ১৪৯
রিজওয়ানা নাসিরা।। 'কিনুকাহারের থেটার' : সাধারণ মানুষের জীবনায়ন / ১৫৪
মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা।। মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিমসাহেব' : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা /১৬২
জয়ন্ত মিস্ত্রি।। নাটকে লোকশিক্ষা : মনোজ মিত্রের 'যা নেই ভারতে' / ১৭০
প্রীতম চক্রবর্তী ।। ভেলায় ভাসে সীতা : কালান্তরের বিনির্মাণ /১৮০
অর্জুন বিশ্বাস।। মনোজ মিত্রের পৌরাণিক নাটকে আধুনিক জীবনের বিনির্মাণ /১৯০
কৈলাশপতি সাহা।। রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে মনোজ মিত্রের দুটি নাটক /২০৫
সাক্ষাৎকার :
সৌরভ চট্টোপাধ্যায়।। কোভিড সময়ে অনলাইনে সাক্ষাৎকার : মনোজ মিত্র / ২১৩
নাট্যপঞ্জি : /২২২

স ম্পা দ কী য়—

বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি সমাজে মনোজ মিত্র এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। ছোট থেকে বড় সকল মানুষের মনে তাঁর উপস্থিতি স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। নায়ক চরিত্র যে মূর্তিতে দর্শক মানসে প্রতিমূর্ত হয় তেমন কোনো চরিত্রে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি, ছোটখাটো শরীরে হয়তো বা কখনো নির্দেশক বা পরিচালকের চোখে তথাকথিত নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হওয়ার কথা ভাবান্তরে আসেনি। ২১ বছর বয়সেই বৃদ্ধের চরিত্রেই তিনি নায়ক হয়েছেন, আর সেক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় অবিসংবাদী ও চমৎকার; দর্শকের হৃদয়ে নায়ক হয়ে উঠেছেন। নাটক ও চলচ্চিত্র উভয়তেই তাঁর প্রকাশ ও সিদ্ধি তুলনারহিত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্তের মতো তিনিও নট ও নাট্যকার। শহর থেকে গ্রাম—গ্রুপ থিয়েটারের খুব কম নাট্যদল আছে যারা মনোজ মিত্র রচিত নাটক প্রযোজনা করেননি। বিশেষত সাধারণ কোনো নাট্য দল যারা প্রথম অভিনয় করতে শুরু করে হয় 'হারানো প্রাপ্তি' কিংবা 'কেনারাম বেচারাম' অথবা 'তেঁতুল গাছ', 'কাক চরিত্র'—এ ধরনের নাটক দিয়ে শুরু করেছে। মনোজ মিত্রের নাটক পাঠে ভেতরে ভেতরে অভিনয় সত্তা জেগে ওঠে, সংলাপের দুরন্ত গতি, সহজ সরল চরিত্রানুগ সংলাপের প্রকাশ—উইট, হিউমার, স্যাটায়ার—ফান সব প্রকারের কৌতুক ও হাসির উপাদানে বেশ মজাদার নাট্যসৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকৌশল। নায়ক না হয়েও যেমন তিনি কখনো ছোট চরিত্রে কখনো বড় চরিত্রে দর্শকের হৃদয় জয় করেছেন, আবার গণনাট্য সংঘের মতো কোনো মতের পথের যাত্রী না হয়েও সমাজসচেতন প্রান্তিক মানুষের কথাকার—স্রষ্টা হিসেবেও অসাধারণ সব নাটক দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অপরাজেয় নাটককার।

অবিভক্ত বাংলাদেশে জন্ম, সেই কাল থেকেই তাঁর সৃজনলীলার সূচনা। স্কুল-জীবনে গল্প লেখায় হাতেখড়ি, পারিবারিক জীবনের নানা স্তর তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরেছে, বিশেষত তাঁর জীবনে ঠাকুরদার জীবনযাত্রার প্রভাব বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছে। তাই হয়তো বৃদ্ধ চরিত্রগুলিতেই তিনি বাঙালির মনের নায়ক। মঞ্চের একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে বন্দি রেখে মঞ্চের সর্বত্র দাপিয়ে অভিনয় করছেন।

তিনি প্রমাণ করেছেন একটা ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসেই অভিনয়কে কোন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। 'বন্ধ দরজার সামনে' ছোট্ট চলচ্চিত্রটি বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ওই অভিনয় জীবন আমারও কাঙ্খিত। কলকাতা দূরদর্শন প্রযোজিত রাজা সেন পরিচালিত, আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার শেখর সমাদ্দারের চিত্রনাট্য 'বন্ধ দরজার সামনে'—এই টেলিফিল্মে বৃদ্ধ পিতার চরিত্রে মনোজ মিত্রের অভিনয় বারে বারে মনকে আকৃষ্ট করে, কেবল বাঞ্ছারাম নয়; বাংলা ও বাঙালির জীবনযাপনে যে

কোনো বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় চরিত্রে তিনি সাবলীল, দক্ষ শিল্পী। ছোট ছোট অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ খুব কম অভিনেতার চলমানতায় দেখা যায়। নাট্যকার হিসেবে যেমন তিনি বিদগ্ধ, স্বতন্ত্র চিন্তার ছাপ রেখেছেন; অভিনয়েও তাঁর ভূমিকা বাঙালি দর্শকের কাছে তার স্বতন্ত্র রূপে আঁকা আছে। সাধারণত নায়ক বা নায়িকা যে অর্থে বাংলা চলচ্চিত্র বা নাট্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন মনোজ মিত্র সেই দৃষ্টিকোণের কোনো অবকাশ রাখেননি। তাঁর চরিত্রগুলি কোনো কল্পিত জগতের নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের সুখ-দুঃখের মালায় গাঁথা প্রান্তিক সমাজের কথা। সেই যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের উপান্ত পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রে চলমানতা, চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত অত্যন্ত সুচারুভাবে হাসির উপাদানে, কখনো গম্ভীর সুরে ধ্বনিত।

একজন অভিনেতার স্বপ্ন রুপালি পর্দায় দাপাদাপি করে বেড়ানো, সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নন তিনি। কিন্তু মঞ্চাভিনয়ে তিনি যেন সবচেয়ে বেশি সচ্ছল ও সাবলীল। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে তিনি নাট্যাভিনেতা ও চলচ্চিত্রাভিনেতার দ্বন্দ্বকেও তুলে ধরেছেন নাটকে—এতটা নিপুণভাবে কোন নাট্যকার দেখাননি। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে মঞ্চাভিনেতার কণ্ঠে তিনি বলেন,

"যে চরিত্রটা আমার মধ্যে ভর করেছে, তার সমগ্র আস্বাদন আমি নেব না? আমার সৃষ্ট মানুষটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতার মাপ রাখবো না? তার সুখ-আহ্লাদ—দুঃখ-বেদনা, তার রুচি অরুচি, বোধবুদ্ধি, তার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সর্বাত্মক আত্মীয়তা পাতাবো না? শিল্পীর বড় পাওনা যে সেটাই। না ভাই, জীবনের এখানে ওখানে ছোঁ মেরে তোমরা একটা বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। খণ্ড জুড়ে কখনো কি পূর্ণকে ধরা যায়? একটা কবিতা খন্ড খন্ড করে পড়া আর গোটাটা একটানা পড়ার মধ্যে ঢের ঢের তফাৎ।"

পরিবারে যাত্রাদল থাকায় অভিনয়ের প্রতি আমার অনুরাগ যেন সহজাত, সেই সূত্রে আমারও মনে নাট্যকার-অভিনেতার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ প্রায়শই থাকে। কলকাতায় শিক্ষা-গ্রহণে এসে প্রতিকৃতির 'কেনারাম বেচারাম' দর্শনে মনোজ মিত্রের সৃজন-সান্নিধ্য লাভ। তারপর সরাসরি সুন্দরম-এ যাওয়া, অকাদেমিতে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা' দেখা, ছাত্র-জীবনেই নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। গড়িয়া নবগ্রাম নাট্যমন্দিরে ১৯৯৭ থেকে নিয়মিত অভিনয় শুরু করি, 'তেঁতুল গাছ' নাটকটির অভিনয় এই ছোট্ট দলটিকে অনন্য জায়গা দিয়েছে। তারপর 'নানা রঙের দিন' করার সাহস অর্জিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সময়ে ছাত্রদের নিয়ে নাটক করতে গেলেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনে পড়ে মনোজ মিত্রের নাটক ও অভিনয় জীবনের কথা। ব্যক্তিগতভাবে দু'বার নাট্যকারের উষ্ণ সান্নিধ্য পেয়েছি। একবার ২০১২ সালে বাসন্তী হাই স্কুলের ৫০ বছর পূর্তিতে, অচেনা এক ব্যক্তির আবেদনে অনেক কম টাকায় নাটক করতে রাজি হয়েছিলেন। আর একবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রিফ্রেশার কোর্শে বিদগ্ধ বক্তা হিসেবে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেছি শুধু। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বছর ধ'রে লেখা যায়। পত্রিকার পাতায় পাতার পর পাতার

সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সময়ের অভাবে সব শ্রেণীর নাটক মূল্যায়ন সম্ভব হলো না, কিন্তু যে যে নাটকগুলোর জন্য তিনি বাঙালির কাছে শ্রেষ্ঠ নাটককার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার আসন লাভ করেছেন, সেগুলি এই সংখ্যার এক একটি ফুল। যেগুলি দিয়ে মনোজ মিত্র সংখ্যার মালাটি রচিত হয়েছে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের এই যে 'চোখে আঙ্গুল দাদা'—যথার্থ শিক্ষক ও সমাজসচেতন স্রষ্টা। প্রসঙ্গত 'হারানো প্রাপ্তি' বা 'কেনারাম বেচারাম' ('হারানো প্রাপ্তি' একাঙ্কের পূর্ণরূপ) নাটকের গভীরে যদি আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাবো যে পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর বড় ছেলের যে ভূমিকা নিখোঁজ পিতার সন্ধানে না গিয়ে পিতার আলমারি ভাঙার তাল খুঁজছে, কেন করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এমন সময় নাট্যকার নগেন পাঁজা নামক এক বিস্ময় চরিত্রের অবতারণা করেন, যিনি নিখোঁজ পিতার বদলি নকল পিতা এনেছেন। এ তার অদ্ভুত জীবিকা। এই যে মূল্যবোধহীন পরিবার—সমাজ—রাষ্ট্র—সেই অবনমন তথা অবক্ষয় এই হাসির ফোয়ারায় উপস্থাপন করেছেন স্রষ্টা। নকল পিতার কণ্ঠে মজার মজার সংলাপ দর্শককে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি বেদনার ঢেউ তোলে মননের অতলে। বড় ছেলের মুখে যখন উচ্চারিত হয় : 'ওরা যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়বে। ঝটপট কাজের কথায় এসো। তুমি কিন্তু আর কোন ছেলেমেয়ের দিকে ভিড়বে না। তুমি আমার... আমার বাবা। আলমারির কাগজপত্র সব আমায় দিয়ে তারপর.....'। উফ ভাবা যায়! এ কোন সমাজ? নাট্যকারের অভিনব কল্পনায় ঘুন ধরা সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। নাটকের অন্তিম পরিণতি আরো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—কেনারাম যখন বেচারাম চাটুজ্জে হয়ে উঠতে পারল না তখন নগেন পাঁজা তাকে দশ মাসের শিশুরূপে সেট করবার মনস্থির করে: "চলুন। আপনাকে সেই কলাবাগানেই ফিট করে দেব। সেই যেখানে দশ মাসের শিশু হারিয়েছে।"—এমন ভয়াবহ প্রহসন কে-ই বা রচনা করতে পারেন? এখানেই নাট্যকার মনোজ মিত্র একক ও অনন্য, স্বতন্ত্র স্রষ্টা।

এমন মানুষ, এমন স্রষ্টা, এমন শিল্পী, এমন আদর্শ শিক্ষক আর কবে ফিরে পাবে বাঙালি জানি না। তবে তাঁর সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে জীবনযুদ্ধের পথ অবশ্যই সুগম হবে। এই বিশেষ সংখ্যার কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে ড. জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র মহাশয় দায়িত্ব নেওয়ায় কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হলো, যাঁদের লেখায় এই সংখ্যা সজ্জিত হলো তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

জয়গোপাল মণ্ডল
১২ মে, ২০২৫

পুরাতনের পাতা থেকে :

কু মা র রা য়
মনোজের মনোভূমি

একদা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুহৃদ নাটককার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দীনবন্ধু-ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গপ্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ প্রণালী এক জাতীয় চল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালোবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালোবাসিত; এখন শক্রর উপরে লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শক্রর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত; এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত—সরু ল্যানসেট বাহির করিয়া, কখন কুট করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত মুখে বাহির হইয়া যায়।"—একশ বছর পার হয়ে গেছে এই সমালোচনার পর। দীনবন্ধু মিত্রের পর আর এক মিত্রজার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এ সমালোচনার মর্মকথাটি মনে পড়ল। আমাদের কালের অন্যতম কৃতি নাটককার মনোজ মিত্র। তাঁর নাটকের মূল সুর, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, হিউমার এবং স্যাটেয়ার, বাংলা নাটকের মধ্যযুগের নাটককার দীনবন্ধু এবং তাঁর অগ্রজপ্রতিম মধুসূদনের প্রহসন দুটির কথাও মনে পড়ছে। তাঁর কাল কবেই গত হয়েছে। আমরা যে কালে বাস করছি, শতবর্ষ পার করে, মনোজ মিত্র অবশ্যই এই সময়ের নাটককার। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি যেমন খাঁটি বাঙালী সত্বার অভিক্ষেপ, তেমনি মনোজের নাটকও খাঁটি বাঙালী নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ প্রণালীর যে জাতভেদ নির্দেশ করেছেন দীনবন্ধুর নাটকসমালোচনা প্রসঙ্গে—সেই বিশ্লেষণের সূত্রে বলা যায় মনোজ মিত্রের নাটকে এই 'রসিক লাঠিয়াল' এবং 'সরু ল্যানসেট' ধারী ডাক্তারের উপস্থিতি অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়—যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করেছেন, মনোজ সেই হাতিয়ার ব্যবহারে দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনে মোটা লাঠি ব্যবহার করেছেন, আবার প্রয়োজনে সূক্ষ্ম ল্যানসেট। জঞ্জাল যখন পর্বত প্রমাণ তখন খোলাখুলি আক্রমণে মনোজ সিদ্ধহস্ত। তখন মোনজটা লাঠিই বেছে নিয়েছেন। তিনি তখন আধুনিক ও প্রাচীনের পদ্ধতিগত বা প্রকরণগত ভেদাভেদ করেননি। বরং বলা যায় বাংলা নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একশ বছর আগে প্রাথমিক যে একটা পথ চলা গোছের সরণি তৈরী হয়েছিল মনোজ মিত্র আজকে সে পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি তিনি ছিন্ন করেননি। 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কিংবা 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'—ইত্যাদি নাটকে সে সময়ের বাঙালী শহুরে এবং গ্রামীণ সমাজ এসেছে, এসেছে একটা সামাজিক দায়কে মেনে নিয়ে—চোখে আঙ্গুল দিয়ে, লোভ, লালসা, ভণ্ডামী, উশৃঙ্খলতাকে লোকের

সামনে তুলে ধরতে। কোনও মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে নয়—নিছক নাটক তৈরী এবং অন্তরের তাগিদে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু কাজ করেছেন, তাঁদের প্রহসনগুলি তৈরী করেছেন। মনোজ মিত্রও তাই করেছেন। মনোজ যে সময়ে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন সেই সময়ের কাছেই তাঁর দায়। জীবনের জটিলতাকে তাঁর সময়ের নিরিখেই তিনি ধরতে চেয়েছেন। জন্ম-মৃত্যু -ক্ষুধা ও অস্তিত্বের আঁকাড়া উপস্থাপনা; লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, ভালবাসা নিয়ে তাঁর উপাখ্যান। সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচার দেখিয়ে দিয়ে। মনোজ পাপীদের অনন্ত নরকে পাঠাতে কুণ্ঠা করেন নি। শত্রুকে চিনিয়ে দেন মনোজ হাসির বিস্ফোরণে। মনোজের নাটক আমাদের অবশ্যই বিত্তশালী করে। আমাদের স্বার্থপরতার চেহারা দেখে আমরা হাসতে হাসতে কেঁদেও ফেলি। মনোজ মিত্রের সময় যে মধুসূদন, দীনবন্ধুর সময়ের থেকে অনেক জটিল। তাই মনোজ সেই জটিলতা প্রকাশে শ্লোগান তোলেন নি, আরোপিত বিপ্লব প্রকাশের প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করেননি—তবু তাঁর নাটক মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার উপভোগ্য দলিল। মনোজ তাঁর এ জাতীয় নাটকে চেয়েছেন কমেডির মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখা—শুধু দেখতে নয় বা দেখানো নয়, জীবনকে আবিষ্কারও কোরতে—এইখানেই মনোজের মূল শক্তি।

সমাজ বিবর্তনের অমোঘ গতিতে অনেক কিছু পালটে যায়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমের যুগ নেই। তাঁদের সমালোচনা তাঁদের সমাজ প্রেক্ষিতে অতীব মূল্যবান। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় যে কথাটা সে সময়ে বলেছিলেন—তা সব সমাজেই ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকবে। তিনি সেই কবে বলেছিলেন, "বাঙলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।" সেই 'নিতান্তই আবশ্যক' কর্মটি এ-আমলে শ্রীমনোজ মিত্র তাঁর নাটকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। বক্তৃতাবাজ তিনি নন, কিন্তু রসিক এবং কবিয়াল নিঃসন্দেহে। মনোজের কালে শাসনের মহিমা (?) কিংবা রাজত্বের মহিমা (?) মানুষের জীবনে ধ্বস নামিয়েছে—তার কালে তার অতীত, তার ধর্ম, তার রুজি, তার নিরাপত্তাবোধ সব বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এই অবস্থাটা মনোজের নাটকে সহজেই ধরা পড়ে। ভোলা ময়রাদের ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে—যে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন, "তুমি মা কল্পতরু / আমরা সব পোষা গরু। শিখিনি শিং-বাঁকানো ঢং / কেবল খায় খোল বিচালী ঘাস।" গোপাল উড়ে, 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় লিখলেন—"দেশের এমনি বিচার বটে। চোর হয়ে চোর ধরতে ছোটে। /এমনি দেশের উল্টো দাঁড়া। নিজে চুরি করে যারা / সাধুরে চোর বলে তারা, পেলে সাড়া।" কিংবা রূপচাদপঙ্খী যখন গেয়ে ওঠেন, "ওরে সামাল সামাল, বাস্তু ঘুঘুর পাল বেরুলো সাজিয়ে যেন পঙ্গপাল/ এর কুহক মাত্র জানে, বশীকরণ গুণে,/ লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল।" মনোজ তাঁর নাটকে রং বেরং-এর রঙ্গ ব্যঙ্গ করে, এই সমস্ত পোষা গরুদের শিং বাঁকাতে শেখালেন, দেশের বিচার

ব্যবস্থার ফাঁক ধরালেন এবং বাস্তু ঘুঘুদের চিনিয়ে দিলেন। মনোজ অনায়াসে এই ঘুণধরা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে পারেন—''কালে কালে জীর্ণ হয় বাগানখানা শুকিয়ে এল.... ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানা জনা / আয়েসে ফুর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করেছেন......ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন—দায়ভার বইতে পারেন না।" কিংবা "মা আর যাব না তোর কোলে... ডাকব না আর মা মা বলে। মুখে দিলে আমার নিমপাতা মা / পরনে ছেঁড়া তেনি সারা জীবন বলদ করে টানালি তোর খানি।..." আবার দেখি মনোজ গান বাঁধে, "যতো খুশি পাপ করো নাহি কোনও সাজা/.....আছে এক ভাঙ্গা কুলো / ফেলে যাও যতো ছাই/ বিচারক যাঁহাতক পুতনার রাজা।" ন'কড়ি দত্তের রসজ্ঞ গানও বাংলা গান-ই। খাঁটি বাঙালী নাটককার মনোজ, মেকী ঐতিহ্যবিলাসী নয়, কিন্তু ঐতিহ্যকেই আত্মসাৎ করে—দেশজ মাটিতে তার শিকড় শক্ত করে আঁকড়ে আছে। জীবনের প্রতি ভালবাসার প্রতিফলন তাঁর প্রতি নাটকে বর্তমান।

।।২।।

মনোজের 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী ১৯৭৫ সাল থেকে মনোজের লেখা নাটক নিয়মিত অভিনয় করে আসছে। ১৯৫৭ সাল থেকে যে সুন্দরম তা পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং বিভিন্ন নাটককারের লেখা নিয়ে চলেছে। সে পর্বে 'নীলকণ্ঠের বিষ'ই (১৯৬৪) একমাত্র মনোজের নাটক। সেই আগের পর্বের স্মরণীয় সুন্দরম প্রযোজনা পার্থপ্রতিম চৌধুরীর লেখা 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড' (১৯৬৬) তারপর প্রায় দশ বছর সে দল নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু প্রায় দশ বছরের বন্ধ্যাত্বের কাল মনোজ দূর করে তাকে ফলবান করেছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে চারটি নাটক আমরা পেয়েছি। 'পরবাস' (১৯৭৫), 'সাজানো বাগান' ('৭৭), 'মেষ ও রাক্ষস' ('৮০) 'নৈশভোজ' ('৮৬)। সবকটিই সুন্দরম প্রযোজনা ইতিমধ্যে ১৯৭২ এবং ১৯৭৬ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ মনোজের লেখা 'চাকভাঙা মধু' ও 'নরক গুলজার' অভিনয় করেছে এবং সেই সূত্রে নাটককার মনোজ মিত্রের জয়যাত্রার সূচনা করে দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত নাটকের স্রষ্টা আজ মনোজ মিত্র। এদের মধ্যে অন্ততঃ দশটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের চার পাঁচটি সংকলন মুদ্রিত হয়েছে। সব অর্থে সফল নাটককার বলতে যা বোঝায় মনোজ তাই-ই।

এই সাফল্যের মূলে আছে মনোজের হস্তগত মঞ্চ সাফল্যের যাদুকাঠি। মঞ্চ-বশ নাটককার মনোজ মিত্র। এর প্রমাণ, ছাপা অক্ষরে, তার সমস্ত নাটকের প্রকাশকরা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ছাপা নাটকের শেষে বা শুরুতে—নাটক সম্পর্কে নানান পত্র পত্রিকার মতামতের সারাংশ ছেপে দিয়েছেন প্রকাশকরা। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় যে সব প্রশংসাসূচক মতামত নাটক সাহিত্যের নয়, নাটকটির মঞ্চরূপের। যে সব দল তাঁর নাটক করেছেন—তারই সূত্রে নাট্য সমালোচকরা যে আলোচনা করেছেন পত্র—পত্রিকায় তাই উদ্ধৃত হয়েছে প্রযোজক ব্য প্রযোজনার কথাটা উহ্য রেখে। তাতে অবশ্য মনোজের কৃতিত্ব খর্ব হচ্ছে না। কেননা তারই নাটক অবলম্বন করেই তো সে আলোচনা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও এক স্মারক বক্তৃতামালায় আমি আমাদের কালের কয়েকজন নাটককার এবং নাটক সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় শ্রীযুক্ত বাদল সরকার, শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোজ মিত্র সম্পর্কে উল্লেখ করে, একটি অংশে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। মোটামুটিভাবে আমার বলার কথাটা ছিল এই, যে এঁরা সবাই আধুনিক নাটককার। আধুনিকতার সংজ্ঞাটি অবশ্যই বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। সে সব আজকের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। আমি শুধু তুলনামূলক আলোচনার অংশটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করচি : বাংলা থিয়েটার তো শুধু নাটক কিংবা নাটককার নয়, তার প্রয়োগও। সাহিত্যের অন্য যে কোনও শাখার সঙ্গে নাটকের মৌলিক প্রভেদ যদি চিহ্নিত করা যায় তবে তার উৎস নিশ্চিত করেই তার প্রয়োগ প্রকাশের মাত্রার মধ্যে নিহিত। নাটককার ও প্রযোজক-এর মধ্যে যে সংঘাত—তাই-ই নাটককে অন্য চরিত্র এনে দেয়।

লেখার সময় থিয়েটার এবং নিজের কালকে মনে রাখতে হয় যেমন, তেমনি তার প্রয়োগের কথাটাও একভাবে না একভাবে নাটককারকে মনে রাখতে হয়—আর এই থাকাটাই এক ধরনের সংঘাত তৈরী করে। অনেক সময় দেখা গেছে বড় মাপের না। নাটককার তার সমকালীন থিয়েটারের চরিত্রধর্মকে অস্বীকার করে এমন এক নাটক সৃষ্টি করেন যাকে আত্মস্থ করতে গিয়ে সমকালীন থিয়েটারের বেড়া ভাঙতে হয়। আবার অনেক নাটককার আছেন যারা থিয়েটারকে মেনে নিয়ে এবং মনে রেখে নাটক সৃজন করেন তাঁরাই মঞ্চ-বশ নাটককার। বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে আলোচনার সুবিধার জন্য একটি গুচ্ছে বেঁধে অন্য গুচ্ছটি বাঁধতে চাই উৎপল দত্ত এবং মনোজ মিত্রকে নিয়ে। সাহিত্যগুণ এবং মঞ্চগুণ এই দুই কথা মাথায় রেখেই সচেতনভাবে এই গুচ্ছবন্ধন।

উৎপল দত্ত অজস্র নাটক লিখেছেন, মৌলিক, বিদেশী নাটকের ছায়ায়, অনুবাদে, সবরকম নাটকই তিনি লিখেছেন। প্রচণ্ড নাট্যগুণ তাঁর নাটকে, অধিকাংশ নাটক উৎপলবাবুর নিজস্ব প্রয়োগ পরিকল্পনায় সফল এবং জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু তাঁর ছাপা নাটকগুলি পড়লে সেই মঞ্চ-সাফল্যের হদিশ পাওয়া যায় না। এই নাটকগুলি যেন উৎপলবাবুর নিজস্ব প্রযোজনার জন্যই রচিত। খুব কম অপিস ক্লাব বা অন্যদল উৎপলবাবুর বড় মাপের নাটক করতে পারে—বরং বলা ভাল করতে পারে না। যদিও তার সব নাটকই ছাপা হয়েছে। 'অঙ্গার,' 'কল্লোল,' 'টিনের তলোয়ার' 'দাঁড়াও পথিকবর'-এর মতো নাটক কেউ ধরতে সাহস পায় না। 'মানুষের অধিকার'-ও কেউ করেনি। উৎপলবাবুর মাইনর কাজ—'রাতের অতিথি', 'ঘুম নেই', 'অজেয় ভিয়েৎনাম', 'বর্গী এল দেশে'-র মতো নাটক অবশ্যই অনেকে করেছেন। এক্ষেত্রে চরিত্ররা এসেছে মুখপাত্র হিসেবে নয়। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একটা থিসিসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য—রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রচারের জন্য। উৎপলবাবুর নিজস্ব প্রয়োগে থিয়েটারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। দর্শকের ওপর তাঁর প্রযোজনা

অভিভূত করার গুণে সমৃদ্ধ। নাটক এবং তার প্রযোজনা কিংবা বলা ভাল নাটকসাহিত্য এবং নাটকীয় উপস্থাপনা—এ দুটো আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে রাখার কথা নয়। নাটকসাহিত্য অনূদিত হয় মঞ্চে নাট্যক্রিয়া এবং দৃশ্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। উৎপলবাবুর নাটকপাঠে সেই নাট্যক্রিয় এবং দৃশ্যক্রিয়া পাঠক ধরতেই পারে না। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকে সেটা সহজেই ধরা যায়। মনোজ মিত্রের নাটক উৎপল দত্তের নাটকের মতোই ছাপা হয় লেখা বা প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গেই। নানান দল, আপিস ক্লাব, মফঃস্বলের নাট্যদল লুফে নেয় মনোজের নাটক অভিনয় করার জন্য। অজস্র নাটক এ দুজনেই লিখেছেন, ছেপেছেন এবং দুজনেই নিজের দলের প্রয়োজনে নাটক লিখেছেন, দুজনেই অভিনেতা, প্রযোজক এবং নির্দেশক। দুজনেই ভীষণ প্যপুলার। অবশ্যই এই পাপুলারিটি একই মানদণ্ডে বিচার করা যাবে না। মনোজের নাটক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি উৎপলবাবুর থেকে ভিন্ন। তার নাটকের বিষয়বস্তু ভিন্ন। সমস্যা দেখা এবং সমস্যার সমাধানও ভিন্ন পথে ঘটে। উৎপলবাবুর নাটকেও মানুষ হাসে—মনোজের নাটকেও মানুষ হাসে। সে হাসির উৎস সম্পূর্ণ ভিন্নস্তর থেকে।

মনোজ এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের মধ্যে মিল ও গরমিলের নিদর্শনও আলোচনার যোগ্য। আধুনিক নাটককার হিসেবে মনোজ এবং মোহিত দুটি ভিন্ন রীতি অনুসরণ করেছেন স্বকীয় ভঙ্গি ও নাট্যভাষ্য সৃষ্টি করেছেন। দুজনেই, এক সময়, স্লাইস অব লাইফ'কে পরিহার করে গভীর কথা বলতে চেয়ে অ-বাস্তব কাব্যিক মাত্রা নাটকে এনেছেন। চেনা জানার জগৎ থেকে দূরে গিয়ে নাটকে অর্থময়তা খুঁজে পেয়েছেন। এই পর্বে মোহিত অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, মনোজ প্রত্যক্ষকে আড়াল করে লোকিক প্রয়োগে সিদ্ধ। মনোজ শিবের অসাধ্যি'র সময় থেকে সমকালীন রাজনীতির ভণ্ডামিকে ধরতে চারছেন। বাস্তববাদী নাটকের যে ধরনের 'চাকভাঙা মধু' নাটকে দেখা গেল যা দেখে মনে হয়েছিল মনোজ বিজন ভট্টাচার্যের পথটাকে আপন করে নিচ্ছেন—কিন্তু 'চাকভাঙা মধু' ব্যতিক্রম হয়ে রইল। কিন্তু অসাধারণ নাট্যসৃষ্টি 'নবান্ন', 'জীবনকথা' থেকে 'দেবীগর্জন' 'গর্ভবতী জননী'তে যে উত্তরণ বিজন ভট্টাচার্যের ঘটেছিল—মনোজ যেন সেখানে থেকে 'চাকভাঙা মধু'তে যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু না, বাস্তববাদী গড়ন থেকে সরে যাচ্ছেন। 'পরবাস' বা 'নরক গুলজার'-এর বাস্তববাদী গড়নের মধ্যে যে অতিরেক প্রশ্রয় পায় তাই হয়তো তাকে ফ্যান্টাসির দিকে নিয়ে যায়। ব্রহ্মা, নারদ, যম, চিত্রগুপ্ত বা শিব কিংবা শনিঠাকুর-রা স্বর্গের বাসিন্দা নয় তাদের এই মর্ত্যে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। মনোজের নাটকে তাদের নিয়ে যে মজা তা নতুন পুরাণ তৈরী করে। শরসন্ধানী মনোজ তবু রূপকের খোলসে যা সৃষ্টি করে, তা বিবেচনা করার অবকাশ দর্শক পায় না। এক ধরনের দায়িত্বহীন সাধারণ মানুষের তুষ্টি বিধানই যেন লক্ষ্য হয়ে যায়। চটজলদি সস্তা সমালোচনা—এমন অভিযোগ কখনো কখনো উৎপলবাবু এবং মনোজ মিত্রের নাটক সম্পর্কে শোনা গেছে। দর্শক নিজেদের দেখতে পেয়ে যদি মজা পেত এবং নিজেদের ঘেন্না করত তা হলে হয়তো এ সমালোচনা উঠত না।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যভিচারে, শঠতায়, অবিচারে যে সাধারণেরও দায়িত্ব আছে সেটা ভুলে গেলে নাটককারের চলে না। —এটুকু সমালোচনা বোধহয় মনোজ এবং উৎপল দত্তের প্রাপ্য কিছু নাটকের সূত্রে।

পাঠ্য নাটক হিসেবে সমীহ আদায় করতে পারেন বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ সাহিত্যিক গুণ এঁদের নাটকে পাওয়া যাবে। বাদলবাবু আরম্ভ করেছেন প্রচলিত ধারায়। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে তাঁর পট পরিবর্তন। 'বাকি ইতিহাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'শেষ নেই'—প্রভৃতি নাটকে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের (তার মধ্যে দর্শকও আছেন) 'সেন্স অব গিল্ট'-এরই আলেখ্য তিনি এঁকেছেন। বাদলবাবু সম্পর্কে একটা অভিযোগ—যে তাঁর নাটকে কোন 'দায়বদ্ধতা' নেই। নেই তার কারণ,—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষরাই তাঁর নাটকের চরিত্র। বস্তুত এই মধ্যবিত্ত সমাজেরও কোন দায়বদ্ধতা নেই। বাদলবাবুর এ ব্যাপারে কোনও ভণিতাও নেই। বাদলবাবু কবিতা লিখেছেন, আর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচয় তো কবি হিসেবেই। তাই এঁদের দুজনের নাটকে কাব্যগুণ বর্তমান। অবশ্য সাম্প্রতিক কিছুকাল থেকে দর্শকের বুদ্ধি, এবং মননের কাছে আবেদন সৃষ্টির চাইতে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করায় আগ্রহী হয়েছেন মোহিত। 'স্বদেশী নক্সা' এবং 'তোতারাম' থেকে নাটককে সহজ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই রকমই অন্য এক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে বাদলবাবু থার্ড থিয়েটারের প্রচলন করেছেন। এঁদের চিন্তায় সাজুয্য এইখানেই। বুদ্ধিদীপ্ত, কাব্যময় সংলাপ গঠনে এবং চিন্তার ঐশ্বর্যে ভরপুর মোহিতের আগের নাটকগুলি। 'মৃত্যু সংবাদ', বা 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'—ইত্যাদি প্রাথমিক প্রয়োগে—যে অবস্থাটা ছিল যা পূর্ণবাস্তব কিন্তু অলৌকিক—তা সম্পূর্ণত বর্জিত হল 'রাজরক্ত' নাটকে। এইখানেই মোহিত বড় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন। এ নাটকের স্পষ্টতর রাজনৈতিক মাত্রা আমাদের ভাবিয়ে দিয়েছিল। ওর আবেদন অবশ্যই বুদ্ধির দুয়ারে।

।। ৩।।

মনোজ মিত্র স্বাধীনোত্তর ভারত এবং খণ্ডিত বাংলার নাটককার। বস্তুত তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন স্বাধীনতার পর প্রায় দু'দশক পার করে। স্বাধীনতার পর যে নতুন ভাবনা, যে নতুন দায়িত্ববোধ, যে নতুন উত্তেজনা—তখন তার অবসান ঘটেছে। রাজনৈতিক আকাশ সমাকীর্ণ নানান সুবিধাবাদের জঞ্জালে। মানুষের বাঁচার সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনুভূতিশীল আধুনিক মানুষের অসহায় এবং নিঃসঙ্গ আর্তি ফুটে উঠেছে তখন ধনবাদী সভ্যতার ব্যাধি নিয়ে। সে এক ক্ষুব্ধ-অস্থির উৎকেন্দ্রিক সময়। যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। মানুষের মুক্তি দিতে পারে—সেই বিশ্বাসের আধারে বেনো জল ঢুকে পড়েছে—বিশ্বাস টুকরো হয়ে গেছে। হিন্দী-চীনি ভাই ভাই পর্ব শেষে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি আন্দোলন, পর পর দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। নানান ঘটনা এরই মধ্যে সত্তরের দশকের টালমাটাল অবস্থা, জরুরী অবস্থা, মৃত্যু, বামফ্রন্টের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, শাসন ও রাজত্বকাল। এই সময়কালে

মনোজ মিত্র নাটক লিখেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন মনোজ গণনাট্য সঙ্ঘ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার দাবী করেননি কখনো। তিনি এসব থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।

মনোজের নাটকে 'বাদামী' হাতে সড়কি তুলে নেয় প্রাণের মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং গর্জন করে ধেয়ে যায় আড়তদারের বাপ শয়তান অঘোর ঘোষ-এর দিকে (চাকভাঙা মধু), জ্যান্ত নেকড়ের দাঁত ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা করে 'মাণিক'। 'নারদ' শয়তান অত্যাচারী জানোয়ারদের গরুতে রূপান্তর করে দেয়—সেই গরুর ভীড়ে আমরা দেখি ব্রহ্মা, যম, চিত্রগুপ্তদের (নরক গুলজার); শবযাত্রার খাটিয়ায় মড়ার ভূমিকায় ন'কড়ি দত্তকে মোক্ষম সংলাপ বলে বাঞ্ছারাম—'তোমার ফলিডল তুমিই না হয় এক ফোঁটা'—এই অর্ধসমাপ্ত সংলাপ উচ্চারণ করে সদ্যজাত নাতির দিকে চেয়ে ভবিষ্যৎ দেখতে পায় (সাজানো বাগান), কিংবা 'কিনু কাহারের থেটারে' কিন্তু বিশু যখন শেষ দৃশ্যে 'ঘণ্টাকর্ণ' রূপে উদাসিনীর হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে—"আয়রে রাজা আয়রে উজীর, আয়রে লাটসাহেব... তোদের বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিই এই জীবনের মতো ঘেন্না... আয় আয় আয়"—তখন মনোজকে সমস্যা থেকে অসম্পৃক্ত মনে হয় না। মনোজ অত্যাচারীকে দেখিয়েছেন, শোষককে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন পাপীকে, লোভীকে। লম্পটকে দেখিয়েছেন কিন্তু বাংলা থিয়েটারের একটা পর্বের মত অন্তিম দৃশ্যে রক্তিম আভায় ইচ্ছাপুরণের ফ্রিজ করে দৃশ্য স্থাপনায় প্রয়োজন মনে করেননি, বরং রঙ্গ-ব্যঙ্গে শ্লেষে-হাসিতে শেষ করেছেন, সে শরসন্ধান ব্যর্থ হয় নি। 'চাকভাঙ্গা মধুর' মত নাটকেও বাদামীর হাতের সড়কির তৃতীয় খোঁচায় অঘোর আর্তনাদ করে ওঠে যখন, তখন নাটক শেষ হয় না—নাটক শেষে বাদামী আর মাতলা উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে যায় দাওয়ার দোলনার দিকে। 'নরক গুলজার' নাটকে মাণিক ও ফুল্লরা গরুর মিছিল নিয়ে চলতে থাকে সার্থক মানবজন্মের আশায়। এতকাল যারা শোষণ করেছে তাদেরই দোহন করবে এবার মাণিক ও ফুল্লরা। এও একধরনের সদর্থক ইচ্ছাপূরণ। নাটক ইতি হয়ে যাবার পরও মনোজ একটু করে পুনশ্চ রাখেন। যেমন 'সাজানো বাগানে' চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া বাপ-বেটার মিলন দৃশ্য; 'কিনুকাহারের থেটারে'ও আছে এই পুনশ্চ অংশ। ঘণ্টাকর্ণের হাতে ছুরি তুলে দেওয়াই নাটককারের শেষ লক্ষ্য নয়—বাস্তব অবস্থাটা ভুলতে চাননি নাটককার—তাই ইচ্ছাপূরণের পর পুলিশ আসে, কিনুর আসর লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

১৯৮২ সালে 'রাজদর্শন' এবং ১৯৮৮ সালে মনোজের দুটি নাটক বহুরূপী প্রযোজনা করে। মাঝখানে সুন্দরম নিজস্ব প্রযোজনায় 'নৈশভোজ' করেছে (১৯৮৬), তারপর 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা'। শেষ দুটি নাটকে মনোজ তার পথ পরিবর্তনের সাক্ষর রেখেছেন। বিষয় নির্বাচনে এবং কাহিনী বিন্যাসে এর বক্তব্য উপস্থাপনার নবত্বে এ দুটি নাটকে মনোজ নিজেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। 'মেষ ও রাক্ষস' ('৮০) এবং তারও আগে 'অশ্বত্থামা' অবশ্যই ব্যতিক্রমী নাটক। 'নরক গুলজার' থেকে 'কিনু কাহারের থেটারে'

শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও কৌতুক যুক্ত সংলাপে এবং ঘটনা বিন্যাসে মনোজ অনবরত খোঁচা মেরেছেন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক আজ্ঞা নিষেধকে, রীতি-নীতিকে, লোভ লালসাকে, শাসন ও শোষণ পদ্ধতিকে, দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজন—পোষণ, বর্তমান দেশের দুঃস্বপ্নময় অবস্থাটা একটা কল্পনা, রূপকথা এবং রূপকের জগৎ তৈরী করে দর্শকের চেতনা-চৈতন্যকে কৌতুক রসে সাজিয়ে দিয়েই কিছুটা ধাক্কা দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে মনোজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সেদিক থেকে খানিকটা স্বাদ বদলের জন্য 'অশ্বত্থামা' কিংবা 'মেষ ও রাক্ষস'কে পরীক্ষামূলক নাটক বলতে পারি। স্বাভাবিক স্মৃতি নেই এ দুটি নাটকে। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটকটি 'মেষ ও রাক্ষস' পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের জটিল এক আবর্তন যেন এ নাটক। রূপকের আড়ালে, রূপকথার ভঙ্গিতে আমাদের সমাজের রাজ-রাজ্য ও প্রজার কাহিনী। অন্ধ কঙ্ক যখন হীরামনের নৈতিক অধঃপতন জানতে পেরে আর্ত চীৎকারে বলে ওঠেন—"ওরে দেখে যা—দেখে যা—তোরা—আমাদের গর্ব, আমাদের অবিশ্বাস, আমাদের দেশের যৌবন একটা চতুস্পদ জানোয়ার হয়ে আমাদের বুকের ওপর দাপাদাপি করে"—একথা অন্ধের নয় ব্যঙ্গ-নিপুণ মনোজেরই। নির্মম অত্যাচারী রাক্ষস-রাজা বিরোধী মানুষকে নির্বিবাদী বশংবদ ভেড়া বানিয়ে দেয়। গুপ্তহত্যার শিকার হন রূপনগরের তরুণ তাজা প্রাণ। আসলে ৭০-এর দশকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মনোজ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারেননি বা চাননি। কিংবা তার মনে হয়েছিল এই জটিল অবস্থাটা রূপকথার আড়ালেই প্রকাশ করা সম্ভব। সে সদর্থক চেষ্টা অবশ্যই এ নাটকে দেখতে পাওয়া যাবে।

আসল স্বাদ বদল ঘটে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা,' 'শোভাযাত্রা' এবং 'দর্পণে শরৎশশী'—নাটক তিনটিতে। মনোজ যেন তার ভূমিকা। বদল করছেন। এবং সম্পূর্ণ নতুন এবং আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। আর প্রহসন নয়। হাস্যরস অবশ্যই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু গভীর মর্মবেদনার সুর তিনটি নাটকেরই মূল সুর। মানবিক আবেদন, পরস্পরের প্রতি মমতা, সহানুভূতি, হৃদয়ের বড় কাছাকাছি হয়ে ওঠে। অনেক আগে লেখা 'পরবাস'-এ এই বোধের ক্ষীণ সূচনা। যে রসস্নিগ্ধতার মধ্যে 'পরবাস' বা 'কেনারাম বেচারাম'-এ, আলতো ভাবে, নাটকের শেষে হাসি বন্ধ করে বেদনার্ত হতে হয়—ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতায়, এখানে তা নেই। এ তিন নাটকে আপাত হাসির অন্তরাল নেই। এ হ'ল ব্যক্তি, সমাজ এবং সময়ের ট্র্যাজেডি। ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সমাজ এবং সমাজ ও ব্যক্তি জড়িয়ে পড়ছে তার সময়ের মধ্যে। শেষের দুটি নাটকে নাটককারের পুরোনোর প্রতি একটা মমতাও প্রকাশ পায়।

অনেকদিন আগে মণিপুরে, কানহাইলাল প্রতিষ্ঠিত, কলাক্ষেত্রে কানহাইলাল নির্দেশিত 'পিবেৎ' নাটকটি দেখেছিলাম। রূপকথার আধারে শাণিত বুদ্ধির নাটক। 'পিবেৎ' হল এক পাখি। মা-পাখি তার তিন শাবক নিয়ে কী করে বিড়ালের মোকাবিলা করে, সেই নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করেছিলেন তিনি দেহভঙ্গি এবং শব্দের মাধ্যমে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে

সেই মা যেন ডানা বিস্তার করে তার ছেলে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য সদা ব্যস্ত। নাটক পারিবারিক বৃত্ত রচনা করে ক্রমে উন্মোচিত হয় বড় পটভূমিতে। সেখানে ব্যক্তির সংসার-সমষ্টির সংসার হয়ে যায়—এই ক্রম উন্মোচনের ব্যাপারটা বড় মুন্সিয়ানার সঙ্গে, কৌতূহলকে জিইয়ে রেখে, মনোজ সম্পন্ন করেন। আগের সব নাটক থেকে এ আলাদা। আলাদা, কিন্তু বোধহয় মিলও আছে। অনেক নাটকেই মনোজের পাত্র-পাত্রীরা একটা আশ্রয়ের জন্ম লালায়িত। মনোজ মিত্রের নাটকে 'মা' এসেছে বারকয়েক। 'চাকভাঙা মধু'-তে 'বাদামী', 'নরক গুলজারে', 'ফুল্লরা', 'সাজানো বাগানে', পদ্ম এবং শেষে দেখছি 'অলকানন্দাকে'। তার ওপরে 'শোভাযাত্রা' নাটকে বড় মেয়েকে, যার জড় বুদ্ধি এক ছেলে। এরা সবাই সন্তানের জন্য আশ্রয় চায়, সন্তানকে বাঁচাতে চায়। 'শোভাযাত্রা'তে পরিবারের প্রাচীন রথটিও শেষে আশ্রয়চ্যুত হয়,—অবশ্যই এর দ্যোতনা একটু ভিন্ন। অলকানন্দার পুত্রকন্যারা এক ছন্নছাড়া সময়ের সন্তান। কোনও সম্পর্কই যেন এ সমাজে মর্যাদা পায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভয়াবহ নৈরাজ্য। সর্বংসহা মা অলকানন্দা যেন বিশাল সাদা ডানা মেলে ধরে তাদের রক্ষা করবার প্রয়াস পায়। এমন নাটক মনোজ আগে লেখেনি। তবে পুরোনো অভ্যাস মনোজ ছাড়তে পারে নি। পরিহাস প্রবণতার অভ্যাস 'অলকানন্দার' মতো নাটকে এবং 'শোভাযাত্রার' মতো নাটকেও দেখা যায়। তখন মনে হয় দর্শককে হাসাতে হবে, মজা পাওয়াতে হবে নইলে দর্শক তুষ্ট হবে না—এমন এক বিশ্বাস তাকে মঞ্চসেবী নাটককার করে তুলেছে। এসব নাটকে যে প্রধান জোর তার ওপর যেন মনোজ ভরসা রাখতে পারছেন না। কিছু কিছু নাটক অমোঘ হতে পারে তার বিষয়ের গভীরতার জন্যই। কিন্তু মনোজ যখন পথ পালটাচ্ছেন তখন প্রত্যাশা জাগে আরও গভীর নাটক তিনি লিখবেন। যখন তার নাটক নিয়ে নির্দেশককে ভাবতে হবে কেমন করে তার বেড়া ভেঙে প্রযোজনা করতে হবে। শুধু নিপুণতা নয়, শুধু কুশলতা নয়, শুধু দর্শকদের দিকে চোখ ও মনকে নিয়োগ করা নয়, শুধু দর্শক তোষণের অস্ত্র চালনা নয়। যেখানে মনোজ মিত্রের তার ভাবনার সঙ্গে কবিতা যুক্ত হবে—এবং সে কাব্যকে সে নাট্যভাষায় ব্যক্ত করবে। শুধু কার্যকর নাট্য উপকরণ নয়, পালে হাওয়া লাগান না, প্রদীপের ওপারে বিক্রয় বিনোদনের ডালি সাজান নয় 'শোভাযাত্রা' নাটকে খানিকটা চেকভ্, খানিকটা তারাশঙ্কর-এর ভাব এবং ভাবনা প্রতিফলিত হতে দেখি। বড়মাপের চরিত্র সৃষ্টি হয় না—কিন্তু বুনোটে একটা মিল থেকে যায়। সময়কে এখানেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু শেষটা যেন আরোপিত মনে হয়। মনে হয় মনোজের ইচ্ছায় এটা ঘটে না—ঘটাতে হয়। অনুরূপ ঘটনা ঘটে 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকের শেষেও। মনোজের নাটকে জরুরী কথা আছে—কিন্তু জরুরী কথা—বলার ধরনে—রসিকতার ঝোঁকে, অনেক সময়েই হারিয়ে যায়—গুরুত্ব হারায়। মজা করতে গিয়ে নাটকের গভীর কথা যদি হারিয়ে যায়?—বুকের মধ্যে না বেঁধে? তাহলে কিন্তু দর্শক প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আর ভাববে না। নাটকের গভীর গড়নকে নষ্ট করে দিতে পারে—এ

আশঙ্কাও থাকে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, পরিহাসের প্রকাশ—মনোজের অধিকাংশ নাটকে মূলত সংলাপে এবং নাট্যমুহূর্ত তৈরী করতে গিয়ে ঘটে যায়—কিন্তু যখন নাটকটা আরম্ভ করতে গিয়ে গল্পটা বলতে শুরু করে তখন তার ভাষা কাব্যময় হয়ে ওঠে। তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে—মঞ্চ নির্দেশ দিতে গিয়ে মনোজ চমৎকার কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করে, যে বর্ণনা মঞ্চ নির্দেশ হিসেবে খুব একটা কাজের নয়—এবং প্রায়শই নাটকের মেজাজের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। তবু এর থেকে মনোজের কাব্যময় ভাষা প্রয়োগের প্রবণতা চোখে পড়ে। 'ছাপ' নাটকের পাতা উল্টে মনে হবে মনোজ বুঝি গল্পকার। 'চাকভাঙা মধু' নাটকের প্রথম অঙ্কের মঞ্চ নির্দেশ: "বিকেলের হলদে কোমল রোদ্দুর মাতলা ওঝায় জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের চালে চিক্ চিক্ করছে। উঠোনে ছড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া, অল্প অল্প কাঁপছেও। দাওয়ায় শরীর এলিয়ে ঘুমোচ্ছে বাদামী। তার ক্লান্ত কালিপড়া চোখে মুখে কী অসম্ভব হলদে নিষ্প্রাণতা।" ইত্যাদি। নাটককে পাঠ্য করে তুলবারই আয়োজন। 'পরবাস' নাটকে দেখি, "আবছা নীল আলোয় ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘরখানি রহস্যাবৃত। নীল আলো এবং সানাই-এর বিষাদ মধুর সুর।" যেন এক স্বপ্নের জগৎ, যেন বহুদূর অতীতের জগৎ রচনা করেছে। আবার 'রাজদর্শন' নাটকে, 'সামনে ঘোর অন্ধকার ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে একটি ঘোরতর দেবমূর্তি ভেসে উঠল, সাক্ষাৎ মহাশনি'—মনোজ খেয়াল করে না যে সামনে অন্ধকার নয়—অন্ধকার মঞ্চে শনির মূর্তি ফুটে উঠবে। বা 'অযোধ্যারাজ্যের এক গণ্ডগ্রাম। বৈশাখ মাস ভরপুর। ধু ধু মাঠের মাঝে একটিমাত্র গাছ—পাতা ঝরা, রোদে ঝলসানো বৈশাখের রুক্ষ বৃক্ষ এবং অনাবৃত ছত্রের মধ্যে দিয়ে অবারিত লক্ষ্যভেদ করছে লম্বোদরের শিরোপাকে। আবার কোথাও, 'ঘরের কোণে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে'। তারই 'নৃত্যরত আলো ছায়ায় দেখা যাচ্ছে'। কিংবা "ছোটরানী যশোমতী একছড়া বেল কুঁড়ির মালার মতো পালঙ্কে লুটিয়ে আছে।" ...ইত্যাদি।

'কিনু কাহারের থেটার'-এ যেমন তৃতীয় বন্ধনীতেও কাব্যের বাঞ্জনা আবার সূত্রধার। (ভদ্রলোক) চরিত্রের মুখের ভাষাতেও তাই। "রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝলমল। ন্যাড়া মাঠের কিনারে নিঃসঙ্গ এক খেজুর গাছ। কিনু কাহারের থিয়েটারের আসর বসেছে গাঁয়ের এই গাজন তলায়। দু'টো খুঁটির মাঝখানে একটা পর্দা খাটানো।' মঞ্চে একটা চিত্রিত পর্দা খাটালে—খেজুর গাছ দেখানও মুস্কিল ঝলমল রাতের আকাশ দেখানো ভদ্রলোক চরিত্রের সংলাপে লেখা, "...মশালের শিখা ফিঙেপাখির পুচ্ছের মতো দুলতো ওদের শরীরে। রাজাকে মনে হতো ভিখারি ...ভিখারিকে মনে হতো দানব। এসব জায়গায় মনোজ যেন নাটককার নন—একজন গল্প বা উপন্যাসকার। নাটক শেষ হয় কিনুর দলের কুশীলবদের সমবেত গানে, তার ভাষাও শ্রীমণ্ডিত। এতক্ষণ এই চরিত্ররা সংলাপের যে ভাষা এবং ভঙ্গি ব্যবহার করেছে তার থেকে আলাদা। আর ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে ভেসে আসে নাটকের ট্রাজিক সমাপ্তির যে সুর তাও কাব্যময়: এই যে নির্জন শূন্য প্রান্তরে ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে

আছে আসরটি—বিধ্বস্ত নৌকার ছেঁড়া পালের মতো চাঁদের আলোয় যেমন ভেসে যাচ্ছে ছেঁড়া পর্দাটি-সেদিনও ঠিক এমনি গিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে উপমার রীতি চলে এসেছিল মনোজ তারও উত্তরসুরী। রস রসিকতার, রঙ্গ-ব্যঙ্গে উপমার ছড়াছড়ি মনোজের নাটকে। তবে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও মনোজ সিদ্ধহস্ত। বারাসত-বসিরহাট- টাকি-মালঞ্চপুরের আঞ্চলিক টান তার সংলাপের আর এক বৈশিষ্ট্য। দেশভাগের পর অজস্র নাটকে পূর্ববঙ্গের ভাষা, যাকে বাঙ্গাল ভাষা বলে, তা ছেয়ে গিয়েছিল। মনোজের নাটকের ভাষা, সংলাপের সুর কানকে তৃপ্ত ক'রে অন্য এক স্বাদ এনে দিল।

।।৪।।

নাটককার মনোজ মিত্রের নাটকের থীম এবং সেই সঙ্গে তার ব্যক্তি-মানসের একটা পরিচয় দেওয়া গেল সংক্ষেপে। এমন দাবী করবো না, যা লেখা হল তা সর্বজনীন মতের প্রতিফলন। না, একান্তই ব্যক্তিগত এ মূল্যায়ন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে, সমালোচনাও করা যায় তার কাজের। সেটুকুও সংক্ষেপে করা গেল। এবারে উপসংহার। এই পর্বে, প্রযোজনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দু একটি কথা বলবো। আগেই উল্লেখ করেছি 'বহুরূপী' মনোজের দুটি নাটক অভিনয় করেছে। 'রাজদর্শন' এবং 'কিনু কাহারের থেটার'। কলকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লীতে দুটি নাটকের প্রযোজনা সমাদৃত হয়েছে—সে কথা বলাই বাহুল্য। 'রাজদর্শন' নাটক যখন শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয় তার আগেই মনোজের মুখে কাহিনীর বর্ণনা শুনে এবং কিছু দৃশাঙ্ক শুনে আমরা আগ্রহী হই। ছাপার পর আলোচনা হল। পত্রিকায় ছাপা নাটক পড়ে নাটকটাকে একমাত্রিক মনে হলো। রাণী যশোমতী ও চন্দ্রকেতুর প্রেমবিলাস অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল সেখানে এবং প্রাসাদ চক্রান্ত প্রাধান্য পেয়েছিল। সেটা ভাল লাগেনি আমাদের। নাটককার ও প্রযোজক পরিচালকের মধ্যে একটা সংঘাত তো ঘটতেই পারে—এক্ষেত্রে আলোচনা হল—প্রয়োগ প্রকাশের মাত্রা স্থির হল। মনোজ পুনরপি মার্জনা করল নাটকটিকে। বহুরূপী অভিনয় করলো। রাজসভার দৃশ্য সংযোজিত হওয়ায় নাটকের একমাত্রিক চেহারা পাল্টে গেল। শেষ অংশটাও পরিবর্তিত হল। যখন বই হিসেবে 'রাজদর্শন' প্রকাশিত হল তখন বহুরূপীর প্রযোজনার পাণ্ডুলিপি প্রযোজনায় দৃশ্যক্রিয়া অনেকাংশে ভিন্ন থেকে গেল। যেমন শনির আবির্ভাব দৃশ্যে—ঘোষকের—ঘোষণাকে নাটকীয় মাত্রা দান। মনোজের নাটক অনূদিত হল বহুরূপীর মঞ্চে—দৃশ্যক্রিয়া ও মঞ্চক্রিয়ার মধ্যে। বহুরূপী এ নাটক করতে গিয়ে নিজেদের ভাঙতে শিখল। এ জাতীয় নাটকের কোনও সংস্কার ছিল না—বহুরূপীর এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সংস্কার নেই বলেই এ নাটককে সাজাতে, অভিনয় করতে, আলোতে, 'আবহ সঙ্গীতে অনেক মনোযোগ দিতে হ'ল। এ দাবী মনোজের নাটকের মধ্যেই ছিল। আমরা সফল হলাম। এ আমলের সর্বাধিক অভিনীত নাটক হিসেবে বহুরূপীর তালিকায় স্থান পেল 'রাজদর্শন'। বহুরূপীর সংস্কার নিয়ে—বহুরূপীর নিকটজনেরা, গম্ভীর এবং গভীর কথার নাটক নয় বলে কেউ কেউ বিস্মিত হলেন এবং লঘুচালের জন্য

কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হলেন প্রযোজনার প্রশংসা করেও। আমাদের অবশ্য মনে হল এ এক পরীক্ষা। নাটকটি সম্পর্কে আমরা ভেবেছিলাম—এ কল্প কাহিনী বর্তমান থেকে চেতনাকে সরিয়ে নেবার জন্য নয় বা শুধুমাত্র রূপকথার রাজা তৈরীর প্রয়াসও নয়; অবশ্যই রূপকথার সজীব স্পর্শ এতে লেগে থাকবে। এ যেন রূপকথার সেই মজার গল্পকে অনুবর্তিত করে। সাম্প্রতিককে দূরে সরিয়ে দেখবার বাসনা। শিকড় খুঁজে দেখার প্রয়াস। এ কাহিনী বাস্তবিক নয় বরং সেই রুদ্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলে আমাদেরই নানান "অবস্থা রঙ্গ ব্যঙ্গের মধ্যে আবিষ্কার। আমরা বলেছিলাম, 'গল্পটা এই ভাবেও শুরু করা যায়, 'অথঃ লম্বোদর অভিরাম কথা', বা 'শনির সংকট', কিংবা আরও সরল করে 'পাগড়ির মাহাত্ম্য'। কিন্তু নাটককার নাম দিয়েছেন 'রাজদর্শন'। রাজাকে দর্শন? না রাজার দর্শন বোধয় দুটোই। খেটে খাওয়া কামার অভিরাম এবং পরজীবী লোভী ব্রাহ্মন ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ-যাত্রায় পৃথক ফল। তাদের দুজনের স্বরূপ প্রকাশ প্রায়। সোনার আকাঙ্ক্ষার রূপ এবং-মাটির চানের চেহারা। শনি ঠাকুরের কার সাজিতে নাট্যর্ঘটনা অনেকদূর এগোয়—কিন্তু শেষ রক্ষা হয় মানুষের হাতেই। লোভের ডানা মেলে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ভয়ঙ্কর পরিক্রমা শেষে ফিরে আসে শিকড়ে। প্রযোজনার রূপ এই ভাবনা নিয়েই নির্দ্দিষ্ট হল।

'কিনু কাহারের থেটার'-এর অভিজ্ঞতাটা একটু ভিন্ন—'রাজদর্শন' প্রযোজনা করতে গিয়ে লোকনাট্যের রূপধর্ম খানিকটা আত্মস্থ করেও প্রসেনিয়াস থিয়েটারের মধ্যেই তাকে বাঁধতে হয়েছিল। 'কিনু কাহারের থেটার' প্রসেনিয়াম মঞ্চে করলেও প্রযোজনার শৈলী পুরোপুরি না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লোকনাট্যের রীতি বজায় রাখার চেষ্টা হল। দর্শক আসন গ্রহণ করার আগে থেকেই দুটি ক্ষেত্রেই যবনিকা খোলা থাকতো। 'রাজদর্শনে' নাটক আরম্ভের আগেই মধ্যমঞ্চে শনি ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ পথিপার্শ্বে এক শনিমন্দির থাকতো সেই প্রতিকৃতির মতো সাজেই শনিঠাকুর আবির্ভূত হয় সশরীরে। আর 'কিনু কাহারের থেটারে' ফাঁকা মঞ্চে—মঞ্চগভীরে ঝোলান চিত্রিত পট।

একদিন মনোজ বহুরূপীর ঘরে নাটকটা শোনাল। তার আগেই খানিক খানিক আমার শোনা ছিল। নাটকের গঠন, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া, মনোজের পড়ার মধ্যে চরিত্রগুলির সুস্পষ্ট চেহারা আমাদের কাজটা সহজ করে দিল। নাটক এবং নাট্য প্রযোজনার মধ্য পথে যে সংঘাত তা এক্ষেত্রে হলোই না যেন সবটাই তৈরী। নাটক পড়া এবং মঞ্চায়নের মধ্যে কোনও বাধা সংশয় উকি মারে নি। কিন্তু শুরুতে বিঘ্ন ঘটল। পুরো নাটক পড়ার পর মনোজ বুঝতে পারল দ্বিতীয় অংশটা পাল্টান দরকার। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে সে নিজের সৃষ্টিকে সংশোধন করতে দ্বিধা করে না। আমাদের হাতে মহলা শুরু করার জন্য প্রথমার্দ্ধ দিয়ে সে দ্বিতীয়ার্দ্ধ নিয়ে গেল। প্রথম অঙ্কের মহলা শুরু হ'ল—অনেকটা এগিয়েও গেল, কিন্তু মনোজ আর দ্বিতীয় অঙ্ক দেয় না। তাগাদার পর তাগাদা। আমাদের প্রথমার্ধের কাজ অর্থাৎ প্রস্তুতি প্রায় শেষ এমন সময় মনোজ দ্বিতীয় অংশ দিয়ে গেল। চমৎকার! আমরা আনন্দের

সঙ্গে অভিনেতাদের দিয়ে চরিত্র প্রস্তুতি, মঞ্চ বিন্যাস, চিত্রায়ন, বাকভঙ্গী, কথার সুর, এবং সর্বোপরি এ নাটকের সংগীতাংশ (কণ্ঠও আছে) রচনায় যত্ন নিলাম। মনোজ মিত্রের নাটক নিয়ে বহুরূপীর আর এক সাফল্য। 'রাজদর্শনে' বহুরূপী দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ অভিনেতারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বেশ সংখ্যায় আর 'কিনু কাহারের থেটারে' অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা। প্রধান এক আধটি চরিত্র বাদ দিয়ে বেশীরভাগ চরিত্রে অভিনয় করলেন—গান করলেন, নাচলেন। আমরা এ নাটকে দেখলাম এক ব্রাত্যজনের পালাগান। এ থিয়েটারে নাটকের মধ্যেই নাটক গড়ে ওঠে। সেখানে জীবন আর নাটক একাকার হয়ে যায়। এই অন্ত্যজ ব্রাত্যজন নাটকে তাদেরই বাঁচার সঙ্গে যুক্ত নানান ঘটনার অভিঘাত। বাংলার লোকনাট্যে। লোকসঙ্গীতে এমনকি লোকচিত্রকলাতেও হামেশাই এ ঘটনা ঘটেছে। লোকনাট্যের সারল্য আছে আবার একধরনের সফিস্টিকেশনও দেখা যায়। এ নাটকের রূপের মধ্যে আমরা দেখলাম, অবহেলিত মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে এক গভীর জীবনবোধের নাটক — এক অমোঘ সত্যের উপলব্ধি। মনোজ আদ্যন্ত এক দেশজ নাটক লিখল—আমরাও তা অবলম্বন করে দেশজ আঙ্গিকের চর্চা করার সুযোগ পেলাম। মনোজ পলিমাটি থেকেই তুলে এনেছেন এ নাটকের কাঠামো, আমরাও চেষ্টা করেছি কুশীলবেরা যাতে তার গর্ভবীজ থেকে প্রাণবান হয়ে ওঠে এবং তাদের বেদনা যেন ফুল হয়ে ফোটে। ইতি চারটি অংশে বিভক্ত মনোজ মনোভূমিতে। সন্তর্পণ পদচারণা পর্ব।

উৎস : স্যাস, ১০ম বর্ষ ১৯৯৩

ম নো জ মি ত্র
বাংলা মৌলিক নাটক

আমার বলার বিষয়টা বাংলা মৌলিক নাটক। একটু আগে আমার এক বন্ধু, থিয়েটার ওয়ার্কশপের কর্মী ও অভিনেতা আমাকে বললেন, "একটু জমিয়ে বলবেন"। কিন্তু এমন একটা বিষয় সত্যি বলতে কি, এটা জমিয়ে, ফাটিয়ে, গাবিয়ে বলার মতন বিশেষ কিছুই নেই। কারণ এই বিষয়ে কী আলোচনা করা হবে সেটা মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে আছে বলেই আমার মনে হয়। কারণ মৌলিক নাটকের প্রসঙ্গ যখনই ওঠে, তখন একটা কথাই বলা হয় যে, বাংলায় মৌলিক নাটক নেই। কেন নেই? না থাকার কারণ কী? এখানকার নাট্যকারেরা করছেটা কী? লিখছেন না কেন? এতো বাজে লেখেন কেন? এই এই অজস্র অভিযোগ ছাড়া—আর বিশেষ কিছুই বলার নেই। মানে সর্বত্র এটাই আলোচনা করা হয় যে সবাই লিখতে পারে, কবিও কবিতা লিখতে পারেন, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক তারাও লিখতে পারেন, শুধু কেবল অলেখক কিছু লোক-জন গিয়ে নাটকে জুটেছেন। এইরকম একটা ধারণা রয়েইছে। কাজেই বলার বিষয়ে মোটামুটি একটা ছক রয়েই গেছে। এটা ঠিকই যে খুব বেশী, আমি সাম্প্রতিক কালের কথাই বলছি, খুব বেশী সংখ্যায় নাটক লেখা বছরে হয় না। যা লেখা হয় প্রয়োজনের তুলনায় তা কমই। এবং আপনারা নিশ্চয়ই এটা বুঝবেন যে যত কিছু লেখা হবে সবই ভালো লেখা হবে না—কোন কালে কোন দেশেই হয় না। কিছু ভালো আর কিছু মন্দ লেখা—এই থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় তাই নাটকের সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ মৌলিক বাংলা নাটকের সংখ্যা খুবই কম। এদিকে বহু দল, তাদের বহু আকাঙ্ক্ষা। বহু দর্শক। থিয়েটারের হলও বেড়ে গেছে। তুলনায় সেই সংখ্যায় অবশ্যই নাটক লেখা হয় না। কিন্তু কথা হল যা আমাদের লেখা হচ্ছে বা যা এতকাল লেখা হয়েছে তার সম্পর্কে কি আমরা খুব বেশী উৎসাহী? না আমরা খুব বেশী শ্রদ্ধাশীল? আমি বলতে চাইছি যে, ক'জন আর বাংলা নাটক পড়েন বা তার খবর রাখেন? এই তো লাইব্রেরীতে কত বাংলা নাটকের বই সাজানো থাকে মাইকেল, দীনবন্ধু—ক'টা আমরা নিয়ে পড়ি বলুন তো? সেগুলোতে তো ধুলোই পড়ে। ধরুন, কোন বাংলা সাহিত্যের সভায় তাঁর সভাপতি বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, "এইবার আলোচনা করা হবে বাংলা সাহিত্যের সবথেকে দুর্বলতম শাখাটির—অর্থাৎ নাটক"। আলোচনার শুরুটা এইরকমভাবে! তাহলে দেখুন যে—কী হীনমন্যতায় বাঙালী নাট্যকারদের ভুগতে হয়। আপনারা জানেন যে আমাদের অনেকেরই বাংলা নাটক সম্পর্কে, মৌলিক নাটক সম্পর্কে, ধারণা সেই B. A. class-এ পড়েছিলুম সেই পর্যন্তই—'জনা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'শ্রীমধুসূদন'-এর বেশী নয়।

সত্যি কথা বলতে কী তারপরে আমরা নাটকের বই খুলে দেখেছি কিনা, খুব জোর গলায় আমরা কেউ বলতে পারবো না। তাই প্রকাশকরা কোনদিন বাংলা নাটক ছাপেন না,

সম্পাদকরা তাদের কাগজে বাংলা নাটক ছাপেন না। কচিৎ কদাচিৎ দু' একখানা ছাপেন তাঁরা যে নেহাৎ দায়ে পড়ে, না ছাপলেই নয় আর কী। তারা কোনদিন এই নাটককে খুব একটা উৎসাহ দেন না। আর প্রকাশকরা জানেন যে বিক্রীটিক্রী এইসব কোন ব্যাপার স্যাপারই নয়—কিছু কিছু ছাপতে হয় বোধহয়, তাই দশ, বারোখানা এইরকম ছাপা হয় সোম-বচ্ছরে। তা এতো গেল বাইরের লোকেদের কথা, থিয়েটারের নিজেদের লোকও বাংলা নাটক সম্পর্কে ঠিক কতখানি উৎসাহী? আমাকে একবার এক পরিচালক মশাই বলেছিলেন, "আপনি কি ঠিক করে বলতে পারেন যে, চেখভের নাটক ছেড়ে আপনাদের নাটক কেন করা হবে?" তিনি বলেছিলেন, যে, আচ্ছা ভেবে দেখুন তো চেখভের নাটক করলে আমরা গোড়াতেই প্রায় ৫০টা নম্বর ঘরে তুলতে পারি। ওটা চেখভের নাটক, দর্শকরা সবাই সমীহ করে আসবেন, কিন্তু আপনার বা আপনার মতো কারুর নাটক করতে গেলে গোড়াতেই তো ৫০টা নম্বর খোয়া যাবে। মানে বাইরের ওপর আমাদের একটা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা রয়েই গেছে এবং সে শ্রদ্ধা রাখা উচিত নিশ্চয়ই। চেখভের সাথে এদেশের নাট্যকারদের তুলনা নিশ্চয়ই করা যাবে না এবং তাঁর নাটক অবশ্যই করা উচিত। ব্রেখটের নাটক না হলে একটা মস্তবড় অভাব আমাদের রয়ে যেত। 'পুতুল খেলা' অভিনীত না হলে আজ আমরা বলতাম যে আমাদের দেশের থিয়েটার অনেকটাই পিছিয়ে আছে ধরে নিতে হবে। যেসব নাটক পৃথিবীর সর্বত্র হচ্ছে সেটা আমাদের দেশে হবে না—এ চলতে পারে না। আমি বাইরের নাটকের বিরুদ্ধে অবশ্যই কিছু বলছি না। এগুলি হওয়া উচিত। এতোদিনেও 'অয়দিপাউস' না হলে আমাদের লজ্জাই হতো। বাইরের নাটক করুন। কিন্তু ঐরকম একটা খোঁচা দেওয়া কেন যে আমাদের দেশের নাটক করলে দর্শকরা গোড়াতেই এক মুখ সিটকিয়ে বসে থাকবেন—এটা কেন? তাহলে যদি বাংলা নাট্যকাররা ঘুরে বলেন, যে, ঠিকই আজ আপনারা চেখভের নাটক করছেন বলে— মানে পাচ্ছেন বলে করতে পারছেন, আমরা যদি স্তানিশ্লাভস্কিকে পেতাম তাহলে আপনাকে দিয়ে করাতাম না। তাহলে উভয় পক্ষেই কিছু কিছু বলার রয়ে যায়। কিন্তু কথা হল যে এই অবজ্ঞাই বলুন, অবহেলাই বলুন, আর এই ঔদাসীন্যই বলুন, এর মধ্যে বাংলা নাটক কিছু কি কম হয়েছে? বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, আমাদের বিজনদা—বিজন ভট্টাচার্য মহাশয়—এঁরা যা লিখেছেন তা কি বাংলা সাহিত্যের অনান্য শাখায় যারা সেবা করে থাকেন, লিখে থাকেন, তাঁদের থেকে গুণগতভাবে কোন অংশে কম? এঁদের সবারই ২/৩টি করে নাটক—অবশ্যই ২/৩টে করে নাটক রয়েছে, যেগুলো প্রায় বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। এঁদের লেখা সম্পর্কে আমরা ঠিক কতখানি কৌতূহলী। বা এঁদের এঁদের লেখার গুণ সম্পর্কে আমরা কতখানি সচেতন? আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, "জানো তোমাদের নাটক লেখাটা খুব সোজা।" আমি বললাম "কী রকম করে?" তিনি গল্প এবং উপন্নাস লিখে থাকেন। তা তিনি বললেন "এটা তো খুবই সোজা ব্যাপার। মানে তোমাদের তো পুরো sentenceও লিখতে

হয় না"। আমি বললুম, "কী রকম"? "না লোকের মুখের যে সংলাপ সে তো 'আমি ভাত খাইতেছি'—এইরকম একটা পুরো sentence হয় না। কই? ভাত কই? এই বললেই হয়ে যায় একটা সংলাপে। তারপর stage direction-এ তোমাদের শুধু 'প্রবেশ' আর 'প্রস্থান' এই একটা করে শব্দ লিখলেই হয়ে যায়। আর ধর তোমাদের যে পাত্র পাত্রী, তাদের নাম তাও তো পুরো লেখার দরকার হয় না। আপনারা যারা নাটকের পাতা খুলে দেখেছেন জানেন যদি একটা চরিত্রের নাম থাকে নীলকমল তাহলে সেখানে পাশে 'নী' লিখলেই চলে যায়। বন্ধু সেটাই বললেন আর কী। আরো বললেন যে এতে তো বানান শুদ্ধিরও দরকার হয় না। শুদ্ধ বানান জানারও দরকার হয় না। আমি বললাম কেন? বললেন, 'ধরো যদি লেখা থাকে, ব্রাকেটে লেখা আছে, 'অট্টহাসি' তা অট্টহাসিটার অট্টকে যদি 'অটা' করে লেখা হয় তাতে মশাই কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? তাতে কি ভীমের অট্টহাসি মঞ্চের ওপরে কিছু কমে? কিছুই তো কমে না। তাহলে তো তোমাদের নাটক লেখা খুবই সোজা। লেখাও যা না লেখাও তা। সহজ হিসাব। খানিকটা খানিকটা হয়তো বা সত্যি হতে পারে, আমি ঠিক ঠিক জানি না—কিন্তু কথা হ'ল এই যে এইরকম ভাবে তুলনা করাটা কি ভালো? একটা কবিতা লিখতে গেলে আমার মনে হয় যে গভীরতা এবং যে নিষ্ঠার দরকার, যে সৃজনশীলতার দরকার, একটা নাটক লিখতে গেলেও হয়তো সেই একই পর্যায়ের গভীরতা এবং সৃজনশীলতার দরকার হয়। কাজেই এইভাবে দুটো সাহিত্য শাখার তুলনা করাটা উচিত নয়। তবে নিজেরা আমরা নাটকের সঙ্গে যুক্ত বলে আমি মাঝে মাঝে মনে করি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে বরঞ্চ নাটক লেখাটা অন্য লেখার থেকে একটু বেশী কঠিন। কঠিন এই কারণে সমান সৃজনশীলতার সঙ্গে এখানে আর এক ধরনের skill-এর দরকার আছে। কী রকম? না ধরুন যে বই-এর পাতায় কালো কালো অক্ষরে একটা মানুষের পরিচয় লেখা একটা জিনিষ—আর একটা জ্যান্ত মানুষ মঞ্চে তুলে আড়াই ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা—সেটা আর একটা ব্যাপার। Definitely না, আর একটা ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোন ভুল নেই যে বইএর পাতায় একটা চরিত্রের আপনি এক পিঠ বর্ণনা করে গেলেন, কিন্তু আমাকে সেই লোকটাকে তার তিন পিঠ—তার সামনেটা, তার পেছনটা, তার ঘাড়টা, তার মাথাটা, তার বাড়ি তার ঘর—তার সব দেখাতে হচ্ছে। সে একটা জ্যান্ত রক্ত মাংসের মানুষ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি হওয়া উচিত? এই যে extra বা এই যে অতিরিক্ত ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা নাটকের। তাঁর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার। আমরা গ্রুপ থিয়েটারের লোক, আমরা গ্রুপ থিয়েটারের জন্য যখন লিখি তখন আরো একটা ব্যাপার খুব বেশী মাত্রায় অনুভূত হয়। আমাদের কী রকম লিখতে হয়? না আমাদের লিখতে হবে, মৌলিক নাটকের কথা আমি বলছি, যে মৌলিক নাটক মানে যেটা ধার করা নয়—আমরা এখানে বসে লিখছি, তা আমাদের এমন একটা নাটক গ্রুপ থিয়েটারের জন্য লিখতে হচ্ছে বা লিখতে হবে যে, যার মঞ্চের ওপরে দুটোর বেশী তিনটে দৃশ্য থাকবে না,

মানে set setting বেশী থাকবে না। Group theatre-এর অবস্থাটা আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন তো, যে কী টানাটুনির মধ্যে আমাদের পড়তে হয়, কিভাবে আমাদের কাজ করতে হয়—আমাদের তো বাঁধা মঞ্চ নেই। এখানে একবার করবো, এখান থেকে কাঁধে করে সব বয়ে নিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় করবো সেখানে কী সুবিধা পাব না পাব কেউ তো আমরা জানি না। আমরা কাটোয়ায় একবার থিয়েটার করতে গিয়েছিলুম। সেখানকার মঞ্চটা—আগের দিন ঝড় হয়ে গিয়েছে—তার ছাতটা এইরকম নীচে প্রায় একটা মানুষের মতো এইরকম নীচে নেমে এসেছে—সেখানে আমাদের করতে হলো নাটক। আবার আলো টালোর ব্যবস্থা ট্যাবস্থা যত কমের ওপরে করা যায় ততটাই তো ভালো। তাই খুব একটা পছন্দ মতো, যা আপনার প্রাণে চায়, আপনি লিখে যেতে পারেন না! উপন্যাসে পারেন—যা আপনার প্রাণে চায় লিখে যান। আমাদের এখানে যা প্রাণে চায় তাই লেখা যায় না। তারপর ধরুন মহিলার ব্যাপার আছে। আমার তো মনে হয় বিশ্বে বাঙালী নাট্যকাররাই একমাত্র নাট্যকার যারা একটা এবং দুটো মহিলার মধ্যে তিন ঘণ্টার নাটক লিখতে পারেন মশাই। Definitely, আপনি কোথাও আর দেখবেন না। ২০টা ছেলে থাকবে আর মহিলা ২ জন। Maximum. এর মধ্যে লিখে যেতে হবে—বড় চাট্টিখানি কথা নয়। এই অবস্থার মধ্যে লিখতে হয়—বুঝলেন। অনেক সময় সাহিত্যিকদের বলা হয় আপনারা কেন নাটক লিখে আমাদের নাট্যকে উন্নত করলেন না? তা ওঁরা তো জানেন যে এক একটা উপন্যাসে তাঁরা যা খুশী যেমন খুশী লিখে যাচ্ছেন এখানে এসে তো অতটা করা সম্ভব নয়। জানেন তাহলে সেই নাটক cold storage-এ রেখে দিতে হবে। সাতটা মহিলা থাকলে যে যতই সাহিত্য হোক কিছু করার নেই। এই স্বাধীনতাহীনতার মধ্যেই তো আমাদের কাজ কম্মো করতে হয়। আমাদের লিখতে হয়। তাই আমার মনে হয় যে সাহিত্য সভার সভাপতি যখন নাট্যকে বলেন দুর্বলতম শাখা তখন তাঁকে লম্বা স্যালুট করা উচিত। অবশ্যই আমাদের এখানে আর একটা থিয়েটার আছে। আমি তো group theatre এর কথা বললুম। আর একটা আছে বাণিজ্যিক থিয়েটার। সেখানে এই দৈন্য নিশ্চয়ই নেই। প্রচুর টাকা আাছে এবং অনেক কিছু সেখানে করা যায়, বহু কিছু করা যায়। তা আমি একজন প্রবীণ নাট্যকার মহাশয়কে যিনি দীর্ঘকাল একটা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা রূপে, নাট্যকার রূপে, নির্দেশক রূপে (এখন অবশ্য অবসর প্রাপ্ত)—বলেছিলাম যে আপনারা তো কত ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তা তিনি বললেন যে আমরা কি এতকাল নাটক লিখেছি? আমরা তো চাকরগিরি করেছি। আমি বললুম যে কী কথা মশাই, আপনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি বললেন চাকরগিরি ছাড়া কি? আমাদের এই পেশাদার মঞ্চগুলোয় ফিল্ম থেকে সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসেন। একটা নাটকে ছিল যে নাটকের মূল চরিত্রটা হচ্ছে গ্রামের চাষাভূষো। তা মূল অভিনেতা তিনি এসে বললেন মশাই। আমাকে হাঁটুর উপরে কাপড় পরে হুঁকোয় তামাক খেতে হবে নাকি? একি কখনও হয়? আমার একটা ইমেজ

আছে না? অভিনেত্রী এসে বললেন সে কি? সিনেমার কাগজে আমার কীরকম ছবি বেরোয় দেখেছেন তো? বড় বড় চশমা টশমা দিয়ে বেরোয়। আমি ঐ ছেঁড়া কাপড় পরে মঞ্চে ঘুরব কী করে? আপনি লিখবেন এমন একটা দৃশ্য, সেখানে আমার সাজগোজ প্রসাধনের কিছু ব্যবস্থা করা থাকে। নাট্যকার প্রায় বিশ্বকর্মার মতন মশায়। সেই চাষা ভূষোর ওখান থেকে নাটক ঘুরিয়ে নাট্যকারকে সেই ব্যবস্থাই করে দিতে হ'ল অতএব। হিরো কবে স্মার্ট প্যান্ট পরবেন, কোর্ট নেটটাই পরবেন আর হিরোইন কবে বড় চশমায় সাজগোছ করবেন—সব ব্যবস্থা করে দিতে হল। একেই তো চাকরগিরি বলে। আজকাল তো আরও অনেক কিছু করতে হয়। যেখানে কিছুই নেই—তার মধ্যে একটা নাচ গান একটা ক্যাবারে ট্যাবারে নানারকম সমস্ত, ঢুকিয়ে দিতে হয়। এইসব প্রতিভাধর ব্যক্তিদের এই ভাবেই তো কাজে লাগানো হয়, এইভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে এক ধরনের দাসত্ব বৃত্তি। তাই মনে হয় বেঁচে থাক আমাদের group theatre আমাদের দৈন্য।

আমাদের এই নাটকে, আমাদের এই মৌলিক বাংলা নাটকের চরিত্রটা ঠিক কীরকম? আমার এক অধ্যাপক তিনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় দুই তিনজন বাঙালীর মধ্যে একজন—যিনি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "জানো আমি যখন নাটক বা শিল্প সাহিত্য বিচার করি তখন তোমাদের এই বাংলা নাটককে গোড়াতেই আমি ৫০টা নম্বর দিয়ে রাখি।" আমি বললাম "সেকি। এতো অবাক কাণ্ড। আপনি আমাদের এই ঐশ্বর্যময় গল্পকে দেন না, আপনি আমাদের এই ঐশ্বর্যময় উপন্যাসকে দেন না, কবিতাকে দেন না—আপনি আমাদের এই তুচ্ছ বাংলা নাটককে ৫০টা নম্বর গোড়াতেই দিয়ে রাখেন? এ কি করুণার জয়?" তিনি বললেন, "না না মোটেই তা নয়। বাংলা নাটক একমাত্র মাধ্যম যে মানুষের জীবন, মানুষের সমাজ, মানুষের অবস্থা, মানুষের দুঃখ কষ্ট, মানুষের প্রতিবাদ মানে মানুষের সব কথা সে বলে এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে বলে। সবাই বলে, কিন্তু সবাই ছুটিও নেয়। বছরে বহু উপন্যাস লেখা হয়। তুমি দেখবে যার মধ্যে পাঁচটা হয়তো মানুষের কথা বললো—কুড়িটা বললো না। কিন্তু এমন একটা মৌলিক নাটক তুমি খুঁজে পাবে না যে নাটক মানুষের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কিছু বলে বা নিছক হাসি ঠাট্টা বা গল্পগাছা করবার জন্য লেখা। Group theatre-এ এইরকম নাটক পাবে না, কিংবা হাজারে হয়তো একটা পাবে। যে ব্যতিক্রমহীন ভাবে মানুষের এই সংগ্রামের কথা, প্রতিবাদের কথা, বা এই যে আমাদের ওপরে যে উৎপীড়নগুলো চলে, অত্যাচারগুলো চলে সে সব কথা সে সবসময়ই বলে। ছোট নাটকও বলে, বড় নাটকও বলে। শহরে বলে, গ্রামের দিকেও বলে। ভালো সময়েও বলে, মন্দ সময়ে তো বলেই। যখন কেউ কোন কথা বলতে পারে না—এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশ যখন থাকে তখনও, তখনও সে বলে। তাহলেও কেন আমি বাংলা নাটককে ৫০ নম্বর দেব না?" এই বাংলাদেশের নাটকে বিজনদা 'দেবীগর্জন' লিখেছিলেন, বিজনদা 'গর্ভবতী জননী' লিখেছিলেন, মোহিতবাবু 'রাজরক্ত'

লিখেছিলেন, উৎপল দত্ত 'মানুষের অধিকার', 'টিনের তলোয়ার' লিখেছিলেন—শুধু এইরকম কয়েকটি অসাধারণ নাটকই নয়, আপনি যেখানে যে নাটকটা দেখতে যাবেন দেখবেন মানুষের কথা একইভাবে একইরকম বিস্ফোরিত হচ্ছে। আবার লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে আমাদের সিনেমা যখন যা-তা কাণ্ড করে—তখন এত দৈন্যের মধ্যে, এত কষ্টের মধ্যে, থিয়েটারের লোকেরা, কী কাণ্ড করছে আপনারা সেটা দেখুন। আপনারা সবাই নাট্যানুরাগী। আমার মনে হয় যে এই মৌলিক নাটককে ঠিক এতটা অবহেলা, এতটা অবজ্ঞা করার মতো কিছু নেই। নমস্কার। যদি বেশী কিছু বলে থাকি অন্যায্য কিছু বলে থাকি ক্ষমা করে দেবেন। চটপট এইরকম ঠিক ঠিক কথা বলে যাওয়া খুব মুস্কিলের ব্যাপার তো। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, বিজন থিয়েটারকে নমস্কার জানিয়ে, বিজনদার স্মৃতিকে প্রণাম জানিয়ে আমি শেষ করছি।

উৎস : সায়ক নাট্যপত্র, ১২ আগস্ট ১৯৭৯

মনোজ মিত্র এবং
মোহিত চট্টোপাধ্যায় মুখোমুখি
সাক্ষাৎকার গ্রহণে : বিভাস চক্রবর্তী ও চন্দন সেন

চন্দন সেন।। নমস্কার, আমাদের আজকের আলোচনাটা যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কোন formality থাকবে না, অর্থাৎ খোলামেলা আলোচনা, তাই পাশাপাশি যে দু'জন আমার ও বিভাসদার সঙ্গে আছেন তাদের সম্পর্কে আমার নিজস্ব প্রতিবেদন আমি দুটি লিমেরিকের মাধ্যমে প্রথমে নিবেদন করতে চাই—প্রথমটি হচ্ছে—বিজ্ঞানীদের আর্যভট্ট—তুলেছিল বটে—তুমুল হট্ট—থেমে গেল যেই, /ক'দিন পরেই—দম ফেলে জোরে, /কাজ শেষ করে,/ গেল হায়, তার অহং কট্টু ।/ আমরা যাহারা নাটকে নট্ট, আমাদেরও আছে মোহিত চট্ট—তিনি মাঝে/ বহুদিন, শুধু পর্দানসীন, এখনও বিরতির শেষে মাতা হাসি/ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে অমর নাট্য। আর একটি/ তিনি একাডেমীর নিত্য যাত্রী/ আছে নাটাবোদ্ধা নেমপ্লেট।

(আমি একজন ভদ্রলোককে উদ্দেশ করেই বলছি)/ বলেন অপগণ্ড সবাই এখন—তাই কিনুক সহজপাঠ আর স্লেট।

সেদিন 'অলকানন্দা' দেখে ফিরে/ বলেন মাথা নেড়ে ধীরে/
"উঁহু: সানডে টাইমসে—বেরিয়ে গেছে
তিনি মনোজ মিত্র ডুপ্লিকেট।"
এবার বিভাসদা শুরু করুন।

বিভাস চক্রবর্তী।। আজকের অনুষ্ঠানটি খুবই ভালো লাগছে আমার, কারণ 'সায়ক'-এর আজ অষ্টাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, সায়কের বহু অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। ওরা যেসব অনুষ্ঠান করেন তা খুবই মনোরম এবং খুবই আন্তরিক। আজকে যে দুজনকে ওরা সম্মান জানানোর জন্য অনুষ্ঠান করছেন, এই দুজন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এইজন্য আরও ভালো লাগছে। এর আগেরবার আমি উৎপলদার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি—এই সায়কেরই অনুষ্ঠানে। আমি উৎপলদাকে অনেক নীচু থেকে দেখেছি কেননা ওঁকে আমরা অনেক উঁচু আসনে স্থান দিই। আজকেও আমার ভালো লাগছে এই কারণে যে পাশাপাশি বসে আমার দুই নিকট ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।

যাই হোক আমি প্রথমেই প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। কারণ এখানে খুব একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও নেই, দ্বিতীয় কথা সময় খুব সংক্ষেপ। আমি প্রথমেই মনোজ এবং মোহিতকে যে প্রশ্ন করব, দুজনকেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রথমে মোহিত—যেহেতু বয়সে মনোজের থেকে বড়, আমার থেকেও কিঞ্চিৎ বড়।

আমি দু'জনের মাঝামাঝি আছি। মোহিতের থেকে ছোট, মনোজের থেকে অল্প বড়, সুতরাং আমার এই প্রশ্ন মোহিতের দিকেই প্রথম যাবে। প্রশ্নটা হচ্ছে : মনোজের কাজের মধ্যে কোন জিনিসটা—কোন দিকটা, নাট্যকার হিসেবে আপনাকে বেশী আকৃষ্ট করে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আমি যখন নাটক লেখা শুরু করিনি, মনোজের নাটক আমি দেখেছি। বয়সে আমি মনোজের থেকে কিঞ্চিৎ বড়ো হলেও নাটক লেখার দিক থেকে মনোজ আমার থেকে বড়ো। মনোজের নাটক আমার বরাবরই ভালো লাগে। আমি একটা জিনিস মনোজের মধ্যে দেখতে পাই, খুব সহজেই মনোজ মানুষের সার্বিক আবেদনকে, ভাবনাকে, সুন্দরভাবে—সহজভাবে তার নাটকের মধ্যে আনতে পারেন, তার ফলে সেই নাটকটা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে শুধু নয়, বেশীর ভাগ মানুষই, অধিকাংশ মানুষই দ্রুত উপভোগ করতে পারেন, মনোজের এটা একটা অশেষ গুণ। আমরা সাধারণত ভাবি, যে নাটক খুব জনপ্রিয় হয়—সেই নাটক বোধহয় হাল্কা হয়। মনোজ সেই সাধারণ ধারণাটিকে বদলে দিয়েছেন। মনোজ প্রমাণ করেছেন তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে যে, একটা গভীর এবং সুক্ষ্ম ভাবনাকে অত্যন্ত মজা করে তোলা যায়—অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এটা একটা সত্যি বড় গুণ। বিভাস একজন পরিচালক হিসাবে এটা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন আরও ভালো করে। আমার মত একজন নাটক লিখিয়ে মানুষ, নাটক লিখতে গিয়ে যখন নিজের মধ্যে বারংবার অসম্পূর্ণতা টের পাই, মনোজের লেখার মধ্যে দেখি তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আরও অনেক কথা আছে কিন্তু সময় খুব কম বলে এইটুকুর মধ্যেই আমি বললাম।

বিভাস চক্রবর্তী।। আমি ঠিক এইটাই চেয়েছিলাম যে বিশেষ কোন্ দিকটা মনোজের নাটক আমাদের আকৃষ্ট করে। মোহিত কথা প্রসঙ্গে আমার কথা বললেন, তা আমি বলি কী যে, হ্যাঁ—আমি 'থিয়েটার ওয়ার্কশপে' থাকতে মোহিতের দুটি নাটক 'রাজরক্ত' ও 'মহাকালীর বাচ্চা' পরিচালনা করেছি এবং মনোজের তিনটি নাটক 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার' এবং 'অশ্বত্থামা' পরিচালনা করেছি। আমার কাছে কিন্তু দু'জনেই একটা অদ্ভুত সুযোগ এনে দিয়েছেন তাঁদের নাটকের মধ্যে দিয়ে, আমার ভাবনা চিন্তার কথা, যে সমস্ত বোধ, সেগুলো প্রকাশ করার। মোহিত একভাবে, মনোজ আরেকভাবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আমি যাচ্ছি না। এবার আমি মনোজের কাছে শুনতে চাই নাট্যকার হিসাবে মোহিতের কোন্ দিকটা মনোজকে বেশী আকৃষ্ট করে?

মনোজ মিত্র।। আমাদের সময়ে আমি ওঁকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিই—গুরুত্ব দিই, নাট্যকার হিসাবে ওঁকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি, সেকথা আমি ওঁকে দেওয়া মানপত্রে লিখেছি—জেনে বুঝেই লিখেছি—না বুঝে নয়। তিনি এমন একজন লেখক যিনি তাঁর রচনায় বিষয়ের ক্ষেত্রে, প্রকরণের ক্ষেত্রে, গভীরতার ক্ষেত্রে শুধু থিয়েটারের নয়—কারুর কাছেই এক পণও ধারেন না। তিনি অনন্য এবং স্বতন্ত্র একটা জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন ৬০-এর

দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সেই সময় আমরা অনেকেই জানতাম না ঠিক কী ভাবে, কেমন করে আমাদের থিয়েটারে দেশ এবং কালকে ধরা যেতে পারে। এই ব্যাপারে তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমার অসাধারণ লেগেছিল 'রাজরক্ত', কিংবা 'মহাকালীর বাচ্চা'—এর বিষয়ের যে গুরুত্ব, সমকালীনতা—এটা অসাধারণ। প্রকরণের দিক থেকে তিনি যে কতখানি পূর্ণ, কতখানি আধুনিক, কতখানি স্বতন্ত্র—এটা আজ আর আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না। এরপর আছে তাঁর অকপট ও অসাধারণ সংলাপ রচনা। কে না জানেন স্বচ্ছতা, অকপটতা এবং সরল উদ্দেশ্যমুখীনতা সংলাপ রচনায় উৎকর্ষতা বাড়ায়। অনেকে মাঝে মাঝে বলেন আমার সংলাপের কথা। কিন্তু আমি মোহিতবাবুর নাটকের সংলাপ ব্যবহারের অকপটতাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। সেটা তার 'রাজরক্ত' নাটকের মধ্যেও আছে। কেমন সরল সাবলীলভাবে বলে যেতে পারেন। ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি বোধহয় আমার হাসির নাটকগুলোর লেখার একটা প্রেরণা বা কোথাও আমার একটা ঋণ রয়েছে, ওঁর কাছে, ওঁর প্রথম দিকের নাটকগুলোর কথাই এসে পড়ে এক্ষেত্রে যেমন—'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'। মোহিতবাবু দেখিয়েছেন যে কোনও পরিস্থিতিকে কত সরলভাবে সহজে, আক্রমণ করা যায়, বিভাস হয়তো আরও ভালো বলতে পারবেন, যে মোহিতবাবুর নাটকে সরলতার মধ্যেও অসাধারণ চাতুর্য থাকে, বোধহয় কথাগুলো স্ববিরোধী বলে মনে হচ্ছে, এগুলোর আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে—যেমন বহু জটিল পরিস্থিতি কী সহজে, অল্প সংলাপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, পরিষ্কার করে দিতে পারে, এটা আমি খুব অনুভব করেছি এবং বোধহয় তার রচনার এই দিকটা আমাকে প্রভাবিত করেছিল অনেকটা।

বিভাস চক্রবর্তী।। এবার আমি চন্দনকে এর পরের প্রশ্ন করার সুযোগ দেব। তার আগে আমি শুধু বলতে চাই 'সায়ক' খুব ভালো ব্যাপারটা করেছেন। এই রকম ঘরোয়া আড্ডায় মনোজ এবং মোহিত উভয়কে সম্মান দিচ্ছেন, আমি আর চন্দন প্রশ্ন করলাম উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে বললেন। এই ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো লাগছে। আমার বেশ মনে পড়ছে এই রকম ঘটেছিল ঋত্বিক ঘটক মারা যাবার পর আমি যখন সত্যজিৎ রায়ের কাছে গেছিলাম interview নিতে, তিনি এত সুন্দর অকপটে, খুব বিনয় করে নয়, —কিংবা মহানুভবতা দেখানোর জন্য নয়, বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের কী কী গুণ আছে এবং যেটা উনি স্বীকার করেছিলেন যে এগুলো আমরা পারব না। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া, এগুলো ঋত্বিক ঘটক যেভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতেন তা উনি বলেছিলেন 'আমি অন্তত পারব না,'। ঠিক এখানেও আমার শুনে খুব ভালো লাগছে যে মনোজ এবং মোহিতও উভয় উভয়েরই কাজের প্রতি এতটাই সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখেন, এতটাই ভেবেছেন এবং একে অপরকে অনুপ্রাণিত করছেন। এবারে চন্দন—

চন্দন সেন।। আমার প্রশ্ন মোহিতদার কাছে। মোহিতদা, আপনি তো শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে—'এভাবেই দিন যায়, এভাবেই দিন', ৬০-এর দশকের আমাদের প্রিয়তম কবিতার একটি। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে—মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবেন। কিন্তু আকস্মিকভাবেই আপনি নাটকে বাঁক নিলেন। আপনি এরপরে আর কোনোদিন কবিতা লেখেননি। এর পেছনে কারণটা কী যদি সংক্ষেপে বলেন।

বিভাস চক্রবর্তী।। মোহিতকে বলব কিছুদিন আগে একটি আলোচনায় খুব মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলো বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে, সেগুলো যদি আবার বলেন, এখানে যেসব শ্রোতা এবং দর্শক আছেন তারা খুব উপকৃত হবেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আসলে আমার মুখস্থ শক্তি খুবই খারাপ (দর্শকদের হাসি) আমি সেদিন আলোচনায় ঠিক যা যা বলেছিলাম সবটা আমার মনে নেই। তবে যে ধাকা থেকে সেদিন আমি কথাগুলো বলেছিলাম তার খানিক খানিক মনে আছে কারণ সেগুলো আমার কাছে সত্য কথা।

এককালে আমি কবিতা লিখেছি এবং আমার নিজেরও মনে হয়েছিল যে কবিতার মধ্যেই আমি বোধহয় থেকে যাব। কবিতার বাইরে আর কোথায় যাব? সেই ভেবেই আমি কবিতা লিখছিলাম। আমি যখন নাটক লিখতে শুরু করলাম তখন কেউ কেউ, বিভিন্ন সময়ে, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার কাছের মানুষও বলেছিলেন মানে তাদের ধারণা যে, আমি কবিতার মধ্যে নিজের যে সংসার পেতেছিলাম এবং তাতে যে খানিক প্রতিষ্ঠা ছিল আমার, সেটা বোধহয় ত্যাগ করেই আমি নাটকে চলে এসেছি। কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। আমি অকপটে বলছি যে আমি কিছুই ত্যাগ করিনি, ত্যাগ করা যায় না। যে কোনও মানুষই শিল্পকর্মের মধ্যে যদি জড়িত থাকে, সেই শিল্পগত বিষয়ের তাড়নায় যদি অশান্ত থাকে, তাহলে তার সাধ্যি হয় না তা ত্যাগ করার। ত্যাগ ঠিক করিনি, তবে আমার নিজের মনে হয়েছিল আমি যে কবিতাগুলো লিখছি সেই কবিতার মধ্যে নিজেকে আর খুশী করার মতন কিছু পাচ্ছি না। যেন আমার কাছে কবিতা-গুলোর প্রাণ কিছু কমে যাচ্ছে, তার সজীবতা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি তার জের টেনে চলতে চাইনি। আমার নিজের ধারণা সেই সময়কার বন্ধুবান্ধব, যশস্বী ও অত্যন্ত নামী দামী বন্ধুবান্ধব, তাঁরা সেই সময় যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন, প্রবল ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে পারেননি। একজন শিল্পীর জীবনের সব থেকে দুঃখজনক মুহূর্তটা হল এটাই, তার crisis তখনই, যখন তাঁর বর্তমান থেকে তাঁর অতীতটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং কিছুতেই অতীতের চেয়ে উজ্জ্বলতর কিছু করতে পারছেন না। তখন অনেকে তার অতীতের জের টেনে চলেন। আমি সেই জেরটা টেনে চলতে চাইনি। আমি ভেবেছি এখন আমার থামা উচিত—বিশ্রাম নেওয়া উচিত, আমার বোঝা উচিত, আমার দেখা উচিত যে নতুন

করে কবিতা কোন তরঙ্গ তুলে আমার কাছে আসে কিনা! না এলো, এলো না। আমি কবি হওয়ার জন্য আসিনি, আমি নাট্যকার হওয়ার জন্যও ঠিকমতো আসিনি। আমি একটা প্রকাশভূমি চাইছিলাম—নিজের ভেতরের কথা, নিজের যে ভাবনা-চিন্তা—বলবার জন্য। যাকে আশ্রয় করে এই সবকিছু বলতে পারবো তাকেই আশ্রয় করতে রাজী ছিলাম। তখনই আমি নাটকের মধ্যে এলাম। বিভিন্ন মিডিয়ামের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালো লাগে। 'Jack of all trades master of none' আমার কাছে Jack অতি প্রিয় চরিত্র যে নানান trade-এর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেই ভাবেই আমি কবিতা থেকে নাটকের মধ্যে আসতে চেয়েছিলাম। আর সেই নাটকের মধ্যে আসাটাও আকস্মিক নয়। কোন কিছুই আমার কাছে আকস্মিক মনে হয় না। গাছে যখন একটা গোলাপ ফোটে, তখন শেকড় থেকে আরম্ভ করে একেবারে শিখরদেশ পর্যন্ত ঐ গোলাপ ফুলটা ফোটাবার জন্যই একটা প্রক্রিয়া থাকে। তা না হলে সেখানে গোলাপ ফুটত না, অন্য কিছু ফুটে উঠত। সে রকম আমি যে নাটক লিখেছি, খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার অনুভব- অনুভূতি—অভিজ্ঞতার জন্য যেদিন থেকে হয়েছে, সেই দিন থেকেই আমার মধ্যে নাটক লেখার একটা প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে নাটক লিখব কেমন করে? আর কবিতা আমাকে সাহায্য করেছে এই নাটক লিখতে। কবিতাই আমাকে বলেছে নাটক লিখতে, নাটক আমাকে নাটক লিখতে বলেনি। যদি কিছু স্বাতন্ত্র্য আমার নাটকের মধ্যে থাকে, যদি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য আমার নাটকের মধ্যে ফুটে উঠে থাকে, আমার ধারণা—তা আমার কবিতা লেখার চরিত্রের জন্য। আমার কবিতা লেখার যে মনটা ছিল, যে চোখটা ছিল, যে অনুভব শক্তিটা ছিল, তা আমাকে সব সময় নতুন করে দেখিয়েছে, আমায় ভাবিয়েছে, চিন্তা করিয়েছে তার ফলে আমার নাটকে একটা ফারাক এসেছে প্রচলিত নাটকের থেকে। কবিতা এইভাবেই কাজ করে। কবিতা আমি ছেড়ে দিই নি। তার নির্যাসটা আমি বহন করেছি মাত্র। আমি মনে করি কবিতা একটা অবয়ব নয়। যেমন আমরা বইতে ছাপা দেখি কবিতার কতকগুলো লাইন সাজানো থাকে—ছন্দ থাকে, ওটাই কিন্তু কবিতা নয়। ওটা একটা দেহ। তার ভেতরে কবি মনের যে spirit-টা থাকে সেই spirit দিয়ে একজন মানুষ কবিতা ছেড়ে দিয়ে, ঐ কবিতার বোধ দিয়ে একজন নারীকেও ভালোবাসতে পারে কোন সৃষ্টিকর্ম না করে। ঠিক তেমনি আমার ভেতরে কবিতার যে spirit ছিল, কবিতার যে current ছিল—তরঙ্গ ছিল, তাকে আমি নাটকের মধ্যে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলাম—তখনকার সংলাপে, তখনকার situation-এ তখনকার বিভিন্ন চরিত্রের পরিণামে, অনুভব সৃষ্টিতে, মুড রচনায় নানাদিক থেকে। কাজেই কবিতা আমার কাছ থেকে চলে যায়নি। কবিতাকে আমি অন্য একরকমভাবে প্রয়োগ করেছি বলা যায়। আমার বারবার মনে হয় আমাদের বাংলা নাটকের মধ্যে যদি বড় একটা পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে তার মধ্যে কবিতার প্রাণশক্তি প্রবাহিত হওয়া দরকার। কবিতা একটা বদল এনে দিতে পারে, কবিতা ভয়ানকভাবে একটা চারিত্রিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে

যা সাধারণভাবে নাটকে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি যে শুরুতে যে সমস্ত ক্ল্যাসিকাল নাট্যকার ছিলেন তারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন। কবিতা আর নাটকের মধ্যে বিশেষ কোনো ফারাক নেই, তার বড় প্রমাণ কালিদাস—কবি না নাট্যকার, সেক্সপীয়র—কবি না নাট্যকার, কি বল? সেক্সপীয়র কবিতা লিখেছেন গুটিকতক, নাটকই লিখেছেন অধিকাংশ। তবু আমরা তাঁকে বলি কবি। ইউরিপিডিসের রচনা, অন্য প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের রচনা, ব্রেখটের রচনার মধ্যে দেখা যাবে অগাধ কবিতার হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। কবিতার নানারকম সম্মোহন তার ভেতর কাজ করছে। বহু শ্রেষ্ঠ নাটকে এইভাবে কবি ও নাট্যকার একাকার।

তাই আমিও এইটুকুই বলতে চাই যে আমি কবিতা ঠিক ছাড়িনি। কবিতা আমার মধ্যে নিহিত ছিল—তাকে আমি আমার নাটকে প্রয়োগ করেছি। কবিতাকে নাটকের মধ্যে প্রয়োগ করে যদি আমি শান্তি পাই তো পেলাম। আবার কোনো একটা মুহূর্তে হয়তো আমার কবিতা লেখার ইচ্ছা হতে পারে, তখন কবিতা লিখবো, এটা তো কবিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ নয় একটু দূরত্ব মাত্র, আর কিছুই না।

চন্দন সেন।। এখানে আমরা যে চারজন বসে আছি—তার মধ্যে চারজন কিছু না কিছু নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে মোহিতদা শুধুমাত্র নাটকই লিখেছেন—পরিচালনা বা অভিনয়ে তিনি যাননি, মনোজদা শুধুমাত্র নাট্যকারই নন, তিনি অভিনেতা ও পরিচালকও বটে, এখন মনোজদাকে আমি প্রশ্ন করছি যে তিনি যদি শুধুমাত্র নাট্যকার হতেন তাহলে তাঁর নাটকের অবয়বে বা নাটক রচনার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসত কি?

মনোজ মিত্র।। এটা বলা খুবই মুস্কিল। মুস্কিল এই কারণে নিশ্চয়ই যা হয়েছি তা না হয়ে অন্যরকম হলে নিশ্চয়ই অন্যরকম হতো। (দর্শকদের হাসি)।

বিভাস চক্রবর্তী।। আসলে প্রশ্নটা একটু বিস্তারিতভাবে করি—তাহলে মনোজ পাশ কাটাতে পারবে না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আসলে একটা মুশকিল হয়েছে। আমি যখনই মনোজের দিকে তাকাই তখন আমার মনে হয় আমি তিনজন মনোজকে দেখছি। গোড়ায় দু-একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন মুখোমুখি ব্যাপারটা কী? সাধারণত মুখোমুখি বলতে একটা সংঘর্ষ বোঝায় (দর্শকদের হাসি)। যদি কোনও মিনিবাস লরির মুখোমুখি হয়—তাহলে তার পরিণাম কী হয়?

বিভাস চক্রবর্তী।। আমরা তো মাঝে ট্রাফিক পুলিশ আছি। (দর্শকদের হাসি)

মনোজ মিত্র।। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশকে নিয়েই তো ভয়। (দর্শকদের হাসি)

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আর একজন বলেছিলেন যে দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—সংঘর্ষ নয়, দুঃখ তো নয়ই—এই মুখোমুখি হল—গভীর সুখে সুখী।

বিভাস চক্রবর্তী।। এই যে মনোজের বিষয় মোহিত বললো—আমি তিনজন মনোজকে

দেখছি, থ্রি ইন ওয়ান, এটাই আমি বলতে চাইছি, অর্থাৎ মনোজ নাট্যকার, মনোজ পরিচালক, মনোজ অভিনেতা, এই তিনটি ক্ষেত্রেই মনোজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বিশেষ করে সাম্প্রতিক-কালে মনোজ যে একের পর এক কাজ করছেন, একের পর এক যেভাবে নাটক লিখছেন, প্রযোজনা করছেন, এবং অভিনয় বলাই বাহুল্য, টেলিভিশন, সিনেমা এবং থিয়েটার। এই বিভিন্ন মাধ্যমে কাজগুলো করতে গিয়ে, বিশেষ করে থিয়েটারের ক্ষেত্রে, এই কাজগুলো করতে গিয়ে কি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন? না—ভালো লাগে কাজটা করতে? কীভাবে নিজেকে গুছিয়ে এতগুলো কাজ করেন? এই গুছোনোর কাজটা ভেতরে ভেতরে কীভাবে হয়?

মনোজ মিত্র।। মোহিতবাবু যেমন বললেন যে কবিতা ওকে নাটক লিখতে বলেছে, শিখিয়েছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ছেলেবেলায় গল্পটল্প যা লেখা সেটা ছেড়ে দিয়ে মোটামুটি আমি থিয়েটারই করতাম। থিয়েটারই আমাকে থিয়েটার করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমি গোড়াতে অভিনয়ই করতাম, আমাদের একটা দল ছিল—'সুন্দরম'। তাদের জন্যই আমি প্রথম নাটক লিখেছিলাম। আমার লেখাটা আসে খানিকটা থিয়েটারের তাগিদে। আর সেই কারণে এই তিনটে কাজ করতে গিয়ে আমার কখনও ঠোকাঠুকি বাধে না নিজের সঙ্গে। বাধে না এই কারণে যে, সবটাই আমি থিয়েটারের দিকে লক্ষ্য রেখে করি। তবে হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করি খুব, এখনও চেষ্টা করছি খুব যে, লেখাটাকে থিয়েটার থেকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে কীভাবে লেখা যায়, এই নিরন্তর চেষ্টা আমার সর্বদাই আছে। কেবল থিয়েটারের মুখাপেক্ষী হয়ে লেখা—সেটা যে কী ধরণের সংকীর্ণতা, এবং কীভাবে লেখাটাকে থিয়েটারী তৈরি করে দেয়, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এখন আমি খুব চেষ্টা করি যে থিয়েটারের কথাটা না ভেবে, যদি শুধু নিজের জন্য বা অন্য কোনও তাগিদে লেখাটাকে তৈরি করা যায়, শুধু মাত্র ছোট্ট প্রসেনিয়ামের মাপে নাটককে সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, সেই তাগিদটা পাওয়া যায় কিনা তাই আমি ভেবে দেখছি।

বিভাস চক্রবর্তী।। মনোজের তিনটে সত্ত্বা নিয়ে নিজের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মনোজের তিনটে সত্ত্বার ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কারণ আমরা নাটক পাচ্ছি না। যে ভালো নাটকটা মনোজ লিখছে, সেটা সব থেকে আগে নিজেই করছে। আমাদের নাটক দেবার কথা বহুদিন ধরেই, কিন্তু এখনও পাই নি। অনেককেই মনোজ এরকম ঝুলিয়ে রেখেছে নাটক দেবে দেবে বলে (দর্শকদের হাসি)। ওর এই তিনটে সত্ত্বার জন্য আমরাই সবচেয়ে বেশী suffer করছি। যাই হোক—

এবার মোহিতকে বলি। আপনারা সবাই জানেন যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে শুধুমাত্র কবি ছিলেন তারপর নাট্যকার হয়েছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় হিসেবেই পাই। তিনি কোথায় কবি নন, কোথায় তিনি নাট্যকার নন, সেই হিসেব আলাদা করছি না। কিন্তু মোহিতকে আবার দেখি যে পেশাদারী হয়েও

অনেক কাজ করতে, যার মধ্যে অদ্ভুত যোগ্যতার পরিচয়, শিল্পরসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে পর্দায়। উনি যে রকম মৃণাল সেনের সহযোগে অনেক চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তেমনি এককভাবেও করেছেন। তিনি শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ছোট পর্দায় যে গুটিকয়েক মানুষের কাজ বসে দেখা যায় তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তার এই যে পেশাদার জগতে বিচরণ, থিয়েটারের ক্ষেত্রে পেশাদার বলছি না—এই কারণে যে থিয়েটারের থেকে সেইভাবে রোজগার হয় না বলে, এখন আমার প্রশ্ন মোহিতের কাছে এই যে পেশাদার জগৎটায় কাজ করতে গিয়ে, তাঁর নাটকের যে কাজের জগৎ—তার সঙ্গে কি পার্থক্য তিনি দেখতে পান? সেখানে কোন কিছু অসুবিধা হয় কিনা? কিংবা সেটা কোনও নতুন দিগন্ত তার সামনে এনে দিয়েছে কিনা?

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। ফিল্ম-এর স্ক্রিপ্ট করা তার মধ্যে একটা মজা আছে। যা নাটকের কাজ করার পরও করা যায়। মৃণালদার স্ক্রিপ্ট-এর কাজ করেছি বা আলাদাভাবে আমি করেছি, খুবই seriously করেছি। এরকম কাজের মধ্যে, ফিল্ম-এর মতো ভিন্ন মিডিয়ামে কাজ করার মধ্যে, একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। নাটকের মধ্যে থেকেও কোনো কোনো মানুষ সেই চ্যালেঞ্জটার মুখোমুখি হতে পারে—তার যদি ফিল্ম-এর টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতাগুলো থাকে। ঘটনাক্রমে আমার ফিল্ম ও নাটক এই দুই তরফে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার জন্য এই চ্যালেঞ্জটাকে আমি এ্যাক্সেপ্ট করেছিলাম। এই নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ, এই নতুন ফর্মে কীভাবে কাজ করা যায় এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। এই কাজের সঙ্গে নাটকের কাজের কোনও বিরোধ দেখি না।

তবে টিভির অনেক কাজ যা এক রাত্রিতে শেষ হয়ে যায়, সেই কাজটা কিন্তু আমার কাছে নাটকের তুলনায় অনেক কম মনে হয়। তবে টিভিতেও নানারকমের স্ক্রিপ্ট করা হয়—ওর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবশ্যই আছে। আমি যদি পেশাগত দিক—অর্থাৎ আর্থিক দিকটা ছেড়েই দিই, কারণ সেটা আমাকে খুব বেশী টানে না, আমাকে যেটা টানে সেটা হচ্ছে এই যে, আমি একটা নাটক থেকে আরেকটা নাটক লেখার মধ্যে দেখতে পাই দীর্ঘ সময় আমার বয়ে যাচ্ছে। আমি নাটক ভাবতে পারছি না, লিখতে পারছি না। তখন ক্রিকেটের খেলোয়াড়রা যেরকম condition-এ থাকতে চায় সেই রকমভাবে আমিও নিজেকে একটা condition-এ রাখবার জন্য ঐ কাজগুলো করে থাকি। তার মধ্যে দিয়ে যতটা নাটকের চর্চা রাখতে পারি। আমার এমন কোন চুক্তি নেই যে টিভির কাজগুলো আমাকে করতেই হবে, যে কোন সময়ে আমি ছেড়ে দিতে পারি। নিজেকে সজীব রাখার জন্য, নিজেকে active রাখার জন্য, নিজেকে condition-এ রাখবার জন্য ঐ কাজগুলো আমি করে থাকি। টিভির কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু নাটক ছাড়তে পারি না।

চন্দন সেন।। আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছি, সেটা প্রত্যেক নাট্যকার কোনও না কোনও সময়ে কবিতা লিখেছেন। মনোজদা লেখেননি। আমার প্রশ্ন মনোজদা যদি

কবিতা না লিখেই থাকেন তাহলে তাঁর অনেক নাটকের সংলাপের মধ্যেই আমরা যে কাব্যময়তা পাই সেকি তাঁর কবিতা না লেখার গুণ?

মনোজ মিত্র।। হ্যাঁ, কবিতা না লেখার জন্য। লেখার ইচ্ছা ছিল এখন সেটা নাটকে দেখা যাচ্ছে। (দর্শকের হাসি)

বিভাস চক্রবর্তী।। এবার আমি দু'জনকে দুটো প্রশ্ন করব। খুব ছোট প্রশ্ন। দু'লাইনে উত্তর দিলেই হবে। সেটা হচ্ছে বাংলা থিয়েটারে তোমাদের সমসাময়িক, তরুণতর কিংবা তোমাদের আগে যাঁরা আছেন, সেইসব নাট্য-পরিচালকদের কিংবা প্রযোজকগোষ্ঠী যে গ্রুপগুলো আছে তাঁদের বিরুদ্ধে তোমাদের কি কোনও অভিযোগ আছে নাট্যকার হিসেবে?

মনোজ মিত্র।। না না আমার কি করে অভিযোগ থাকবে? আমি তো জানি কী অবস্থার মধ্যে তাঁদের নাটক করতে হয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আসলে অভিযোগ আছে এই কথা বলতে কি অসুবিধা হয় তুমি জানো! (দর্শকদের হাসি) অনেক ছোটখাটো অভিযোগ থাকতেই পারে। বড় অভিযোগ থাকলে সেতো চলে যেত, এখানে তো সে থাকতই না।

বিভাস চক্রবর্তী।। কোনও অভিযোগ নেই। তাহলে আমরা কি আজকের আলোচনাটা এখানেই শেষ করতে পারি?

চন্দন সেন।। আমরা শেষ করতে চাই এমনভাবে যে, মানুষ যেভাবে মনোজ মিত্র এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে দেখে থাকেন আমরা তার থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখাবো। যেমন আমি বলবো মনোজদাকে একটা গান গাইতে সম্ভবত মনোজদা এতে রাজী হবেন।

বিভাস চক্রবর্তী।। মনোজের হয়ে আমিই উত্তর দিচ্ছি। মনোজ আর সব পারে, হাই জাম্প দিতে পারবে, লং জাম্প দিতে পারবে, কিন্তু গান গাইতে পারবে না—আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। না না মনোজ গাইতে পারে। কিন্তু একটা শর্ত আছে—শর্তটা হচ্ছে মনোজ গাওয়ার পর চন্দন যদি সেটা Dance এ illustrate করতে পারে। মনোজের গাইতে অসুবিধা কি আছে? আমরা দুজনে মিলিতভাবে গাইতে পারি। (দর্শকের হাসি)

চন্দন সেন।। মোহিতদা একটি রবীন্দ্রসংগীত শোনাবেন বলেছেন আমাকে।

মনোজ মিত্র।। তাহলে মোহিতদারটাই শুনি আগে। (দর্শকের হাসি)

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। আমি তো বলেছি গাইব, চন্দন যদি সেটার রাবীন্দ্রিক নৃত্য সকলের কাছে পরিবেশন করে দেখাতে পারে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই গাইব (দর্শকের হাসি)।

চন্দন সেন।। রাবীন্দ্রিক নৃত্যের জন্য একটু dress, make-up -এর দরকার সেটার

বোধহয় সময় নেই। কারণ এরপর দুটো নাটক অপেক্ষা করছে তাই গানটা শুনি, আমি পরের sitting-এ নাচব।

বিভাস চক্রবর্তী।। শোনো চন্দন, এটা বোঝা যাচ্ছে যে মনোজ এবং মোহিত তোমার থেকে senior নাট্যকার। এটা ওদের উত্তরগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এদের বেশী না ঘাঁটানোই ভালো। সময়ও কম। তাই এখানে হাসি, আনন্দ, ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে আমাদের আলোচনাটা শেষ করছি।

মনোজ মিত্র।। কিন্তু আমরা তো 'সায়ক'-কে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা ধন্যবাদ জানাতে পারি। এই যে অসাধারণ অনুষ্ঠানটি হল আমি তো কখনও এমন সুন্দর পরিবেশে আর এরকম বন্ধুদের সঙ্গে এভাবে একসঙ্গে মঞ্চে বসে কথা বলার সুযোগ পাইনি। এরকম অনুষ্ঠান আর হবে কিনা জানি না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়।। না, হতেই পারে, কথা হচ্ছে, এই যে ভালো-বাসা মেঘনাদের আমাদের ওপর রয়েছে, সায়কের রয়েছে সেই ভালোবাসা।

উৎস : সায়ক নাট্যপত্র, সংখ্যা-৩, ২০০৪

আনন্দবাজার অনলাইন সংবাদদাতা
শেষ আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৪ ১০:১১

প্রয়াত হলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে কলকাতার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্ধ্যক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন মনোজ। মঙ্গলবার সকালে প্রখ্যাত এই নাট্যকারের প্রয়াণের খবরটি জানান তাঁর ভাই তথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। শুধু মঞ্চে নয়, চলচ্চিত্রেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মনোজ। 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে তাঁর অভিনয় এখনও অনেকের কাছে স্মরণীয়। মনোজের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য মনোজের মরদেহ মঙ্গলবার বিকেল ৩টে থেকে রবীন্দ্র সদনে শায়িত থাকবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, প্রবীণ এই নাট্যকারের হৃদ্‌যন্ত্র ঠিক মতো কাজ করছে না। তা ছাড়াও তাঁর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নেই। সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ভারসাম্যহীনতাও দেখা দিয়েছিল। প্রবীণ অভিনেতার চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হলেন মনোজ।

মনোজের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহর গ্রামে। ১৯৫৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক হন তিনি। এই কলেজে পড়ার সময়েই নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেই সময় তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বাদল সরকার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তদের। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন মনোজ। গবেষণাও শুরু করেছিলেন।

আরও পড়ুন:

জীবন-নাট্য থেকে বিদায়, কিন্তু কৌতুকে-বিষাদে বাংলা নাটকের 'সাজানো বাগান'-এ তিনি থাকবেনই

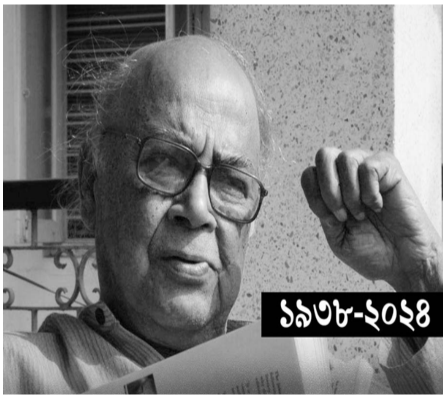

১৯৫৭ সালে নাটকে অভিনয় শুরু মনোজের। ১৯৭৯ সালে তিনি সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে বিভিন্ন কলেজে দর্শন বিষয়েও শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে

জল' লেখেন ১৯৫৯ সালে। কিন্তু ১৯৭২-এ 'চাকভাঙা মধু' নাটকের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি এবং পরিচিতি বাড়ে। ওই নাটকটির নির্দেশনা করেছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। মনোজের প্রতিষ্ঠিত নাট্যগোষ্ঠীর নাম 'সুন্দরম'। মাঝে 'সুন্দরম' ছেড়ে 'ঋতায়ণ' নামে এক দল গড়লেও কিছু দিনের মধ্যে 'সুন্দরম'-এই ফিরে আসেন। 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'নীলা', 'মৃত্যুর চোখে জল', 'সিংহদ্বার', 'ফেরা'-র মতো একাধিক দর্শক সমাদৃত নাটকের সঙ্গে জুড়েছিল মনোজের নাম।

তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বাসু চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মনোজ। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'গণশত্রু' এবং 'ঘরে বাইরে'-তেও অভিনয় করেন তিনি। তা ছাড়াও মূলধারার একাধিক সিনেমায় পরিচিত মুখ ছিলেন মনোজ। নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেও দর্শকদের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি।

গত সেপ্টেম্বরেও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মনোজ। সেই সময়ে অভিনেতার মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। অসুস্থতাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। এ বারও অসুস্থতাকে মনোজ পরাস্ত করবেন বলে আশা ছিল অনুরাগীদের। কিন্তু তা আর হল না। জীবনমঞ্চের পর্দা টেনে দিলেন মনোজ।

—উৎস : উইকিপিডিয়া

অ নি র্বা ণ মু খো পা ধ্যা য়
শেষ আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৪ ১০:১৭

স্বাধীনতার লগ্নে তিনি জানতেন, তাঁর 'দেশ' খুলনা ভারতেই পড়বে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জানা গেল, সেই জেলা 'বিভুঁই' হয়ে গিয়েছে চুপিসারে। দেশভাগ আর রাষ্ট্রিক খামখেয়ালকে কি এক মশকরা হিসেবে দেখেছিলেন মনোজ মিত্র নামের সে দিনের বালকটি? আর তাই সারা জীবন একটা কৌতুকমিশ্রিত নৈর্ব্যক্তিকতা বার বার দেখা দিয়েছে তাঁর লেখা নাটকে, তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলিতে? 'সাজানো বাগান' থেকে 'নরক গুলজার'-এ ছড়িয়ে রয়েছে সেই জীবনবোধ, যেখানে প্রবল সঙ্কট-মুহূর্তেও চরিত্রেরা কিছুতেই রসবোধ হারায় না। 'বাস্তব'-এর সমান্তরালে যে বজায় থাকে 'অ-সম্ভব', জগতের বিচিত্র সেই স্বাদকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন শৈশব থেকেই।

১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে মনোজের জন্ম। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। বাবা অশোককুমার মিত্র প্রাথমিক জীবনে শিক্ষকতা করতেন। পরে ব্রিটিশ সরকারের ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হিসেবে কাজ করেন। বাবার চাকরির সুবাদে ছোটবেলায় মনোজকে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছে। ফলে শৈশব থেকেই বিবিধ প্রকৃতির মানুষ, তাদের বিচিত্র সব পেশা আর তার পাশাপাশি প্রকৃতির উজাড় করা সৌন্দর্যকে যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে কথাও বার বার উঠে এসেছে তাঁর বহু লেখায়, সাক্ষাৎকারে। মনোজের শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলেই। কিন্তু বাল্যকাল থেকে রুগ্ন মনোজকে ঘুরতে হয়েছে বাবার কর্মস্থল অনুযায়ী। ছোটবেলায় এক গৃহশিক্ষকের সাহচর্য তাঁকে পাঠ্য বিষয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। সৃজনশীল লেখালিখির সলতে পাকানোর কাজ সম্ভবত সেই সময় থেকেই শুরু হয়।

ছবি : সংগৃহীত

প্রথমে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে পেশাজীবন শুরু করলেও পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

স্বাধীনতা বালক মনোজের কাছে এক আশ্চর্য ঘটনা। ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট তাঁর বাবার তৎকালীন কর্মস্থান ময়মনসিংহ পড়ে পাকিস্তানে আর তাঁর পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলা পড়ে ভারতে। এর এক দিন পরেই জানতে পারেন, খুলনা পড়েছে পাকিস্তানে। মুহূর্তের মধ্যে নিজভূমিকে পরবাসে পরিণত হতে দেখেই কি জীবনের নিষ্ঠুর রসিকতার দিকটিকে চিনতে শুরু করেন মনোজ? পরে যখন তিনি মনপ্রাণ দিয়ে নাটক লিখছেন, পরিচালনা করছেন, অভিনয়ে নামছেন, তখনও এই দৈব-বিড়ম্বিত মানুষের বিষয় থেকে সরে আসেননি। আবার এই বিড়ম্বনাকে অতিক্রম করে উঠে দাঁড়ানো মানুষকেও তিনি দেখিয়েছেন প্রায় সর্বত্র।

নাটক-যাত্রা-থিয়েটার ধূলিহরের মিত্র পরিবারে খানিক পরিত্যাজ্য ছিল। কিন্তু গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ হিসাবে পুজোর সময় আর বসন্তকালে তাঁদের পরিবারের চণ্ডীমণ্ডপেই নাটক মঞ্চস্থ হত। কড়া ধাতের এক কাকার দাপটে বাড়ির ছেলেপুলেরা সে দিকে ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু এক সময়ে নিয়ম শিথিল হয়। ‘রামের সুমতি’র মতো ‘নিরীহ’ নাটক প্রথম দেখার সুযোগ পান মনোজ। প্রায় কাছাকাছি সময়ে গ্রামের বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটক ‘রোগের চিকিৎসা’য় প্রথম অভিনয়। তার পরে গ্রামের নাটকে প্রায়শই অংশ নিয়েছেন তিনি। এই সব নাটকে ‘বাস্তব’কে নিয়ে আসতে গিয়ে মাঝেমাঝেই বিপাকে পড়তেন মনোজ। সেই সব কৌতুকের স্মৃতি তিনি অকপটেই বলেছেন, লিখেছেনও।

১৯৫০ নাগাদ চলে আসেন এ পার বাংলায়। স্কুলজীবনেই থিয়েটারচর্চার সূত্রপাত। ১৯৫৪ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলে সহপাঠী হিসাবে পান বেশ কিছু সমমনস্ক মানুষকে। কলেজের অধ্যাপকদের অনেকেই ছিলেন সৃজনশীল বিষয়ে উৎসাহদাতা। এই সময়েই মনোজ ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। পরে এই কলেজেই দর্শনে অনার্স নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা চলাকালীন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মতো বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাটকের দল ‘সুন্দরম’। এই পর্ব থেকেই পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন নাটকের সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়াকালীনই দলের জন্য প্রথম নাটক লেখা। ২১ বছর বয়সে মনোজের প্রথম লেখা নাটক ‘মৃত্যুর চোখে জল’। সেটি লেখা হয়েছিল এক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার জন্য। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে সে নাটক। এই সময় থেকেই ছোটগল্প থেকে নিজের কলমকে নাটক রচনায় স্থানান্তরিত করেন মনোজ। নাটককেই তাঁর যাবতীয় ভাবনার প্রকাশমাধ্যম করে তুলতে সচেষ্ট হন।

মনোজ ছিলেন উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। তবে বেশ কয়েক বার বাসাবদল ঘটেছে তাঁর জীবনে। পরবর্তী কালে পাকাপাকি ভাবে সল্টলেকে থিতু হয়েছিলেন। স্ত্রী আরতি মিত্র। তাঁদের একমাত্র কন্যা ময়ূরী। মনোজের অনুজ অমর মিত্র খ্যাতনামী কথাসাহিত্যিক। আর এক অনুজ উদয়ন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভ্‌সের ডেপুটি ডিরেক্টর। ইতিহাস গবেষণার জগতে সুপরিচিত নাম।

মনোজ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে। কিন্তু পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 'প্যাশন'-এর সঙ্গে পেশার আপস করার দিন শেষ হয়। মাঝে 'সুন্দরম' ছেড়ে 'ঋতায়ণ' নামে এক দল গড়লেও কিছু দিনের মধ্যে 'সুন্দরম'-এই ফিরে আসেন। সেই সময়েই তিনি লেখেন 'চাক ভাঙা মধু'। পরে আবার 'সুন্দরম'-এ ফিরে এলে লেখেন 'পরবাস'। এই সময় থেকেই দলের প্রধান নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

১৯৭৭ সালে মনোজ লিখলেন 'সাজানো বাগান'। প্রধান ভূমিকায় তিনি নিজে। বাংলা নাটকের দর্শক উপহার পেলেন এমন এক নাটক, যার 'ধরন'-এর সঙ্গে তেমন পরিচয় তাঁদের ছিল না বললেই চলে। বাংলা সমান্তরাল ধারার নাটকের সূত্রপাত যদি গণনাট্য সঙ্ঘের হাতে হয় বলে ধরা যায়, তবে সেই ধারা থেকে 'সাজানো বাগান' ছিল অনেকখানি দূরে। তাঁর নিজের মতে, পঞ্চাশের দশকে গণনাট্য যে নাট্যধারা প্রবর্তন করে, সত্তরের দশকের শেষ দিকেও গ্রুপ থিয়েটার তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে পৌঁছনো সিদ্ধান্তকে যেন দর্শকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বক্তব্য ভারাক্রান্ততা থেকে নাটকের মুক্তি চেয়েছিল 'সাজানো বাগান'। সেখানে মানুষের সুখ-দুঃখ ছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল ছিল, প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের সহজ সহাবস্থান ছিল। কিন্তু শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকঠিন প্রয়োগ ছিল না। তথাকথিত সামাজিক দায়বোধ বাংলা নাটককে ক্রমশ ক্লান্ত এবং বৈচিত্রহীন করে তুলছে, সে কথা তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাটক 'বক্তব্যহীন' হয়ে যায়নি। শ্রেণি নয়, ব্যক্তিমানুষই তাঁর নাটকের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। 'চাকভাঙা মধু'র জটা বা মাতলা, 'সাজানো বাগান'-এর বাঞ্ছা, সকলেই একক। সামাজিক বিন্দু থেকে দেখলে তারা প্রান্তজন। কিন্তু প্রান্ত থেকেই যদি বিশ্বকে দেখা হয়, তা হলে তার চেহারাটাই বদলে যায়। 'সাজানো বাগান'-এ বাঞ্ছার নাতিকে দেখানো উত্তরাধিকারের মধ্যে বিপুল আশাবাদ কি 'নরক গুলজার'-এও নেই? হঠাৎ কেউ এই সব নাটকের সঙ্গে মিল পেতে পারেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তামাম ছোটগল্প আর উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকা দর্শনের। একজন কথাসাহিত্যিক আর একজন নাট্যকার। সমসাময়িক। কিন্তু দু'জনের কেউই 'আধুনিক' শিল্পদর্শনের নাগরিক ক্লান্তি বা শ্রেণিচেতনার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন না। শীর্ষেন্দুর ফজল আলি বা বাঘু মান্না যেন চকিতে দেখা দিয়ে যায় 'চাকভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান'-এ। অথবা তার উল্টোটা। 'বক্তব্য' একটা কোথাও থাকে বটে, কিন্তু সে তার সর্বস্বতা নিয়ে গ্রাস করে না একা মানুষের লড়াইকে। বেদনার সঙ্গে ফুলঝুরির আলোবিন্দুর মতো ঝলকায় কৌতুক। যা শত-সহস্র মারি আর মড়কের পরে আবার নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

—উৎস : উইকিপিডিয়া

স্মৃতিকথা :

শ্যা ম ল সে ন গু প্ত
অনুভবে সিক্ত স্মৃতি

আমার জীবনের কাছের মানুষটি চলে গেলেন। কলেজ জীবনে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের বয়স ছাপ্পান্ন। থিয়েটারকে ভালোবেসে তাঁর হাত ধরেছিলাম। হাঁ,...ভারতীয় নাট্যজগতের অবিসংবাদিত কিংবদন্তী মনোজ মিত্রর কথা বলছি।

সালটা ঊনিশশো আটষট্টি। সেই পর্যায়ে মনোজদা শ্যামবাজার মোড়ে পাল স্ট্রিটে 'ঋতায়ন' নাট্যদলের মূল পরিচালক। তখন তাঁর লেখা 'নেকড়ে' নাটকটির মহড়া চলছে। পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে হাজির হয়েছিলাম সেই কাঠের ঘরটায়। পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনে আমায় বলেছিলেন, "তুমি তো আমাদের ইন্দ্রবিশ্বাস রোডের কাছেই থাকো। রবিবার বা ছুটির দিন সকালে চলে এসো।" তিনি তখন নিউ আলিপুর কলেজে 'দর্শন'-এর শিক্ষক।

এক রবিবার হাজির হলাম তাঁর বাড়িতে। বুক সেল্ফে তখনকার লেখা নাটকগুলোর দিকে চোখ পড়ল। 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'জন্ম-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ', 'নীলা', 'সিংহদ্বার', 'বেকার বিদ্যালংকার', 'অবসন্ন প্রজাপতি'র মত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলোর দিকে। ওখান থেকে নিয়ে একের পর এক নাটকগুলো পড়ে ফেলেছিলাম। নামগুলো আপনাদের অনেকের কাছে অপরিচিত লাগছে জানি। হয়তবা 'নীলকণ্ঠের বিষ' নাটকটার কথা শুনে থাকবেন, অন্য নাটকগুলোর কথা না শোনা যায় তাঁর কথায়, না পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। পরবর্তীকালে মনোজদা যখন সংবাদ প্রতিদিনের 'রোববার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এইসব নাটকগুলোর কথা একদম পাই না কেন? ঘুব শান্ত স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সন্তানকে মানুষ করতে না পারলে, তাদের সম্বন্ধে বলতে অনীহা থাকে। এক একটা নাটক আমার সন্তান। এরাও। যদি কোনদিন তাদের প্রসঙ্গ ওঠে, বলাই যেতে পারে তাদের কথা। গোপনরাখার কোন ব্যাপারই নেই। এমনকি 'ঋতায়ন' নাট্যদলের সেইসব দিনগুলোর কথা। তবে একটা কথা বলতেই হয়, 'ঋতায়ন' পর্যায়ের দিনগুলো আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পারেনি। তাই হয়ত মনের ভেতর অভিমান কাজ করে।' আমি আর কথা বাড়াইনি। নিজের চোখে দেখেছি 'ঋতায়ন' দলটিকে রক্ষা করার মত কোন নাট্যকর্মী মনোজদার পাশে ছিলেন না। আমি সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছি। চাকরির সন্ধানে পরীক্ষায় বসছি। বয়সও খুব অল্প। 'তরুণবন্ধু' বলে মনোজদা নাট্যজগতের লোকজনদের সাথে পরিচয় করাতেন সবসময়ের এই সঙ্গীটিকে।

সেই সময়টার কথা বললাম, সেই সময়ে কিন্তু তিনি অনেকগুলো একাঙ্ক নাটক লিখে ফেলেছেন। 'মৃত্যুর চোখে জল'—একাঙ্ক তার অনেক আগেই লেখা 'পাখি', 'কালবিহঙ্গ', 'টাপুর টুপুর'-এর কথা মনে পড়ছে। তখন তিনি খুবই প্রশংসিত 'একাঙ্ক' নাটককার হিসেবে।

নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি, আমি তাঁর লেখা 'চাকভাঙা মধু' নাটকের প্রথম শ্রোতা বলে। এই নাটকই মনোজ মিত্রকে প্রথম সারির পূর্ণাঙ্গ নাটককার হিসেবে স্থান করে দেয়। এর জন্য তখনকার 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' দলের পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাব। যেমন অসাধারণ প্রযোজনা, তেমনই অসাধারণ সব অভিনয়। মনোজদার অনেকদিনের সঙ্গী হিসেবে আমার মনে হয়েছিল, মনোজদার এই প্রথম কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক সুবিচার পেল। সেই নাটকে গর্ভবতী 'বাদামি'র চরিত্রে মায়া ঘোষের (প্রয়াত) অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল, 'ছোট চেহারার', 'সোফিয়া লরেন'। উৎপল দত্ত নাটকটা দেখে রজত ঘোষের 'থিয়েটার বুলেটিন' পত্রিকায় নিজের ভঙ্গিতে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। একজন নাটককারের সাফল্যের মূলে থাকে একজন ভালো নির্দেশক। এই বিশ্বাস আমার মধ্যে তৈরি হয়েছিল, কারণ তার পরে মনোজদার লেখা আরো দুটো নাটক 'অশ্বত্থামা' ও 'নরক গুলজার' বিভাসদার পরিচালনায়ও 'থিয়েটার ওয়ার্কশপে'র প্রযোজনায় দর্শকসাধারণের বিপুল প্রশংসা পেয়েছিল। রানিগঞ্জে বসে ১৯৬২ সালের 'অশ্বত্থামা' নাটকটি সম্পাদনা ও সংযোজন করে ১৯৭২-এ নাটকটার বর্তমান চেহারায় নিয়ে আসেন। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-র প্রয়োজনায় মনোজ সিং 'কৃতবর্মা'র চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন। এই যে পরপর তিনটে নাটক বিভাসদার নির্দেশনায় দারুণভাবে সমাদৃত হোলো, তার পেছনে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম Dramatist–Director Collaboration. 'চাকভাঙা মধু' নাটকটির প্রস্তুতিপর্বে দেখেছিলাম মনোজদা, বিভাসদা আর অশোকদারা সাপুড়ের মন্ত্র রেকর্ড করার জন্য চলে গিয়েছিলেন বসিরহাটের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। 'নরক গুলজার'-এর প্রযোজনার ক্ষেত্রে সম্পাদনার ব্যাপারে নাটককারের সঙ্গে পরিচালকের আলোচনা চলত আমাদের সামনেই।

সুন্দরমের প্রযোজনায় অনেকেই হয়ত বলবেন যে, মনোজ মিত্র একটা নাটকে তিনজনের ভূমিকা পালন করেছিলেন। একধারে নাটককার, পরিচালক ও মূল অভিনেতা। সেখানেও তিনি সফলতা পেয়েছিলেন। তাঁর নাট্যচর্চার শুরুর দীর্ঘকাল বাদে, যখন তিনি বাংলা থিয়েটারের মৌলিক নাটককার হিসেবে প্রথম সারিতে বিরাজ করছেন, তখন তাঁকে আমরা একজন সফল নাট্যনির্দেশকেরও ভূমিকায় দেখি।

যেহেতু তিনি নাট্যজীবন শুরু করেন, অভিনেতা ও নাটককার 'মৃত্যুর চোখে জল' হিসেবে—তাঁকে যে নাট্যপরিচালকের ভূমিকাতেও দেখা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্র ঘোষের আমল থেকে সেটাই চলেছে। ইদনীং চেহারাটা অন্যরকম। মনোজ মিত্র যেমন 'সুন্দরম'-এর জন্য নাটক লিখতেন, তেমনই অন্য দলগুলোকেও সমানভাবে দিয়ে গেছেন। তাঁর লেখা অজস্র নাটক। শুধু নিজের লেখা নাটক, নিজেই করব, এমন মনোভাব তাঁর মধ্যে কোনকালেই দেখিনি। ভালো পরিচালক তাঁর কাছে নাটক চাইলে তিনি খুবই খুশী হতেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কিংবদন্তী অভিনেতা ও পরিচালক কুমার রায় যখন 'রাজদর্শন' আর 'কিনু কাহারের থেটার' মঞ্চস্থ করেছিলেন, তখন আমায় বলেছিলেন, 'বিভাস আর কুমারদার

হাতে নাটক দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়।' এ প্রসঙ্গে আর দু'একটা কথা বলতে চাই। নোবেলজয়ী নাটককার হ্যারল্ড পিটার নিজে অন্যের নাটক পরিচালনা করলেও কোনদিন নিজের লেখা নাটক নিজে পরিচালনা করেননি। নাট্যশিল্প মাধ্যমের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ নিয়ে শিল্পীর স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। শিল্প তো স্বভাবত অনির্দিষ্ট ও স্বাধীন। সেখানে কোন শিল্পী তিন ভূমিকায় থাকবেন না দুই ভূমিকায় থাকবেন, সে তাঁর হাতেই ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কয়েকবছর মনোজদা কোন নাট্যদলে ছিলেন না। সেই সময় মনোজদা ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যর অধীনে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। বিষয় ছিল, 'নাট্যকলায় রূপকৈবল্যবাদ : একটি ইতিহাসাশ্রিত অনুসন্ধান; আমার খুব মনে আছে সেই সময় দু'তিনবার মনোজদার সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। একটা বই দিয়ে বলেছিলেন, 'এই পাতা থেকে এই পাতা কপি করো'।

বেনদেত্তো ক্রোচের এস্থেটিক্স-এর উপর একটা বই।

শিল্পতত্ত্বের ব্যাপারটা আমার কাছে অজানাই ছিল। মনোজদা বেতার নাট্যরূপ দিতে খুবই ভালোবাসতেন। অনেকদিন ধরেই মনোজদার আকাশবাণী ভবন যাতায়াত ছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ডেকে পাঠাতেন। মনোজদার একুশ বছর বয়সে 'মৃত্যুর চোখে জল' আকাশবাণী কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল। বেতার নাটক নিয়ে মনোজদা প্রায়শই বলতেন (লিখেছেনও), 'অপাণিপাদ তবু দ্রুতগতি। হাত পা কোনটাই নেই তবু দ্রুতগতি সম্পন্ন।' বেতার নাটকও বুঝি তাই। শব্দতরঙ্গবাহিত এই বিশেষ নাট্যক্রিয়াটির উপযুক্ত সংজ্ঞা আর কী হতে পারে।'

জগন্নাথ বসু তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র জায়গায় ড্রামা প্রোডিউসার পদে যোগদান করেছেন। রবিবারের আড্ডায় প্রায়ই আসেন। ভালো কোন' গল্প বা উপন্যাস পড়লেই মনোজদার কাছে প্রায় জেদ ধরতেন বেতার নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য। সেই সময় জগন্নাথ বসুও অমার খুব বন্ধু হয়ে যান। তাঁর বাড়িও আমার যাতায়াত শুরু হয়। মনোজদাকে দেখেছি বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশীর মতো আরো অনেকের গল্পের বেতাররূপ দিতে। সেইসব নাটকের সংলাপের মান ছিল আলাদা। বেতার নাটক খুবই জনপ্রিয় হলেও, বেতারনাট্যরূপকারের নাম কেইবা শোনে বা জানে......একমাত্র পরিচিত মহল ছাড়া। কিন্তু মনোজদার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প অবলম্বনে 'চোখে আঙুল দাদা', মনোজদার সংলাপে, সংযোজনে হৈ-হৈ ফেলে দিয়েছিল। সাধারণ শ্রোতার মুখেও মনোজ মিত্র নামটা শোনা গিয়েছিল। জগন্নাথদার প্রযোজনায় বেতার নাকটি পরে রেকর্ড বেরিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটক হিসেবে সেটা এখনও মঞ্চে অভিনীত হয়। প্র. ণা. বি মনোজদাকে চিঠি লিখে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

মনোজদা আর জগন্নাথদার জোরাজুরিতে আমিও তখন লিখে ফেলেছিলাম দুটা বেতার

নাটক। 'পরীক্ষারঙ্গ' আর 'বাঁশি'। চুপিচুপি বলে রাখি, 'বেতার নাটক দুটোই মনোজদা সংযোজন আর সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। পঞ্চাশভাগেরও বেশি জায়গায়। নাটক দুটোর প্রযোজনায় ছিলেন 'জগন্নাথ বসু'। অভিনয় করেছিলেন— ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরীর মত খ্যাতনামা সব অভিনেতারা। এ জন্যই কি বলে, 'Time spent with good company is never wasted'।

'সুন্দরম'-এর দুলাল ঘোষ, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অরণ্য ঘোষালের মত দীর্ঘদিনের বন্ধুরা অনেকদিন ধরেই 'সুন্দরম'-এ ফিরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছেন। কারণ মানোজদার কালেজ-জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু পার্থপ্রতিম চৌধুর সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত ও দলে অনিয়মিত। তাছাড় গ্রুপ থিয়েটারের শৃঙ্খলায় তাঁকে আটকে রাখা কঠিন কাজ। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে জনাই, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মত নাট্যপরিচালক, নাটককার ও চলচ্চিত্র, পরিচালকের কাজ যাঁরা তাঁর নাটক ও ছায়াছবিগুলো দেখেছেন তাঁরাই জানেন। এই গুণী মানুষটার পরিচালনায় 'ছায়াসূর্য', 'যদুবংশ', 'সুভা ও দেবতার গ্রাস' দেখার যদি সুযোগ মেলে, অতি অবশ্যই দেখবেন। মনোজদা আক্ষেপ করে লিখেছেন, "পার্থপ্রতিম চৌধুরী তাঁর আধখানা জীবনে যে ছবিগুলো করে গিয়েছেন, সে সবের কথা কেউ মনে রাখেনি।"

মাঝেমধ্যেই মনোজদার সঙ্গে ৫৭ নম্বর যতীনদাস রোডে যেতাম! এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সুন্দরম'-এর হাল ধরলেন মনোজদা। আমিও আবার তাঁর হাত ধরলাম।

শুরু হলো মনোজদার ১৯৭২ সালে লেখা 'কোথায় যাবে' নাটকটা নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। মহড়া চলাকালে সেই নাটকটা সম্পাদনা করে নাম রাখলেন 'পরবাস'। ছোটবেলায় আমার পোলিও হওয়ার জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটি। ভালোবাসা থিয়েটার। খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্য তখন পাইনি কোন গার্লফ্রেণ্ড। থিয়েটারই আমার ভালোবাসা। না.. কোন আক্ষেপ নেই, থিয়েটার আমাকে সাহিত্য অনুরাগী করেছে। দেশ-বিদেশের ভালো ভালো ছবি দেখার আগ্রহ বাড়িয়েছে, সবচেয়ে বড়কথা Inferiority complex বলে কোন রোগ বাসা বাঁধতে দেয়নি। জীবনটাকে সুন্দর মনে হয়েছে। মনোজদার মত মানুষ সব সময় আমাকে প্রাণিত করেছেন জারিত করেছেন, পুষ্ট করেছেন। মনে মনে বাসা বেঁধেছে অভিনয় করার বাসনা। মনোজদা টের পেয়েছিলেন সে বাসনার কথা। কাষ্টিংয়ের সময় বললেন, শ্যামল তুমি করবে 'পেয়াদা' চরিত্রটা। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'খুড়িয়ে হাঁটি....আমার কথা শেষ হতে না দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাকে তো আমি মঞ্চের ওপর কসরত দেখাতে বলছি না, নাচতেও বলছিল না,...তুমিই করবে।" মনে পড়ে 'পরবাস' নাটকে রিহার্সালের সময় ধমক খাওয়ার কথা, একটা দৃশ্যে বাড়িওয়ালা (মানবচন্দ) বলছেন, "আজ রাতে লুচি আর পাঠার মাংস খাওয়াবো।" পেয়াদা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "লুচি আর পাঁঠার মাংস... মাসি-মেসো! দুজনকে অনেকদিন একসাথে দেখিনি করালীবাবু', আমি সংলাপগুলো বলার সময় সেই মজাটা আনতে পারছিলাম না।

মনোজদা ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার বুঝি লুচি পাঁঠার মাংস প্রিয় খাদ্য নয়? না রোজ খাও।"

আমি উত্তর দিয়েছিলাম 'আমিও তাদেরকে অনেকদিন দেখিনি।'

—'জিভে জল আসছে এমনভাবে বলতে হবে, মজাটা ধরাতে হবে।'

মনোজদা আমাদের বলতেন, 'চরিত্রটা মোটেই তোমার থেকে আলাদা কেউ নয়। এমন পরিস্থিতিতে পড়লে তুমিও এই করতে—বস্তুত তোমার মধ্যেই চরিত্রটা লুকিয়ে আছে—তুমিই সে—এমনটা না ভাবলে অভিনয় কর্মটিকে দুঃসাধ্য ঠেকবে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাও।" এইভাবেই শুরু হয়েছিল আমার অভিনয় জীবন পেয়ে গিয়েছিলাম এক ভালো মাস্টারমশাইকে। মনোজদার মুখে শুনেছিলাম মুক্তাঙ্গনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার রাজেন তরফদার আমাদের 'পরবাস' নাটকটি দেখেছেন। অন্যদের সাথে ভালো লেগেছে আমার অভিনয়ও।

'সুন্দরম'-এর পরবর্তী নাটক 'সাজানো বাগান'-এ 'চোর'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। সহঅভিনেতার ভূমিকায় সম্ভবত ১৯৭৭ সালে 'দিশারী পুরস্কার' পেয়েছিলাম। মনোজদা পেয়েছিলেন 'বাঞ্ছারাম'-এর চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার। মনোজদার কথায়, 'সব চরিত্রের সব পরিস্থিতি যে শিল্পী তাঁর চেনা জীবনের ছকের মধ্যে পেয়ে যাবে, এমনটা নয়। অচেনা, অজানা, অকল্পনীয় জটিলতাও থাকে। যখন চরিত্রটিকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, নিজেকে অভাবিত জায়গায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে দাঁড় করানোটাও তো অভিনয়।" মনোজদার নাটকের সংলাপ এত বলিষ্ঠ এবং মজার ঠিকমত চরিত্র অনুযায়ী বলতে পারলে সহজেই দশে পাঁচ পেয়ে যাওয়া যায়। ভালো অভিনেতা হলে তো কথা নেই, খালি ছক্কা। খুব হালকা ভাবেকথাগুলো বললাম।

একাডেমি মঞ্চে 'সাজানো বাগান' নাটকটা দেখতে এসেছিলেন তপন সিনহা ও অরুন্ধতী দেবী। শো শেষে গ্রীনরুমে এসে মনোজদাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর আমাদের দিকে হাত নেড়ে বলেছিলেন, 'খুব ভালো। আপনারা সবাই খুব ভালো অভিনয় করেছেন'। দুদিনবাদে ডেকে পাঠান তাঁর বাড়িতে। পরের দিন আমরা জানতে পারি, 'সাজানো বাগান' নাটকটা তিনি ছবি করবেন। 'বাঞ্ছারামের ভূমিকায় মনোজ মিত্র। এরপরের ঘটনা সবাই জানেন। 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিটি বহুদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলেছে। মনোজ মিত্র নাম তখন মুখে মুখে। গ্রামগঞ্জে বুড়ো মানুষ দেখলেই সবাই বাঞ্ছা....বাঞ্ছা করত। বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম, ঐ ছবিতে 'চোর'-এর ভূমিকায় আমিও অভিনয় করেছিলাম। আনন্দ আর টেনশনে শর্ট দেওয়ার সময় ভুলভাল করেছিলাম। ভালো করতে পারিনি। সেই সময়ের একটা মজার ঘটনা বলি—

সুন্দরমে রিহার্সাল দিয়ে উত্তর কলকাতার আমরা ক'জন বাসে করে ফিরছি। দুলাল লাহিড়ী, মনোজ মিত্র, অজয় দত্তগুপ্ত, মানব চন্দ ও আমি। সদ্য 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিটি

মুক্তি পেয়েছে। রাত দশটায় প্রায় ফাঁকা দোতলা বাস। দোতলা বাসের গায়ে বাঞ্ছারামের বিশাল ছবি। লেখা রয়েছে 'বেঁচে ওঠার এক বিচিত্র কাহিনী'। বাসের কন্‌ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে, দুলাল মনোজদাকে দেখিয়ে বলে ওঠে, "ইনি তপন সিনহার 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এর বাঞ্ছা। আপনার বাসের গায়ে যাঁর ছবি বড় বড় করে আছে। কন্‌ডাক্টর মহাশয় মৃদু হেসে বলেছিল "টিকিটগুলোর পয়সা দিন"। যেন দুলাল টিকিট ফাঁকি দেওয়ার জন্য এমন কথা বলেছে। সেই সময় মনোজদাকে ছায়াছবির 'বাঞ্ছারাম' বলে কেউ চিনতে পারতনা।

এ নিয়ে কত না মজার ঘটনা বলা যায়। অন্য এক ঘটনার কথা উল্লেখ করি। দিল্লীর শ্রীরাম সেন্টারে আয়োজিত এক নাট্যোৎসবে 'সাজানো বাগান' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের পর গ্রিনরুমে এলেন এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। আমি তখন মনোজদার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে মনোজদার সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে, মনোজদা বলে ওঠেন, 'হাতদুটো নোংরা। মেকআপটা তুলে আসি।' তিনি তখনই বলেছিলেন, 'আপনার হাতদুটোতে বাংলার মাটির গন্ধ আছে। তাইতো স্পর্শ করতে এসেছি। মনোজদার হাতদুটো জড়িয়ে ধরেন। পাশ থেকে একজন বলে ওঠেন, 'উনি হচ্ছেন অ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী, নৌবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান।'

'সাজানো বাগান'-এর পরের নাটক 'মেষ ও রাক্ষস'। মহাভারতের ইল্বল ও বাতাপির ছায়া পাওয়া যায় কিন্তু আজও খুব প্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ গানগুলো। 'নরকগুলজার'-এর মত এখানেও দেখতে পাওয়া যায় নাচ ও গান। 'মানুষ কতো ভেড়া হয় চোর দ্যাখো না... হয়... হয়... হয় তোমরা জানতে পারো না।' 'নরকগুলজার' নাটকের 'কথা বোলো না শব্দ করোনা ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, যেমন পপুলার হয়েছিল। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের গানগুলো ততটা পপুলার হয়নি। কারণ 'মেষ ও রাক্ষস'-এর অভিনয় সংখ্যা বেশি নয়। আমি এ নাটকে তিনটে শো 'সূত্রধর'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, স্টেজে যতখানি মুভমেন্ট করার কথা তা করতে পারতাম না। মনোজদা সে সব অসুবিধার কথা বলতেই, 'উনি বলেছিলেন, 'আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। তোমাকে বাদ দিলে দুঃখ পাবে না তো?' আমি বলেছিলাম, 'নাটকের স্বার্থে আমি বাদ যেতেই পারি। আমাদের নাটকের মান যেন শিল্পসম্মত ও দর্শকদের ভালোলাগার মিশেল হয়।' মনোজ পিঠ চাপড়িয়ে বলেছিলেন, 'সাবাস', তারপর 'পেয়াদা' আর 'চোর'-এর ভূমিকার বেশ কয়েকবছর অভিনয় করেছিলাম। মনোজদা তখন আমাকে লেখালেখি করার জন্য খুব বলতেন। 'একাঙ্ক দিয়ে শুরু করো, আমি তো আছি।" এমনকি একদিন তাঁর একাঙ্ক নাটক 'পাখি'র চিত্রনাট্য করতে বললেন। আমি করেছিলাম। কিন্তু সেটা নিয়ে আর বেশিদূর এগোনো যাইনি। পরবর্তীকালে দুলাল লাহিড়ীর পরিচালনায় ইটিভিতে 'গুডবাই' আর আকাশ বাংলায় 'বুমেরাং' বলে দুটি টেলিফিল্মের চিত্রনাট্য করেছিলাম, মনোজদা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনটার কথা না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৫ই আগস্ট ('সুন্দরম'র জন্মদিন),

২০২২ আমাকে 'পরমবন্ধু' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিলো। আমাকে পরিচয় করাতে গিয়ে মনোজদা অনেককথা বলতে লাগলেন। শেষে বলেছিলেন, 'শ্যামলদের মত শিল্পীদের আমরা আমাদের থিয়েটার থেকে কী বা দিতে পেরেছি। না কোনো টাকাপয়সা না জানাতে পেরেছি তেমন সম্মান। কী বা পেয়েছে এরা থিয়েটার থেকে। তাই আমরা 'পরমবন্ধু' দিয়ে এদের প্রতিবছর সম্মান জানাই।

অভিনেতা শ্যামল সেনগুপ্তকে সম্মান জানাতে পেরে সুন্দরম ধন্য। আমি ওয়াকিং স্টিক হাতে 'সুন্দরম'-এর বন্ধুদের সাহায্যে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে খুব দৃঢ়গলায় বলেছিলাম, 'আমি সুন্দরমের কাছে ঋণী। মনোজদার কাছে ঋণী। বৃহত্তর অর্থে গ্রুপ থিয়েটারের কাছে ঋণী।' মনোজদার কথায় আমি একদম একমত নই। থিয়েটার থেকে পেয়েছি অনেককিছু। তারপর আমেরিকার ব্রডওয়ে মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা ও গায়ক Terreuce Mann-এর কথাগুলো। "Movies will maxe you famous, television will make you good." দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। মাস্টারমশাই মনোজ মিত্রের-মুখে তখন হাসি।

আপনারা অনেকেই জানেন না, মনোজ মিত্র পঁচাশি বছর বয়সে 'সাজানো বাগান' নাটকটি করতে চেয়েছিলেন, আমাকে টেলিফোনে যখন বললেন, 'আমি বলেছিলাম, 'অনেকদিন ধরে আপনার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, প্লিজ করবেন না। তাছাড়া আপনি তো আজকাল অনেককিছু মনে রাখতে পারেন না।' উত্তরে বলেছিলেন, 'তা ঠিকই বলেছো। তবে কালকের কথা মনে না থাকলেও, বাঞ্ছারামের সংলাপ সব মনে আছে।' নিরঞ্জন সদনে রিহার্সাল দিতে গিয়ে বসে পড়েন। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ২০২৪-এরই ঘটনা। তারপর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

স্বামী চেতনানন্দের লেখা "A bohemian devotee of Sri Ramkrishna" প্রায় দু'বছর আগে পড়েছিলেন। তখন থেকে প্রায় দিনই আমাকে ফোনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিয়ে নাটক লেখার চিন্তাভাবনার কথা শোনাতেন। আজ এ দৃশ্য বাতিল করেন তো কাল আরেক নতুন দৃশ্য গড়েন। নাটকটা আর সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

নাটককার আর অভিনেতা মনোজ মিত্রর এই দুটো ইচ্ছে পূরণ না হলেও, রেখে গেলেন সহস্র নাটক। করো না, তোমরা কত অভিনয় করবে।

দু লা ল লা হি ড়ী
স্মৃতিকথায় অভিনয় জীবনের গুরু মনোজ মিত্র

আমার অভিনয় জীবনের গুরু মনোজ মিত্রকে আমার প্রণাম জানাই।

একজন ভালো শিক্ষক, শেখার প্রতি ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলে, কল্পনাকে উসকে দেয়, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে। মনোজদা ছিলেন আমার তেমন শিক্ষক।

'সাজানো বাগান' নাটকে ন'কড়ি দত্তের ভূমিকায় অভিনয়ের পর যখন 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের 'রাক্ষস' চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হই, তখন বলেছিলেন, নাচে, গানে অভিনয়ে মাতিয়ে দেবার মত চরিত্র দিলাম, Sincerity-র যেন কোনো অভাব না দেখি, তখন মঞ্চে 'সাজানো বাগান' নাটকটা চলছে... সবাই বাঞ্ছারামের অভিনয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তখনও সিনেমাটা হয়নি। আমাকে দিলেন মূল চরিত্র আর নিজের জন্য বেছে নিলেন, ছোট্ট একটা চরিত্র কঙ্ক পন্ডিত, সত্যিকথা বলতে 'মেষ ও রাক্ষস' আমাকে অভিনয় জগতে পরিচিতি দিয়েছিল, সেই সময়েই ভেবেছিলাম, মানিকতলার মোড়ে, আমার মেডিসিনের দোকান 'Life' তুলে দিয়ে, অভিনয়েই Life দি"। হয়তবা 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের রাক্ষসের চরিত্রে সুযোগ না পেলে, থিয়েটার সিনেমার অভিনয়ের স্বপ্নটা অধরাই থেকে যেত; আমার অভিনয় জীবন মনোজ মিত্র-র জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে।

দেড়বছরেরও বেশি সময় আগে... হঠাৎ মনোজদার বাড়ি হাজির হলাম। আমাকে সেদিন বলেছিলেন, গিরিশচন্দ্র আর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে একটা নাটক লিখব, স্বামী চেতনানন্দের 'A Bohemian Devote of See Ram Krishna' বইটা থেকে আইডিয়াটা মাথায় ঘুরছে, এবার লিখে ফেলা। তুমি গিরিশ ঘোষ করবে তো? আমি বলছিলাম, হ্যাঁ আপনি যদি শ্রীরামকৃষ্ণ করেন।

বেশ কয়েক মাস আগে পিজি থেকে পেসমেকার নিয়ে সবে বাড়ি ফিরেছেন... আমি Get well soon বোকে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফুলের বোকে হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "দুলাল, আমাদের সুন্দরমের দিনগুলো আর ফিরে আসবে না না?—এখনও কথাগুলো কানে বাজে, এমনকি মনোজদার ক্ষণিকের শিশুর মত চাউনিটাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমাদের বন্ধু শ্যামল সেনগুপ্ত... সুন্দরমে অভিনয় করত ওর সঙ্গে মানোজদার টেলিফোনে প্রায়ই কথা হোত। ওর সঙ্গে মনোজদার 'শেষ কথোপকথন'-র ছোট একটা অংশ আপনাদের শোনাই।

শ্যামল।। হ্যালো মনোজদা... আমি শ্যামল,

মনোজদা।। বলো—

শ্যামল।। কি করছেন?

মনোজদা।। নাটকটা নিয়ে বসেছি। এবার পুরোটা নিখে ফেলব, তোমাকে সেদিন যে দৃশ্যটার কথা বলেছিলাম... ভালো লাগছে না। একটা মহিলা চরিত্রের কথা ভেবেছি। গিরিশ ঘোষের থিয়েটারে পোষাক কাচাকুচি করে, মেলে দেয়। কাজটা সে যত্ন নিয়েই করে। শুনছো তো?।

শ্যামল।। হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং.......

মনোজদা।। এইসব চরিত্র আমাদের থিয়েটারে খুব একটা দেখা যায় না, দেখাব চরিত্রের পেশার বিশেষত্ব, শ্রমিক, কিসের, শ্রমিক?. জানতে পারবে না। এমন একটা চরিত্র আনব, আজই ভাবছি একটা দৃশ্য লিখে ফেলব।

শ্যামল।। এখনতো প্রায় রাত দশটা, আপনার শরীরটা খারাপ..... আগের মত বেশি রাত অবধি লিখবেন না।

মনোজদা।। 'না আর ফেলে রাখা যায় না।

শ্যামল।। অনেককাল আগে আপনিই বলেছিলেন, আচারের মত লেখাও ফেলে রাখতে হয়, মজবে ভালো... তারপর সেটা নিয়ে।

মানোজদা।। একটা জায়গা শোনো—গিরিশ ঘোষ শো শেষে মদ্যপ অবস্থায় অপেক্ষমাণ রামকৃষ্ণের কাছে আসে, সেইসব কথাগুলো বলে....... তোমাকে বলেছিলাম.. এমনকি লাঠিরও খোঁচা মারে দূর থেকে দ্যাখে... কেঁদে উঠে.... দেখবে খুব ভালো লাগবে।

শ্যামল।। খুব ভালো

মনোজদা।। দ্যাখো না..... চরিত্রটা নাটকটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে।

তারপর মনোজাদা খবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। টেলিফোনেও কথা বলতে পারেন না।

রামকৃষ্ণ আর গিরিশ ঘোষকে নিয়ে নাটকটা আর শেষ করে যেতে পারেননি। মনোজদার লেখার টেবিল খুঁজলে... কাটাকুটি অবস্থায় বেশ কিছু পাতা পাওয়া যাবে।

এবার আসি 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের একটা গান গেয়ে শোনাই। গানটা আমার অভিনয়ের রাক্ষস চরিত্রটির গলায় ছিল না, নটীর কণ্ঠে ছিল—নরক গুলজার নাটকের কথা বলো না, "কথা বলো না, শব্দ করো না....ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন"—গানটির।

উল্লেখ করা হয়, এ গানটিরও প্রাসঙ্গিকতা তেমনই।

গান: হয় হয় হয় তোমরা জানতি পারো না...

মানুষ কত ভেড়া হয় চেয়ে দেখো না

......হয়.......হয়........হয়..........

নমস্কার

অ ম র চ ট্টো পা ধ্যা য়
এক নাটককার

আর পারলেন না।

শেষ করতে পারলেন না শেষের নাটক।

সাহিত্যিকের এমন তো হয়েই থাকে, শুরু হয় শেষ হয় না। আলবিদা বলার আগে উদগ্র ইচ্ছের কথা বলেছেন বারে বারে। 'নাটকটা খুব ভালো হবে অমর বাবু। করবেন তো আমাদের সাথে?' উত্তর দেওয়া কি সহজ? আমার মঞ্চ অভিনয়ের আইডল জানতে চাইছেন আমি তার সাথে অভিনয় করব কিনা! পাতা ভিজে যায় এই বয়সেও। অসুস্থ দার্শনিকের মুঠো ধরে আশার বাক্য বলা ছাড়া আর কী-ইবা করার ছিল আমার! দশ বছরে শত দর্শনেও 'বাবু' হয়েই রইলাম ওনার কাছে। এক যুগের ফারাক বয়সে, মেধায় কয়েক যুগ, তবু বন্ধুর সম্মান দিয়েছেন আমাকে। "বুঝলেন অমর বাবু নাটকটায় একটা চরিত্র আছে তার নাম (একটু থেমে) কালু। ঐটি আপনি করবেন, হ্যাঁ।" শেষের কয়েক মাস এভাবেই চলত। তখনো নাকে নল বসেনি—কোন দিন চা-এর কাপ সামনে রেখে গল্প বলার চেষ্টা করতেন, নতুন নাটকের গল্প। শেষ হ'ত না, পারতেন না, হয়ত ঢুকে পড়তেন 'ভেলায় ভাসে সীতা'র পঞ্চবটি বনে নয়ত 'আশ্চৌর্য ফান্টৌসি'-তে।

একটা বিষয়ে আমি অবাক হতাম প্রায় ফুরিয়ে আসা জ্ঞানী ভুলে যাচ্ছেন সব কিছু; কিন্তু নাট্যকার তাঁর স্মৃতিতে যত্নে বহন করছেন তাঁর সৃষ্টি। কি করে সম্ভব—ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞান ঘাঁটলে পাওয়া যেতে পারে।

কোনদিন আমার কথায় ময়ূরী 'পরবাস' থেকে মন্দিরার সংলাপ বলতে শুরু করল, সজাগ হয়ে উঠলেন বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা। শয্যা আঁকড়ে বলে চলেছেন গজমাধবের সংলাপ। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়েছে—ব্যাঞ্জনায় ঘাটতি নেই। অপূর্ব সেই দৃশ্য-কাব্যের সাক্ষী থাকলাম আমি। বুঝলাম ইচ্ছাশক্তি মানুষকে কতদূর নিতে পারে।

বারো বছর বয়সে চলে আসতে হয়েছে ইছামতির এপাড়ে, ওনার কথায় 'ঠাকুরদাদার ভদ্রাসনে'। হাসনাবাদ আর টাকির মাঝামাঝি দন্ডিরহাট গ্রাম হল তার শৈশবের চারণভূমি। আমাদের নাটককার তখন গল্প লেখেন। মানস চোখে দেখতে পান ইছামতির সেই পাড়ে ছেড়ে আসা শেতলাতলা। দন্ডিরহাট নগেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষা নিকেতনের মাসিক হাতে লেখা পত্রিকা 'কল্পনা'—তাঁর গল্প 'বাঁশির সুর' পছন্দ করেছেন। ছাত্র, শিক্ষক আর গ্রামের বাড়ি বাড়ি নিয়ম মেনে ফেরে কল্পনা। উনি নিরলস। পড়ার বই ওপরে নীচে গল্পের খাতা। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি নাটকে হাত দেবার আগে পর্যন্ত স্কুলে—কলেজে গল্পকার হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন মনোজ। নাটকের প্রতি অগাধ ভালোবাসা তাও দন্ডিরহাট থেকে। নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন, সন্ধের পরে বাড়ি লুকিয়ে পাড়ি দেন বান্ধব নাট্য সমাজে, প্রৌঢ় এবং যুবকদের মাঝে। পার্ট নেই, মশগুল থাকেন প্রম্পটার হয়ে, দোকান থেকে কেটলি

ভর্তি চা আনার কাজে। ভাবখানা এই, তার জন্যই তো থিয়েটার হচ্ছে! অতিরঞ্জিত বলা যাবে না। সেকালে প্রম্পটারের কী দাপট! মুখস্ত করে পার্ট বলতেন খুব কম জনা শুনে বলাই রেওয়াজ। শুধু শব্দ মনে করালে হয় না আবেগ সহ শোনাতে হয়। মনোজের কথায় —আমি যেন একাই সব চরিত্রে অভিনয় করছি। বলা যায় দন্ডিরহাট মনোজ মিত্রের অভিনয়ের আঁতুড়ঘর।

পঞ্চাশ দশকের মধ্যযামে লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। ৫৯-এ মঞ্চস্থ হল নাটক। আশি বছরের বৃদ্ধের ভূমিকায় একুশে মনোজ। সাড়া ফেলে আবির্ভাব অভিনেতা এবং নাটককার মনোজের। বলতেন, ঠাকুরদার সব কিছু লক্ষ্য করতাম—কথা বলা, শোনা, বিছানায় বা চেয়ারে বসে থাকা, অসহায় দৃষ্টি, কিছু শব্দ সব সব। ছোটকাল থেকে ঠাকুরদাকে আমি অসুস্থ দেখেছি। এটা আমার খুব কাজের হয়েছে বঙ্কিমের চরিত্র করার সময়। আমাদের মহলায় উনি প্রায়ই মানুষকে দেখা বা লক্ষ্য করার কথা বলতেন। অভিনেয় চরিত্রের কাছাকাছি আদলে কাউকে পেয়েছো কিনা ভাবো, তার সাথে নাটকের চরিত্রটির বাড়তি বিষয়গুলো যোগ করে তোমার কল্পনার রং-এ রঙিয়ে নাও, বিশ্বাসযোগ্য হবে অভিনয়।

ভালো অভিনয় করার অথবা বলা ভালো অভিনয়ে বাড়াবাড়ি না করে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চাবিকাঠি 'observation'এর সন্ধান দিতেন এইভাবে।

মনোজ মিত্রের নাটক এ ভাবেই তো কথা বলে। ঝান্ডা তোলে না, আবির ছড়ায় না। জীবনের কথা বলতে এসব খুব জরুরী তাও মনে হয় না তার নাটকে। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে নির্ভীক নাটক 'নরক গুলজারে' ধিক্কার দেন—"ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন, দায়ভার বইতে পারেন না। কথা বোলো না, কেউ শব্দ কোরোনা, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন গোলযোগ সইতে পারেন না।"

সীতা, সরমা, উত্তরা বা কর্ণার্জুন ইত্যাদি পৌরাণিক পালার কথা হয়ত এখনও অনেকের মনে আছে। সাড়া জাগানো পালা সব। মহাকাব্য সামনে রেখে ঘটনার আবেগঘন বিস্তার। মনোজ আমাদের দুটি মহাকাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন বাস্তবকে সামনে রেখে। 'অশ্বত্থামা'য় তুলে ধরেছেন মহাভারতের অতৃপ্ত মানবাত্মার ক্রন্দন, রক্তপাতে শান্তি নেই। 'রাজদর্শনে' অপাংক্তেয় শনিদেব ক্রোধ কামে জর্জরিত, দেবকুলের বৈষম্যের শিকার। 'যা নেই ভারতে' গান্ধারীর একশত এক সন্তানের বাস্তবতা খুঁজে পাই। রাজ পুরুষদের ঔরসজাত বিভিন্ন গর্ভের ফসল যুদ্ধের প্রয়োজনে জঙ্গল থেকে রাজবাড়ীতে স্থান পায়।

'রামায়ণে আছে রামচন্দ্রের বনবাস। বনবাসী পোষাকে স্ত্রী এবং যুদ্ধ বিশারদ ভাই এবং কয়েক গাড়ি অস্ত্র নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটি বনে গেলেন। অযোধ্যা বেছে নিল লঙ্কা রাজের অধিকারের পঞ্চবটিকে। মুনি ঋষিদের রক্ষা করার আছিলায় নিরীহ বনবাসীদের আকছার হত্যা, নিরস্ত্র শূর্পণখাকে সশস্ত্র লক্ষ্মণের আক্রমণ, নারীর নাক কেটে সৌন্দর্যহরণ—এ নৃশংসতা ও অসভ্যতা একালেও বিরল। পররাজ্যে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ এবং যুদ্ধে প্ররোচনা

দেবার সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ। অবশ্যম্ভাবী হয় লঙ্কা আর অযোধ্যার যুদ্ধ। সীতাহরণ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র। নারীকে ব্যবহারের চিরাচরিত ছক—নাটক, ভেলায় ভাসে সীতা।

মনোজ মিত্রের না লিখতে পারা নাটকের কাহিনী 'সীতার লঙ্কা বাসের সাতকাহন' এবং আর এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের সন্ধান। পারেননি নাটকটি লিখে যেতে। নাম ঠিক করেছিলেন —'রে রে পানকৌড়ি'। অসুস্থ নাটককার মাঝেমাঝে চেষ্টা করতেন শেষ পর্যন্ত বলতে, পারেননি। তাঁর অসমাপ্ত কথা এইরকম —"সীতা লঙ্কায় ভালো আছেন। যা অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরে ছিল না, পঞ্চবটিতে রাম সকাশে ছিল না, লঙ্কায় আছে। লঙ্কার তথাকথিত অশিক্ষিত অসভ্যরা নারীকে সম্মান করতে জানে।"

সীতা লঙ্কায় ভালো আছেন। ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। লঙ্কায় তিনি স্বাধীন। মনের মত সঙ্গি সাথী হয়েছে। তাঁর পাতানো বোন পানকৌড়ি আছে। জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছে সীতা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অযোধ্যা তো সীতাকে ব্যবহার করে লঙ্কারাজের চরিত্র হরণ করতে চেয়েছিল। লঙ্কা রাজ্যের সুনাম হরণ করতে না পারলে সেই দেশ দখলের সপক্ষে জনমত তৈরী করা যায় না।

সীতা অনড়। অযোধ্যার বার্তা বাহকেরা ব্যর্থ হয় বারবার। কাজেই সীতার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ওকে সরানো দরকার। সীতা হত্যার দায় চাপবে লঙ্কার ওপর। গুপ্তঘাতকের ব্যবস্থা হল, করলেন রামচন্দ্র। নাম, কালু। কালু সাঁতারে পটু। সমুদ্র সাঁতরে লঙ্কার অশোকবনে উঠে সীতাকে হত্যা করা সামান্য ব্যাপার। মাঝ সমুদ্রে পানকৌড়ি চ্যালেঞ্জ জানাল। লড়াইয়ের ফল কালুর মৃত্যু।"

আর এগোতে পারেননি নাটককার। ২০২৪-এর প্রথম থেকেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না। নিজের দলে রিহার্সাল দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, বাড়ি ফেরেন। আবার ফেব্রুয়ারি মাসে এস এস কে এম। পেশমেকার নিয়ে ফিরে আসেন। বেশ কয়েক বছর আগে বাইপাস হয়েছে, স্টেন্ট বসেছে, এবার বসল পেসমেকার তাও নাটক চিন্তায় দিন কাটত তাঁর। মে মাসে নিজের নাটকের দলে গেলেন একদিন। ঘোর দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কয়েকদিন পর থেকে শুরু হল হাসপাতালে যাওয়া আর আসা। পারলেন না, ঐ বৎসরের বারো নভেম্বর আলবিদা জানালেন আমাদের। এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা হারিয়ে গেল।

একজন মানুষ কখনও একমুখী হয় না। মনের বিভিন্ন স্তর থাকে সবগুলোর সন্ধান হয়ত সে নিজেই জানেনা। তাইতো মানুষের মন নিয়ে এতো গবেষণা! ঈর্ষণীয় প্রতিভাধর মনোজ মিত্র একজন মানুষ। ব্যবহারিক জীবনে বিচ্যুতি ছিল তাঁরও। সেই কারণেই হয়ত অনুতাপের বশে আমাকে জড়িয়ে রাখছিলেন প্রথম দিকের মত। থাক, সে আলোচনা এই পরিসরে নয়।

আমি তাঁর কাছে অভিনয়ের পাঠ, নাট্য সংগঠনের পাঠ, নির্দেশনার পাঠ নিয়েছি একলব্যের একাগ্রতায়। তিনি আমার দ্রোণাচার্য!!

ম য়ূ রী মি ত্র
সে বরণে

১

বসন্ত। গায়ের ছাল উঠছে। মামড়ি।

গা ফর্সা। গায়ের ছাল ফর্সা। রোমকূপে জমা ময়লাও। ময়ূরী নামক অমনুষ্যের শরীরে এত সাদা উৎকট। অথচ একবার দেখো তার বন্ধুগুলোকে! একখানা পা নিয়েও কত সুন্দর! নীল আকাশের ছায়া তাদের সর্বাঙ্গে! কেউ সবুজ পাতা দোলাচ্ছে। তার সবুজ, ঘন বোতল। পাশেরটার সবুজ আবার টিয়া। পাখি টিয়া বসতে গেলেই মিলিয়ে যাবে গাছটিয়ায়। দুটোর মাথায় হলুদসবুজ পাতার ঝুড়ি। বদরীপাখির ছাতা মাথায় এখনই ছুটবে তারা পাতার ঝুড়ি নিয়ে। আরে বাবা! পৃথিবী থেকে আকাশ কি কমখানি পথ গো! ক্যামফ্লেজ করে যেতে হবে তো! নইলে মানুষগুলা সবুজ লুঠ করবে!

বদরীর পাখার সবুজ হলুদে পাতার হরিয়ালী মিশে এক মহাদৌড় লাগা দেখি!

আকাশেতে সবুজ পাতা লাগবে। দিনভোর সূর্য পৃথিবীকে তাপ দেবে। বসন্তে মানুষের শরীরে রোগ বেশি। এসময় সূর্যের আলো দেওয়ার বিরাম নেই। বিরাম রাখতেও নেই। সূর্য এ জানে। তাই সারাদিনমান গতর খাটিয়ে অস্ত যাবার কালে খাবার খোঁজে। গাছের পাতা যদি সন্ধেকালে একবার আকাশে ওড়াউড়ি করে তো সূর্য তাকে খেয়ে ফেলবে। সবুজ খেয়ে নিজের গভভ ঠাণ্ডা করবে। তবে তো নতুন সবুজের জন্ম দিতে পারবে। ওহে! গাছের পৃথিবী তো আর মানুষের পৃথিবীর মতো মমি নয়।

এই রে! স্কুলমাঠের পাঁচিলের ধারের দিব্যগাছটি কবে এমন হাঁড়িভরা সিঁদুর হয়ে গেল রে! এই দিব্য ! বলিস নি কেন ... আমি লাল হব! রোজ বারান্দায় বসে তোকে এতো দেখি! একবার তো বলবি! তোর লাল খানিকটা শুষব তবে! কতকাল সাদা শরীরে পড়ে আছি সিমেন্ট বাড়িতে! একটু মায়া কর বাপ! মানুষের মতো গাছেরা নির্বিকার হলে আমার চলে কী করে! আহা হা! বহুবর্ণে বিচিত্র সুন্দর হয়ে উঠেছে আমার গতজন্মের বন্ধুরা।

বাবা বলতেন—মানুষকে কখনো কখনো গাছ হতে হয়। বাচ্চা ছেলেগুলো যেমন বেলুনে গ্যাস ভরে অমনি করে হাত-পা-ওয়ালা শরীরে সবুজের আকুতিটুকু পুরতে হয়। তবে সংসার হয়। সে সংসারে অজস্র নাটক। কী যে বলতেন আমার দার্শনিক বাবা ! খালি কোবতের মতো শোনাত!

সেবার থিয়েটার করে ফিরছি আমেরিকা থেকে। প্লেনে পাশে এক কালো মানুষ। অন্ধ।

—বাবা, ফুল নিগ্রো? একটু মিক্সড লাগছে না?

—মানুষের জাত উচ্চারণ ঠিক না গালু। বলো ...আফ্রিকার মানুষ। দেশ বা দেশের মাটি এমনকি সে দেশের জন্তু জানোয়ার দিয়েও পরিচয় করাতে পারো মানুষের!

—মানে?

—মানে তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস করতে পারো আপনি কি বড় ঘাসের দেশের মানুষ! কিংবা সিংহের দেশের মানুষ!

—যদি থাপ্পড় মারে বাবা!

—মারবে না। মানুষের অন্তর তার দেশের মাটিতে পোঁতা থাকে! গাছের মতো । দেশের পশুও তার কাছে রজনীগন্ধা। মনমন্দির ভরে রাখে।

মানুষটির সঙ্গে টুকটাক কথা শুরু করেছেন বাবা ! বড্ড বকবকে নাট্যকার ! মেয়েটাও ততোধিক বখাটে। সিংহের দেশের মানুষ কথা কম কয়। দুরারোগ্য চোখের রোগে ভুগছেন। আগে এক চোখ গিয়েছিল, এখন আমেরিকান চিকিচ্ছেতে এটাও গেল! চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের দেশের এক মানুষ সে জল মুছিয়েও দিচ্ছেন।

ভদ্রলোক বললেন, বাড়িতে বউ অপেক্ষায় আছে। চোখের যন্ত্রণায় না বউকে ছোঁয়ার আশায়, জানি না, ভীষণ ছটফট করছিলেন মানুষটা। খাবার এল। খেতে গিয়ে একটু এলোমেলো করে ফেললেন।

নাটক লেখা পাঁচ পাঁচটা আঙুল ফের গুছিয়ে ঠোঁটের সামনে ধরছিল।

—উফ বাবা! উনি habituated এভাবে খেতে! তুমি শুধু গুছিয়ে দাও! মুখের সামনে ধরার কী আছে! উনি তো ভাবতে পারেন ...তোমার হাত ময়লা!!

উত্তর এল—

অবশিষ্ট চোখটাও হারিয়ে যে লোকটা ফিরছে তার ঠোঁট সবার আগে মানুষের স্পর্শ চায়!

আবার কোবতে!

সিংহ কিংবা বড় ঘাসের দেশের মানুষ টয়লেটে যাচ্ছেন। পেছনে কবির দেশের পাহারাদার ছুটছে!

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল! এয়ারহোস্টেসগুলো ধরতে গিয়ে বাবার কাছে খেদানি খেয়ে ফিরে আসছে। হাসছে শালারা!

প্লেন থেমেছে। উনি এবার নেমে যাবেন। দু'জন দু'জনের হাত জড়িয়ে ধরেছেন। নিখুঁত ইংরেজিতে কিছু কথা—

আমার স্ত্রী pre natal deaf ....জন্ম থেকে কথা বলতে পারে না .. কানে শুনতে পায় না ...আমি ওকে

অনুভব করতে পারব তো?

রবীন্দ্রনাথের দেশের নাট্যকার মনোজ মিত্রের উত্তর ছিল—

পারবে। গাছের তলায় চোখ বুজে যেমন করে ছায়া অনুভব করো তেমন করে পারবে।

অনেকক্ষণ থাকার পর মনে হবে, বউটা তোমার পাতাভরা গাছ হয়ে গেছে। দু- তিনরকম পাতা।

হাসি ..কান্না ...কাকলি ।

২

বাবা বলতেন, আমরা নাকি ছে পত্তনিদার ছিলাম । সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহর গ্রামে বেশ খানিকটা জমি বাগানের সঙ্গে ক' ঘর প্রজাও ছিল আমাদের। বছরে দু'বার খাজনা জমা দিতে হিন্দু মুসলমান সবাই জমা হতেন মিত্তিরবাড়ির উঠোনে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিয়ম অনুযায়ী চোত মাসের শেষ দিন আর আরেকটা বোধহয় খুলনার রীতি অনুযায়ী নবান্ন উপলক্ষে, শীতের ফসল উঠলে। তখন কোনো বাংলাতেই পরিবার একই জায়গায় ফালা ফালা হয়ে থাকত না। বাবা মনোজ তখন ছ' বছরের বালক। ওই দুটো বিশেষ দিনে সে বালক বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে ঠাকুরদার কোলে বসে খাজনা আদায় করত। অত্যাচারের নয় ,ভালোবাসার খাজনা আদায়ে ওস্তাদ ছিলেন বাবা। নাট্যকার মনোজ মিত্রের নোটঙ্গীর শুরু সম্ভবত তখন থেকেই। ঠাকুরদার কোলে পা নাচাতে নাচাতে প্রজাদের এক একটি হুকুম ...

—কাকা, শোল মাছ কাঁচা আনলে কেন? ঠাকুমা জল জল (বোধহয় ঝোল বোঝাতে চাইতেন) করে ফেলে। দাদু তুমি কাকাকে বলে দাও আম দিয়ে রেঁধে আনতে।

প্রজারা হয়ত বড়কর্তার সামনে সিকি আধুলি, কলা মুলো, দুধ, নারকেল সাজিয়ে রাখছেন। আমার বালক বাবা চেঁচালেন —

আরে আরে পয়সা সরাও। পয়সা হাতে নিলেই ছোটরা খারাপ হয়ে যায়। এখুনি আমার হাতের কাছ থেকে পয়সাগুলো নিয়ে নাও। তোমাদের ওই দুধ নারকেল কলা খুব ভালো গো। ওগুলো দিয়ে পিঠে ভালো হবে গো। নারকেল দিয়ে চাপাটি পিঠে অর্থাৎ পাটিসাপটা। পরবর্তীতে দেখেছি, পাটিসাপটা একসঙ্গে অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছেন। প্রতিবছর পাটিসাপটা খেয়ে পেটখারাপ হতই হত বাবার।

যে কথা হচ্ছিল, মিত্তিরবাড়ির কোনো কর্তাই কখনো নিজেদের ওই 'ছে পত্তনিদার' পদ নিয়ে সচেতন ছিলেন না। হয়ত সচেতন হতে চাইতেনও না। সব পূর্বপুরুষের নিয়মনীতি তো বলতে পারব না। তবে বাবার ঠাকুরদা অন্নদাচরণ মিত্রের সময় থেকে বৈশাখী ও নবান্নের খাজনা দেওয়ার দিন দুটো ছিল মানুষের সঙ্গে গল্প করার দিন, দূর দুরান্তের চাষীদের সুখ দুঃখ জানার দিন। চাষীদের সঙ্গে তাঁদের চিরকালই এক চুক্তি—

আম পাকলে এসো। একসঙ্গে বসে আম খাব। মেয়েবউদের পাঠিও । তাঁরা আমাদের বউ ঝিদের সঙ্গে বসে আমসত্ত্ব দেবে। ভাগ করে খাবে সব। আর নবান্নে যদি গোলাভর্তি ফসল ওঠে, তবে এস—

দুধ নারকেল নিয়ে। পিঠে হবে, গরম ফেনা ভাত, রাঙা আলু সেদ্ধ হবে। সারাদিন তোমরা থাকবে মিত্তিরবাড়িতে। একসঙ্গে খাবে দাবে নাইবে।

বাগদি, কাহার এবং মুসলমানরাও পুকুরে চানটান করে ভাত খেতে বসতেন । সন্ধেতে হিন্দু পিঠে হত—

দুধপুলি ভাজা পুলি আর পাটিসাপটা। আর বাবার উৎপাতে পাশের মুসলমান সানা বাড়ির বউকে বানাতে বলতেন মুসলমান পায়েস। নাম টাম সব বাবার দেওয়া । ভালোবাসা তখন বাঙালির অন্তরে। ভোটের বাক্সে নয়। ফলে হিন্দু মুসলমান জাতের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হত অনায়াসে। এইসব গল্প শোনার সময় বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম — মুসলমান পায়েস আবার কী? সিমুই ভেজে কি?

বাবা অদ্ভুত এক রেসিপির কথা বলেছিলেন। সানা বাড়ির মেজ বউ সারাদিন নতুন চালে ঘি আর পাটালি গুঁড়ো মাখিয়ে রাখতেন। সূর্যও মাখত এই চাল। সূর্যের আলোয় যতবার চাল শুকিয়ে যেত ততবার ঘিয়ের একটি করে পরত আর গুঁড়ো পাটালি। সন্ধেবেলা দুধ, ফের আরো অনেকটা পাটালি দিয়ে পায়েস তৈরী। মেজ বউ বলতেন—চালে শুকনো ভাব এলে মিষ্টি ভালো হয় না, দেশও ভালো থাকে না।

মেজ সানার বউয়ের কাছে এ কথার মানে অবশ্য জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাননি মনোজ। দেশ ছাড়ার আগেই তিনবছর তিনি চলে গিয়েছেন। আমার ঠাকুরদার কর্মস্থলসিরাজগঞ্জে। ভারতে এসে মেজবউয়ের কথা মনে পড়লেও নিজেকে আশ্চর্য দক্ষতায় সংহত করে নিতেন। তখন তিনি কিশোর। তবুও বুঝে গিয়েছিলেন আবার বেড়া টপকানো তাঁর হবে না। ভারতের বাড়িতে পিঠের দিন এলে শুধু বলতেন—

ওহ! পিঠের দিন মেজ বউ শুধু আমায় নিয়ে মেতে থাকত গো। বারবার চালে ঘি গুড় দেবে। দুধ জাল দেবে এমন নিবিষ্ট হয়ে ...মনে হবে কাঠের আঁচে দুটো চোখ বসে। নিজের ছেলেমেয়েগুলো পায়েস চাইলেও দেবে না। আগে আমায় খাওয়াবে। তবে ...

আমার ধর্মনিরপেক্ষতার ছাতারমাথা দর্শন তো বর্তমান দেখে। বোকার মতো প্রশ্ন করতাম—

মেজবউ বলে কেন ডাকতে বাবা? কাকীমা বলতে না ...

বাবা বলতেন —

দূর! ও তো সারা গাঁয়ের মেজবউ। আমারও মেজবউ। একবার খেলে পাড়াময় ছেলেদের জুটিয়ে...আবার সন্ধেতে লক্ষ্মী হয়ে বরের রান্না বসায় উনুনে। বয়ে গেছিল আমাদের, ওকে কাকী ডাকতে। আরে সারাদিন মেজবউ মেজবউ, বলে ধুম উঠত, ওর ছেলেগুলোও বোধহয় মেজবউ ডাকত।

মেজবউয়ের গল্প খুব অল্প বলেছেন। তাও হয়ত কেবল আমাকেই। বলতে গিয়ে ভেতর যে তাঁর ছটফট করত এ বেশ বুঝেছি।

একবার নবান্নে এই মেজবউকেই নিজের জমি দিতে চাইলেন।

—ও মেজবউ .. আমাদের যে আমবাগানের শেষ দেখা যায় না, সেখানে আমারও জমি আছে গো। ঠাকুমা বলেছে, খোকা হিমসাগরের তলাকার জমি তোর। ও জমি খুব মিষ্টি মেজবউ। দেখো না, সবাই বলে, মিত্তিরবাড়ির হিমসাগর দেশের সেরা! তুমি এত্ত ভালো পায়েস কর। তোমায় ওই জমি দিই গো। একদিকে মোটা মোটা গরু চরবে আরেকদিকে চালের গাছ করবে। আর খেজুর গাছ তো তোমার আছেই।

মেজবউ বলেছিলেন —

সমান সমান জমি থাকলে তোদের প্রজা হব কী করে রে!

— দূর বোকা । সমান নয় ও আমার মেজবউ তোমার জমি বেশি থাকবে। নবান্ন ছাড়া অন্যদিনও যদি পায়েস খিদে পায়! তাই দু' এক বিঘে বেশিই দেব। একদিন তুমি আমি গিয়ে জমি বাছাই করে আসব। ফিতে নিয়ে নেব কাকিমার সেলাই বাক্স থেকে ...

তীব্র সুরে সামনে বসা বালকের মুখ চাপা দিয়েছিলেন মেজবউ—

জমি মাপে না ...ও বুদ্ধ।

'সাজানো বাগানে'র নাট্যকার হতে তখনো যুগের অপেক্ষা। যুগ পটপরিবর্তন আনে। সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক মনোজ মিত্র বুঝেছিলেন মেজবউয়ের কথার মানে।

জমির মাপে মাটির মরণ।

প্রজার বেশি জমিতে ব্রহ্মার অভিশাপ।

চুপ। কথা বোল না । শব্দ কোরো না।

(মনোজ মিত্রের ছেলেবেলার একটি নাম বুদ্ধ। অনুমতি ছাড়া এ লেখা ও লেখায় ব্যবহৃত তথ্য কেউ ব্যবহার করবেন না।)

র জ ত ম ল্লি ক

'মনের মানুষ মনোজ মিত্র'

অবিকল লতাপাতার মতোই কিভাবে জড়িয়ে যায় এক একটা ছোট জীবনের সাথে এক একটা বড় জীবন সেটাই আমার এই লেখার মূল নির্যাস। আমার ভালোবাসার সমস্ত প্রিয় পাঠককে এই লেখার শুরুতেই একটু জানিয়ে রাখছি স্যার 'মনোজ মিত্র' মানুষটা আমার জীবনে ঠিক কী এবং কতটা ? পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেমন কোনো সংজ্ঞা লেখার পর বেশ কিছু উদাহরণ লেখার প্রথা প্রচলিত, ঠিক তেমনই আমারও ভীষণ ভালো লাগে কিছু লেখার সময় বা কিছু বলার সময় একাধিক উদাহরণ দিয়ে তা বলতে বা লিখতে অথবা লেখার শুরুতে কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা করতে। তাতে আমার লেখাতেও গতি থাকে আর পাঠকেরও সুবিধা হয় আমার লেখনীর বেশ খানিকটা গভীরে প্রবেশ করতে। সুতরাং আমার লেখায় উদাহরণ এবং গৌরচন্দ্রিকা থাকবেই। তাহলে শুরু করা যাক। আমি জন্মেছি উত্তর কলকাতার গড়পার রোড সংলগ্ন জিতেন্দ্রনারায়ণ হাসপাতালে এবং আমার জন্মভিটে উত্তর কলকাতার কৈলাস বোস স্ট্রিট সংলগ্ন মহাকালী পাঠশালা স্কুল এবং রামমোহন রায়ের বাড়ির মাঝের অংশে অর্থাৎ রমাপ্রসাদ রায় লেনের শিব মন্দিরের পাশের গলিতে। আমার উত্তর কলকাতার বাড়ির চারপাশটাকে ঘিরে রয়েছে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ রায়, সন্তোষ দত্ত, ছায়াদেবী, গীতা দে, যামিনী নাথ গাঙ্গুলী প্রমুখদের বাড়িগুলো। আর আমার বাড়ির চারটে বাড়ি পরেই অর্থাৎ আমার বাড়ির গলি রমাপ্রসাদ রায় লেনের ভেতরেই থাকতেন স্বর্ণযুগের সাদা কালো ছায়াছবির অভিনেতা মণিশ্রীমানি। সুতরাং জন্মের পর থেকেই অভিনয় আবহেই আমার বেড়ে ওঠা সম্পন্ন হয়েছে। জন্মানোর পর এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত আমার বড় হয়ে ওঠার যে ধাপগুলো তা আমার খুব একটা আজ আর মনে নেই। কিন্তু প্রথম যেদিন মা বাবা স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গেলো সেই প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিনটি থেকে এই আজ পর্যন্ত যত স্মৃতি, যত শোক সবটাই আমার কাছে জাগ্রত এবং জীবিত। আমার মা যেহেতু উত্তর কলকাতার মহাকালী পাঠশালা হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলো তাই সেই সুবাদে একদম প্রথমেই নার্সারি, কেজি ওয়ান এবং কেজি টুতে পড়াবার জন্য মা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলো মেয়েদের স্কুল অর্থাৎ মায়ের নিজের স্কুল মহাকালী পাঠশালাতে। কারণ মেয়েদের স্কুল হলেও মহাকালী পাঠশালা স্কুলের এই তিনটে শিশু ক্লাস ছিলো কোয়েড অর্থাৎ ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য। যাইহোক আমি সেখানে ভর্তি হলাম এবং স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। তখন কিইবা আমার বয়স? সদ্য প্রয়াত স্যার মনোজ মিত্রের প্রসঙ্গ টেনে এনে অনায়াসে বলাই যায় তখন আমার বয়স শসার বিচির মতো ফুটুসখানি। যেটা বলছিলাম সেটা হোলো মহাকালী পাঠশালা স্কুলে ভর্তির পর প্রথম বছরই স্কুলের ম্যাডামরা রবীন্দ্রনাথ নয়, সুকুমার নয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী

অনুষ্ঠানে করিয়েছিলেন মনোজ মিত্রের লেখা একটি একাঙ্ক ছোটদের নাটক চমচমকুমার। আমি তাতে অভিনয় করেছিলাম 'কবি জলভরা তালশাঁস' চরিত্রে। তখন নাটক কি তাও জানিনা, মনোজ মিত্র কে তাও জানিনা। কিন্তু সে নাটকে অভিনয়ের পর ম্যাডামরা নাকি বলেছিলেন এ ছেলে বড় হয়ে অভিনেতা হবেই। মা বলেছে সে কথা আমায়। মাকে নাকি ম্যাডামরা আমার নামে প্রচুর প্রশংসা করেছিলো। এরপর আমাকে বাবা ক্লাস ওয়ানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করালো উত্তর কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে অবস্থিত বিদ্যাসাগর কলেজের পাশে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (মেন) স্কুলটিতে। আমার যতদূর মনে হয় এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর এবং এই স্কুলের ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দ এই তথ্যে আপ্লুত হয়ে বাবা কিন্তু এই স্কুলে ভর্তি করেনি আমাকে। আসলে এই স্কুলের একজন পিটি শিক্ষক শ্রীপাল পান্ডা ছিলো বাবার খেলার মাঠের বন্ধু। তাই সেই সূত্রে বন্ধুর ছেলেকে বন্ধু আগলাবে সেই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়েই ভর্তি করানো হয়েছিলো আমাকে মেট্রোপলিটন স্কুলে। এই অছিলায় জানিয়ে রাখি আমার বাবা ছিলেন সিএবির ক্রিকেট আম্পায়ার এবং কলকাতার সমস্ত খেলার মাঠের পরিচিত নাম কচি দা। তো এই কচি দা অর্থাৎ আমার বাবার হাত ধরে ভর্তি হয়েছিলাম মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মেন স্কুলে। সেখানে ক্লাস ওয়ানে প্রথম বছরেই পেয়েছিলাম তপন ভৌমিক নামে একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড ভার্সেটাইল গুণের অধিকারী স্যারকে। এই তপনবাবু স্যার ছিলেন একজন নাট্যপ্রেমী মানুষ এবং আমাদের প্রাইমারীর পিটি শিক্ষক এবং কালচারাল টিচার। এই তপনবাবু স্যারই জীবনে দ্বিতীয়বার আমাকে পরিচয় করিয়েছিলেন মনোজ মিত্র নামটির সঙ্গে। স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমাদের মতো ছোট্ট ছোট্ট পুচকেদের দিয়েই তপনবাবু স্যার অভিনয় করিয়েছিলেন মনোজ মিত্র রচিত 'চোখে আঙ্গুল দাদা'র মতো একটি অত্যন্ত বোধের ও বড়দের নাটক। মনোজ মিত্র রচিত এই নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম আমি সেই ক্লাস ওয়ানে। যে চরিত্রটি অন্যের দোষ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও নিজের দোষ দেখতে পায়না। লোকমুখে শুনেছি ক্লাস ওয়ানে এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম সারা স্কুলকে। তাই এই নাটক আবারও অভিনয় হয়েছিলো ওই স্কুলেই, যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি সেই বছর। সে বছর অবশ্য ত্বরণ নামে একজন সিনিয়ার দাদা কাম বন্ধু অভিনয় করেছিলো চোখে আঙ্গুল দাদার চরিত্রে আর আমি সে বছর অভিনয় করেছিলাম বিধাতার চরিত্রে। মেট্রোপলিটন স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি আমি এবং প্রতি বছর নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছি শুধুমাত্র মনোজ মিত্র রচিত কোনো না কোনো নাটকে। কখনও 'সত্যি ভূতের গল্প',কখনও 'নরক গুলজার', কখনও 'নৈশভোজ', কখনও 'আমি মদন বলছি', কখনও 'রাজদর্শন',কখনও 'পুঁটি রামায়ণ', কখনও 'চাকভাঙা মধু', কখনও 'দম্তরঙ্গ', কখনও 'কিনু কাহারের থেটার'। এইভাবে ওইটুকু বয়সেই মনোজ মিত্রের নাটকে এতটাই রস আর মজা পেতে শুরু করেছিলাম যে ছাদে প্যান্ডেল বেঁধে কার্তিক

পুজোতেও মনোজ মিত্রের নাটক অভিনয় ও নিজেই পরিচালনা করতাম। সে বয়সের পরিচালনা যদিও দুধহীন পায়েসের মতো ছিলো তবু চেষ্টা তো করতাম—কিছু একটা করার। ছোটবেলা থেকেই আমার ভীষণ শখ ছিলো সেজ জ্যেঠুর ছেলে মাউকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ছাদে নিজেরাই প্যান্ডেল করে কার্তিক পুজো করার। আমাদের বাড়ির ছাদে করা প্যান্ডেলেই অভিনয় হোতো মনোজ মিত্রের নাটক। সে নাটকের দর্শক ছিলো আমার বাবা মা জ্যেঠু জ্যেঠিমা এবং পাড়া প্রতিবেশীরা এবং সমবয়সী অসমবয়সী বন্ধু বান্ধবীরা।

বেশিরভাগ নাটকের দর্শকই আমার নাটক দেখতে আসতো এক ছাদ থেকে আর এক ছাদের পাঁচিল টপকে। উত্তর কলকাতা সম্পর্কে যাঁদের সম্যক জ্ঞান আছে তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে উত্তর কলকাতার ভগ্ন পুরনো বাড়ির ছাদ সিঁড়ি আর পাঁচিল ঠিক কী প্রকারের হয়। এছাড়াও আমাদের পাড়ার ৪এর পল্লী সার্বজনীন কালী পুজোর প্যান্ডেলেও মনোজ মিত্রের নাটক করতাম নিয়মিত। দু' একবার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অন্য নাটককারের নাটক করেছি ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই করেছি মনোজ মিত্রের নাটক। আবার পাড়ার গলিতে কোনো খেলার বা স্পোর্টসের পুরস্কার দেওয়া হবে বলে যা যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোতো সেখানেও বার বার ওই মনোজ মিত্র রচিত একাঙ্ক নাটকগুলিকেই ঘুরিয়েফিরিয়ে অভিনয় করতাম। পাশাপাশি আর একটা কথা বলি। মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়াকালীন সময়ে আমি একদম ছোট থেকেই আমাদের পাড়ারই পাশের পাড়া বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনে অর্থাৎ ঝুলন গলিতে অবস্থিত একটা ভীষণ কালচারাল বাড়ির সাথে যুক্ত হয়েছিলাম বাবার সৌজন্যে। সেই বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পক্ষ থেকে একটি কালচারাল দল চালানো হোতো যে দলের নাম ছিলো 'নবীন সংহতি'। এখান থেকে প্রতি বছর একটি করে বার্ষিক অনুষ্ঠান অরগানাইজ করা হোতো সুকিয়া স্ট্রিটের রামমোহন লাইব্রেরি হলে অথবা গোয়াবাগানে অবস্থিত বয়েজওন লাইব্রেরি হলে। সেই বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলিতেও আমি বার বার অভিনয় করেছি মনোজ মিত্র রচিত একাধিক নাটকে। এর পাশাপাশি আমার পাঠকদের জানাই একটা মজার কথা। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে প্রতি বছর বিজয়া দশমী এলেই মায়ের সাথে যেতাম মামারবাড়ির বিভিন্ন মামা মামি কিংবা মাসিদের বাড়ি বিজয়া করতে। আর মজার কথা হোলো সেসব জায়গায় গিয়ে আমি বিজয়ার নমস্কার করার পর বড়রা প্রায় প্রত্যেকেই বলতো 'এই শোন মনাই মিষ্টি নিমকি নাড়ু সব পাবি কিন্তু তার আগে যেকোনো নাটকের একটা ছোট্ট কোনো অংশ অভিনয় করে দেখাতে হবে।' আর আমি এই অফার পাওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে মনোজ মিত্র রচিত আমার প্রিয় নাটক 'নৈশভোজ' থেকে কোনো একটা অংশ অভিনয় করে দেখিয়ে দিতাম। কারণ মনোজ মিত্র রচিত নৈশভোজ নাটক আমার জীবনের অন্যতম একমাত্র নাটক যে নাটকের প্রতিটি চরিত্রে কোনো না কোনো সময় আমি অভিনয় করেছি। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই আমার প্রিয় চরিত্র হুক্কা আর হুয়াই বেশি অভিনয় করে দেখাতাম। আবার কখনও অভিনয় করে দেখাতাম ঢ্যাঙ্গা চৌকিদার বা চক্রধর কুন্ডু অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চরিত্রটা।

আবার অনেক জায়গাতেই বিজয়ার নিমকি মিষ্টি খাওয়ার লোভে কিংবা বড়দের থেকে কিছু গিফ পাওয়ার বাসনায় মনোজ মিত্রের নাটক ‘নরক গুলজার’ এবং ‘নৈশভোজ’ নাটকে ব্যবহৃত দু একটা তৈরি করে রাখা গান গেয়ে শোনাতাম। এসব স্মৃতি আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয় বড় হওয়ার পরে এখনও আজও এবং প্রতিদিনই। আর এগুলো করে দেখানোর পর আমার মামা-মামি বা মাসি-পিসিরা আমাকে বিজয়ার নাড়ু নিমকি মিষ্টি এসব খেতে দিতো। সে ছিলো এক সুন্দর সময়—যা আজ ফিরে পেতে বার বার ইচ্ছে করছে। বিশেষ করে স্যার মনোজ মিত্রের প্রয়াণের পর থেকে জানি এত বড় একটা লেখা আমার পাঠকদের পড়তে ভীষণ বিরক্ত লাগছে, কিন্তু এ লেখা লিখে আমি বাঁচার অক্সিজেন পাচ্ছি। তাই লিখছি। আমি মন থেকে চাইছি আমার জীবনে ধেয়ে আসা প্রতিদিনের অনবরত শোক আমার হৃদয় খোলা লেখার দ্বারা নিরসন হোক। যাইহোক আমার স্কুল জীবন তো একটা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হোলো। তারপর ভর্তি হলাম কলেজস্ট্রিট এর প্রথম সারির স্কুল হিন্দু স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ার জন্য। সেখানে গিয়েও বাংলার শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা হোতো মনোজ মিত্র রচিত নাটক নিয়ে এবং স্যার মনোজ মিত্রের অভিনয় শৈলী নিয়ে। তারপর বিকম অনার্স পড়বার জন্য বাবা ভর্তি করালো জয়পুরিয়া কলেজে। সেখানে গিয়েও দেখলাম বাৎসরিক অনুষ্ঠানের জন্য আমার ওপর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ হয়েছে এবং বলা বাহুল্য সে অনুষ্ঠানেও অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেছিলাম মনোজ মিত্র রচিত নাটকই। এইসময় পাড়ার প্রিয় দাদা অরুণাভদা এবং আর এক দাদা বুকাইদার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অভিনয় করেছিলাম নৈশভোজ নাটকে হুক্কাহুয়া শেয়ালের ভূমিকায়। এরপর একবার ব্রাত্য বসু আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলো কাঁচারাপাড়া ব্রাত্যজন দলের আয়োজনে মনোজ মিত্র রচিত ‘নৈশভোজ’ নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করার জন্য। সে দায়িত্ব আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম এবং সে প্রযোজনা ব্রাত্যদা নিজে দেখতেও এসেছিলেন মধুসূদন মঞ্চে। এইসব চলতে চলতেই কবে যেন মনোজ মিত্র আমার জীবনে একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো নিজের অজান্তেই। আর সেই অভ্যাসজনিত কারণে এবং মানুষটাকে ভালোবেসে প্রথম প্রথম কলেজস্ট্রিটের নব গ্রন্থ কুটির থেকে এবং পরের দিকে বর্ণপরিচয় মার্কেটের ওপর অবস্থিত কলাভৃৎ পাবলিশিং হাউজ থেকে কিনে ফেলেছিলাম মনোজ মিত্র রচিত সবকটি একাঙ্ক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের বই। যে বইগুলোর আজও আমার আলমারিতে একটার পর একটা ধাপে ধাপে সাজানো অথচ সে বইয়ের লেখক পুড়ে ছাই হয়ে গেলো মাত্র পাঁচদিন আগে। যাইহোক শোক ছেড়ে আবারও বাস্তবে ফেরা যাক। জানাই এবারে আমার কর্মক্ষেত্রে কি করে প্রবেশ ঘটলো নাট্যকার স্যার মনোজ মিত্রের। ২০০৮ সালে আমি একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিযুক্ত হলাম যেখানে বর্তমানেও আমি কর্মরত।বাংলা প্রবাদ ‘ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে’ অনুযায়ী চাকরিতে প্রবেশ করার প্রথম বছর থেকেই নিজে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করে দিয়েছিলাম স্কুলের ছাত্রছাত্রী

এবং কলিগদের নিয়ে নাটক করানোর পর্ব। আর মনোজ মিত্র যেহেতু আমার রক্তে মিশে ছিলো সবসময় তাই কর্মক্ষেত্রে কলিগ এবং কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে আমার নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করলাম নাটক 'চোখে আঙ্গুল দাদা' এবং ঠিক তার পরের বছরই আবারও কলিগ এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই মঞ্চস্থ করলাম নাটক 'নৈশভোজ'। এই দুটো নাটক নির্বাচন করার কারণ ছিলো এই দুটো নাটক আমি জীবনে এতবার করেছি যে এর আবহ আমার কাছে আগে থেকেই রেডি থাকতো সবসময়। এতক্ষণ আমি যা যা লিখলাম তার সবটাই হোলো নাট্যকার মনোজ মিত্রের সঙ্গে আমি রজত মল্লিকের যোগাযোগ ও যাপন।

এবারে লিখবো প্রথম কবে অভিনেতা মনোজ মিত্রকে আমি মঞ্চে দেখলাম। সে এক অদ্ভুত সন্ধ্যা। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সে এক অদ্ভুত প্রাপ্তি। তখন ক্লাস সেভেন কিংবা এইটে পড়ি। একাডেমিতে মায়ের সাথে দেখতে গেলাম সুন্দরম নাট্য সংস্থা প্রযোজিত এবং মনোজ মিত্র রচিত ও অভিনীত কালজয়ী নাটক 'সাজানো বাগান'। হলে মা আর আমি বসেছি। থার্ড বেল পড়লো। নাটক শুরু হয়ে গেলো। মঞ্চের 'সাজানো বাগানে' একটা ভূত গান গাইতে গাইতে ঢুকলো। মঞ্চের পরিবেশ আলো আঁধারি। কিন্তু আমি মঞ্চে দর্শকাসনে বসে অপেক্ষা করছি কখন মনোজ মিত্রকে দেখবো। কারণ আমি এটা জেনেই হলে গেছি যে সেই মনোজ মিত্রকে আজ আমি প্রথম মঞ্চে দেখবো যে মনোজ মিত্র আমার যাপনের সাথে আষ্টেপৃষ্টে প্রতি মুহুর্তে স্কুল, পাড়া, বাড়ির ছাদ, বাড়ির উঠোন, সব জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। যাইহোক নাটক শুরু হয়ে গেছে। মনোজ মিত্রকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না মঞ্চে। তারপর হঠাৎ চোখে পড়লো মঞ্চের বাঁদিকে পড়ে আছে একটা নোংরা কাঁথাঢাকা স্তুপ। আর সেটা মাঝে মাঝে হাল্কা নড়ছে আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা গোঁ গোঁ শব্দ। একবার করে দেখি নড়ছে আবার দেখি স্থির। আবার দেখি নড়ছে। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখি স্থির। এদিকে মঞ্চের মাঝে এবং ডানদিকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছে অভিনয় করছে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কৌতূহলী চোখ বার বার চলে যাচ্ছে কাঁথা ঢাকা স্তুপটার দিকে এবং উৎসুক মন বার বার খুঁজে চলেছে এতদিন বইতে পড়ে আসা এবং টিভিতে দেখা স্বপ্নের মানুষ অভিনেতা মনোজ মিত্রকে। এই অন্বেষণের নিরসন ঘটিয়ে সেই সন্ধ্যায় নাটক চলাকালীন একটা সময়ে দেখলাম ওই স্তুপের মধ্যে থেকে একটা ছেঁড়া ধুলধুলে পোশাক পরে এক গাল সাদা দাড়ি গোঁফ নিয়ে এক বৃদ্ধ আসতে আসতে মুখ বাড়াচ্ছে মঞ্চে বেরিয়ে আসার জন্য ঠিক যেন কচ্ছপের মতো। আমি কিন্তু তখনও জানিনা ওই স্তুপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কচ্ছপের মতো মুখখানা আমার অন্তরের মানুষ অভিনেতা মনোজ মিত্রর মুখমন্ডল। হ্যাঁ ওই মুখটাই ছিলো অভিনেতা মনোজ মিত্র অর্থাৎ বাঞ্ছারাম কাপালির মুখ। দেখলাম অভিনেতা মনোজ মিত্র মাটিতে বসে বসে পেছন ঘষে ঘষে চলছে এবং প্রথম সংলাপ বলে উঠেছে 'গুপে ও গুপে আজ আবার দেখিচি।' সংলাপ বলা মাত্রই মা এবং আশেপাশের দর্শক কানাঘুসো বলে উঠলো ওইতো ওইতো ঐ দ্যাখ ওটাই মনোজ মিত্র রে মনাই। এই যে প্রথমবার স্যার মনোজ মিত্রের সংলাপ বলার ধরণ আমার পাতিলেবুসম কচি মাথায় গেঁথে গেছিলো সেদিন যা প্রতি মুহুর্তে থিয়েটারে

এগিয়ে যেতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অতীতে এবং উদ্বুদ্ধ করে আজও। এতো গেলো প্রথম দিন মনোজ মিত্র দর্শন এবং বাংলা থিয়েটারের প্রতি আমার টান জন্মানোর বৃত্তান্ত। কিন্তু এবারে যেটা বললে পাঠক আমাকে চরম মিথ্যেবাদী ভাববে সেটাই আমি এখন বলবো অকপটে। তা হোলো সুন্দরম প্রযোজিত প্রতিটি নাট্য প্রযোজনা আমি দেখেছি কমপক্ষে পনেরো বার করে এবং 'সাজানো বাগান' দেখেছি প্রায় ৫০ টা শো এবং পরবাস দেখেছি ৪০ থেকে ৪৫ বার। উত্তর কলকাতায় থাকার সুবাদে একদম ছোট থেকেই ২৫শে ডিসেম্বর আসা মানেই কপিলাশ্রমের ফ্রুটস কেক কিনে এনে খাওয়া, শনিবার আসা মানেই ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি দর্শন করতে যাওয়া, কালীপুজো আসা মানেই পাড়ার পুজোয় সারা রাত জেগে থাকা, সরস্বতী পুজো আসা মানেই বাবা এবং সেজ জ্যেঠুর সঙ্গে কুমারটুলি ঘুরে ঘুরে ঠাকুর কিনতে যাওয়া এগুলো যেমন একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছিলো ঠিক তেমনই পাড়ার প্যান্ডেল, ছাদ বা মঞ্চ যেখানেই নাটক হোক না কেন মনোজ মিত্রের নাটক নির্বাচন করাটাও একটা অভ্যেস হয়ে গেছিলো আমার। যে অভ্যেস আজও অটুট। এবারে বলবো স্যার মনোজ মিত্রের সঙ্গে আমার কাটানো কিছু মজার আর কিছু সুখানুভূতিপূর্ণ স্মৃতির কথা।

২০২০-র করোনা শুরু হওয়ার কয়েকমাস আগেই স্যার মনোজ মিত্রের বাড়ি গেছিলাম অভিনেতা নির্দেশক সমীর বিশ্বাসের সঙ্গে। সেদিন গিয়ে স্যারের দোতলার ঘরে স্যারের সাথে গল্প করতে করতে শুনেছিলাম স্যারের হাঁটুতে খুব ব্যাথা হয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে। যাইহোক সেটা শুনে এসেছিলাম যেহেতু এবং তা আমার স্মরণে ছিলো বলেই করোনা শুরু হওয়ার সাত কী আট মাসের মাথায় স্যার মনোজ মিত্রকে একদিন সন্ধ্যের দিকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'স্যার এখন কেমন আছেন আর আপনার হাঁটুর ব্যথাটা এখন কেমন আছে?' আমার এই প্রশ্ন শুনে ফোনের ওপ্রান্ত থেকে স্যার বললেন 'এখন হাঁটুর ব্যথাটা একদমই নেই গো রজত। ভালো আছি এখন'। আমি বললাম 'বাঃ স্যার, তাহলে তো ওষুধে কাজ হয়েছে।' তখন স্যার ফোনের ওপার থেকে বলে উঠলেন 'ওষুধে কতটা কাজ হয়েছে বুঝতে পারছিনা তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি আমার হাঁটুর ব্যথা চলে গিয়েই দেশে করোনা এসেছে'। এটা শোনার পর ফোনের এপ্রান্ত থেকে আমি হাসতে হাসতে কথা একরকম প্রায় ঘুরিয়ে দেওয়ার অছিলায় স্যারকে বললাম 'আচ্ছা স্যার আপনি কিন্তু একটু থোড়টা বেশি খাবেন। তাতে হাঁটুর পেন কিছুটা কমবে।' তখন স্যার বললেন 'তুমি যখন বলছো রজত আমি নিশ্চই বেশি করে থোড় খাবো।' এই হোলো স্যারের হিউমার নিয়ে একটি সুখস্মৃতি। এবারে বলবো স্যারের আশীর্বাদ আমার ওপর কতটা বর্তেছিলো সেই কথা। স্যার মনোজ মিত্র যখন প্রথম প্রথম মুঠোফোনে হোয়াটসআপ ব্যবহার করা শুরু করেছেন তখন আমি প্রতি বছরই স্যারকে নিয়ে জন্মদিনে আমার লেখা স্যারের হোয়াটসআপে পাঠাতে শুরু করেছিলাম। একবার স্যার আমাকে হোয়াটসআপে সকালের দিকে হঠাৎ লিখলেন 'তোমাকে আমি পুরোটা চিনবো না রজত, তবেইতো তোমাকে নিয়ে আমার কৌতূহলও ফুরাবে না। আমি খুঁজেই বেড়াবো তোমাকে। যে মানুষ

এত ভালোবাসে।' সেদিন সকালে স্যার মনোজ মিত্রের পাঠানো এই টেক্সট এর সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন শট নিয়ে রেখেছিলাম যা এখনও রেখে দিয়েছি ফোনে ও মনে। কারণ এই স্ক্রিনশট যতবার দেখি ততবার মনে হয় আমার সবটা পাওয়া হয়ে গেছে এ জীবনে। একবার ২২শে ডিসেম্বর স্যার নিজেই আমাকে ফোন করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'রজত আমি আমার ভাই অমরের কাছে শুনলাম তুমি আমার জন্মদিনে খুব ভালো একটা লেখা লিখেছো। এটা শোনার পরে তোমার লেখাটা পড়েও ফেললাম অমরের কাছ থেকে। আমার সম্পর্কে এতকিছু তো আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম রজত। তুমি আবার মনে করালে। একদিন বাড়িতে এসো রজত। আচ্ছা তুমি তো স্কুলে চাকরি করো ? অনেক কাজ থাকে তোমার। একদিন স্কুল ছুটি দেখে চলে এসো রজত। অনেক গল্প করবো তোমার সাথে'।

এমন করে গুটিকয়েক মানুষ আমাকে ডাকতো বা আজও ডাকে অন্তর থেকে রজত নাম উচ্চারণ করে। এটুকু জানি এ ছোট্ট জীবনে যেসব মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার বয়সী প্রায় কোনো ছেলেমেয়েই হয়তো পায়নি। এ আমার প্রাপ্তি শুধু নয় এ আমার মোট আয়ুর কিছুটা অংশও বটে। এবারে আবারও একবার বলি স্যার মনোজ মিত্রের সঙ্গে আর একটি সুখকর মুহূর্তের কথা। একবার প্রতিকৃতি নাট্য দলের একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য স্যার মনোজ মিত্র একাডেমিতে এসেছিলেন নিজের গাড়িতে চেপে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম একাডেমি প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যেখানে এসে স্যারের গাড়ি থামবে ঠিক তেমন একটা জায়গায়। যথারীতি স্যারের গাড়ি এসে থামলো আমার ঠিক সামনে। স্যার গাড়ি থেকে নামলেন এবং নিজেই বললেন 'এই তো আমার লাঠি রজত দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার চিন্তা নেই। চলো রজত তোমার হাত ধরেই ঐদিকটা থেকে একবার ঘুরে আসি।' এরপর আর একটি ঘটনার কথা বলে আমার আজকের লেখা শেষ করবো। আজ থেকে কয়েক বছর আগে গড়িয়াহাটে সুন্দরমের রিহার্সাল রুম ভাঙচুর নিয়ে যখন বাংলা থিয়েটার তোলপাড় এবং স্যার মনোজ মিত্রকে নিয়ে চলছে তুলোধোনা তখন তার প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটা লেখা লিখেছিলাম স্যারের সমর্থনে। আর সেই লেখা স্যার মনোজ মিত্রকে পড়ে শুনিয়েছিলো সুন্দরম দলেরই সুব্রতদা, প্রিয়দা, কালুদা এবং আরও অনেকে। আমার সেই লেখা শোনার পর মনোজ মিত্র স্যার নিজে আমাকে ফোন করেছিলেন এবং একটা কথাই বলেছিলেন 'রজত একদিন এসো'। আমি বলেছিলাম 'নিশ্চই যাব স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না আর ভালো থাকবেন।' স্যার তখন বলেছিলেন 'তুমি একবার এসো রজত, তুমি এলে আমার ভালো লাগবে।' আমার মতো একটা ছোট জীবনকে প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রয়াত মনোজ মিত্রের মতো বড় জীবনেরা যা যা দিয়ে গেলেন এবং জীবন্ত কিংবদন্তী বিভাস চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়ী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মাইতির মতো বড় জীবনেরা রোজ আমায় যা যা দিয়ে চলেছেন শুধু সেটুকু নিয়েই তো আমার বাঁচা............

মন ও মননে :

অ ম র মি ত্র
সাজানো বাগান শুকোবে না

অগ্রজ মনোজ মিত্র ৮৬ পেরিয়ে ৮৭-র দিকে চলমান ছিলেন। ৮৭-তে পৌছনো হল না। গত ১২ নভেম্বর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। আমার আপনার সেই বাঞ্ছারাম আর নেই।

'সাজানো বাগান' নাটকের বাঞ্ছা কাপালি। সেই ১৯৫৯-এর 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের বৃদ্ধ বঙ্কিম (তখন তিনি ২১ বছর) এত বছর ধরে একটু একটু করে প্রকৃত বয়সে পৌঁছে চলে গেলেন। জীবনের সত্য আর মঞ্চের মায়াজাল মিলে মিশে গেল। বাঞ্ছারাম বৃদ্ধ হয়েছিলেন কিনা জানি না, দশ বছর আগে ২০১৪-র ষোলই আগস্ট, তখন তিনি ৭৫ পার, একাডেমি মঞ্চে 'সাজানো বাগান' নাটক হলো, বাঞ্ছারাম আবার মঞ্চে এল, বুড়ো বাঞ্ছা ধীরে ধীরে সিধে হয়ে উঠেও দাঁড়াল। তখন নাটকটির বয়স ৩৭। ১৯৭৭-এ যে নাটকের শুরু, সেই বাঞ্ছারাম আবার মঞ্চে স্বমহিমায়। তারপরও জীবনের মঞ্চে একই মহিমায়।

২১-বছর বয়সে বঙ্কিম, ৩৭-এ গজমাধব (পরবাস) ৩৯-এ বাঞ্ছারাম (সাজানো বাগান) এই তিন বৃদ্ধ আমাদের মঞ্চে মিথ হয়ে গেছে অনেকটা। এখানে তিনিই অভিনেতা। তিনিই নাটককার। আবার ১৯৭২-র নাটক 'চাকভাঙা মধু' (প্রযোজনা ঃ থিয়েটার ওয়ার্কশপ)-র জটা, মাতলা বা আরো পরের নাটক 'রাজদর্শন' (প্রযোজনা ঃ বহুরূপী) বা অন্য অনেক নাটকে বৃদ্ধ এক চরিত্র নিয়েই নাটক হয়ে ওঠে জীবনের ও বেঁচে থাকার এক অনুপম ভাষ্য। মনোজ মিত্রের নাটকে বৃদ্ধ হলেন বহুদর্শী। জীবনকে দেখেছেন তিনি বহু বছর ধরে। সেই দেখাই যেন তাঁর নাটকের দর্শন। এক জীবনে মানুষের যত বয়স বেড়েছে, বার্ধক্যের দিকে মানুষ যত এগিয়েছে, ত্রিকালদর্শী সেই চরিত্র হয়ে উঠেছে বার্ধক্যের কারণেই অনেকটা নিরূপায়। এই নিরূপায়তার গল্পই বলেছেন তিনি তাঁর নাটকে। 'মৃত্যুর চোখে জল'-এর বঙ্কিম বা 'পরবাস' নাটকের গজমাধবকে মনে তো পড়বে। গজমাধব আমাদের নাট্য সাহিত্যে এক অদৃষ্ট-পূর্ব চরিত্র। কিন্তু যে বঙ্কিম একান্ত নিরূপায়, নিজের ওষুধের শিশি বোতল নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে চায় যে, সেই বৃদ্ধই 'চাকভাঙা মধু'তে এসে (জটা) বেঁচে থাকাকে একটু সহনীয় করে তুলতে নানা কৃতকৌশল অবলম্বন করে। শোধ নিতে চায় অঘোর ঘোষের মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে। জোতদার অঘোর ঘোষ এসেছিল সাপের কামড় খেয়ে সেই তল্লাটের বড় সাপের ওঝা মাতলার কুটিরে। নিয়ে এসেছিল তার পুত্র। মাতলার বুড়ো কাকা জটা শোধ নিতে চায়। অঘোর তাদের সব নিয়েছে। এবার যেন ফেরত নেবে। আসলে শ্রেণী চরিত্রের তফাতে জটা আর বঙ্কিম আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা তাদের একই রকম। 'চাকভাঙা মধু' এখন ইতিহাস। বাংলা মঞ্চ অমন প্রযোজনা

আগে দ্যাখেনি। অমন নাটকও নয়। আমাদের নাটকের ছকটাই ভেঙে গিয়েছিল 'চাকভাঙা মধু'তে। জটা, মাতলা আর মাতলার গর্ভবতী মেয়ে বাদামী, এই তিনজনের শেষ দুজন চায় অঘোর বাঁচুক। জটা, তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল আহত বিষধরকে বাঁচিয়ে রাখা মানে নিজেদের মরণ ডেকে আনা। এই দ্বন্দ্ব, বাঁচাব না মারব— নিয়েই নাটক। থিয়েটার ওয়ার্কশপের সেই প্রযোজনা (নির্দেশনা ঃ বিভাস চক্রবর্তী), আর বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মানিক রায় চৌধুরী ও মায়া ঘোষের অভিনয় এখনো আমার স্মৃতিতে অমলিন। বৃদ্ধ বঙ্কিম বাঁচত শিশি বোতল নিয়ে, জটার বাঁচা আর মরা যখন একাকার তখন সে শোধ নিয়ে বাঁচতে চায়। সে হল সুন্দরবনের হতভাগ্য ভূমিহীন, না খেতে পেয়ে চারপেয়ে হয়ে যাওয়া মানুষ। ফলে সে আর বঙ্কিম তো আলাদা হবেই। এরপর ১৯৭৫-এর নাটক 'পরবাস', সেখানে উচ্ছেদ হওয়া ভাড়াটে গজমাধব নানা কৃত-কৌশলে থেকে যেতে চায় তার বহুকালের পুরোন আশ্রয়ে। এ নাটক তাই হয়ে ওঠে অসামান্য ব্যঞ্জনাময়। মনোজ মিত্রর অভিনয় ভোলা যায় না। এরপর গজমাধবই যেন বাঞ্ছারাম হয়ে ওঠে 'সাজানো বাগান' নাটকে। তার আগে বা পিছে লেখা 'কেনারাম বেচারাম' হয়ে 'সাজানো বাগান'। সাজানো বাগানের পর 'রাজদর্শন', 'কিনু কাহারের থেটার'...কত নাটক। বেঁচে থাকার কৌশল আর অদম্য স্পৃহাই হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত নাটকের মূলমন্ত্র। বেঁচে থাকার কথাই নানা ভাবে ঘুরে আসে। আর সেই বেঁচে থাকা এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধের। তার বেঁচে থাকা শেষ অবধি যেন মানব সভ্যতার বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে। 'সাজানো বাগান' যেন সেই কথাই বলেছে শেষ পর্যন্ত। বৃদ্ধের বেঁচে থাকা আর একটি শিশুর জন্ম সমার্থক হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্রর নাটকে মানুষের আশ্রয়হীন হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ঘুরে ঘুরে এসেছে। রূপক হয়ে এসেছে। আজ সমস্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ভিটে মাটি ছেড়ে দেশান্তর যাত্রাই যেন মানুষের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশান্তর যাত্রার ভয়ে মানুষ আত্মহত্যাও করছে। এই কথাই তিনি সারাজীবন বলতে চেয়েছেন গজমাধব, কেনারাম, বাঞ্ছারামের চরিত্রের ভিতর দিয়ে।

১৯৭৭-এ যে নাটকের প্রথম অভিনয়, এখন সেই নাটক অভি চক্রবতীর নাট্যমুখ অভিনয় করতে চলেছে আবার। অভির জন্ম কোন সালে আমি জানি না, মনে হয় এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের সময় অভি জন্মায়নি। পরে তা অভি নিশ্চিত করেছে। অভি যখন জন্মায়, তখন এই নাটক রীতিমত জনপ্রিয়। ছবিও করেছেন তপন সিংহ। সেই ছবিও জনপ্রিয়। ১৯৭৭-এর নাটক ২০২৪-এ হচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এর বয়স। হতে আর কতদিন, ২০২৪-শেষ হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছর একটি নাটকের বেঁচে থাকা কম কথা নয়। একই জনপ্রিয়তা তার। আমার বিশ্বাস 'সাজানো বাগান' নাটক এবং তার প্রধান চরিত্র বাঞ্ছা কাপালি বহু পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকবে। এই নাটকের ভিতরে চিরায়ত হয়ে যাওয়ার গুণটি নিহিত আছে। একা মানুষ ব্যক্তি মানুষ কীভাবে লড়তে পারে অসীম শক্তিধরের

সঙ্গে তা নিয়েই যেন এই নাটক। মনে করুন এক অসীম শক্তিধরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে দুর্বল মানুষ। সে কীভাবে বেঁচে থেকে হারিয়ে দেবে মস্ত মানুষটিকে, তাই-ই যেন নাটকের দর্শন।

মনোজ মিত্রের নাটক সাহিত্য পাঠের স্বাদ দেয়। তাঁর সংলাপে যেমন বহুমাত্রিকতা, যেমন নাট্যগুণ তেমনি সাহিত্যের গুণ। রসবোধ অসামান্য। কাহিনির গভীরতা, নাট্য কাহিনীতে জীবনের অতল তল ছুঁয়ে যাওয়া, এসব আমাদের নাট্য সাহিত্যকে দিয়েছে এক বিরল মাত্রা। মঞ্চ ব্যতীত নাটক পাঠ তো উঠে গিয়েছিল। তা ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। সহজ কথা সহজ ভাবে বলা সহজ নয়। তিনি সেই সহজ কথাই সহজ ভাবে বলেছেন।

বঙ্কিম, জটা, গজমাধব সকলেই নিজেকে বাঁচাতে নানা উপায় অবলম্বন করেছিল। 'সাজানো বাগান' নাটকে এসে সেই বৃদ্ধ যেন শিখে গেছে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, নিজের জমি বাঁচাতে হবে ভূমধ্যাকারীর আগ্রাসন থেকে। নাটক দেখে মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চল থেকে এক বৃদ্ধা এসেছিলেন মিষ্টান্ন নিয়ে। বুড়োকে তাঁর নিজের ঠাকুরদা বলে মনে হয়েছিল। একজন আমাকে বলেছিলেন, আসলে অমন এক বুড়ো বাঞ্ছা ক্যানি-এর দিকে এক গ্রামে থাকে। সে সত্যিকারের বাঞ্ছাকে দেখেছে। বাঞ্ছারাম যেন কিংবদন্তীর এক মানুষ। সে কিছুতেই মরবে না। এমন বেঁচে থাকার স্পৃহা আগে দেখিনি যেন। বেঁচে থাকায় কত আনন্দ। কত সুখ। কিন্তু তার জন্য কৌশল করতে হয়। বিপক্ষ যেন কামান বন্দুক বোমা নিয়ে হাজির। এই যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীতে বাঞ্ছারামই টিকে থাকবে। থাকতে পারবে। তারপর পৃথিবীকে ফুলে ফলে সাজানো বাগান করে তুলবে। এখন এই নাটক করার সার্থকতা এই। মনোজ মিত্র বেঁচে আছেন। থাকবেন। তিনিই বাঞ্ছারাম। তাঁর সাজানো বাগান শুকোবে না।

দে বা শি স ম জু ম দা র
মনোজ মিত্র : পাঁচ

শিল্পী-মাত্রেই চেষ্টা করেন তাঁর দেশ-কালের ঐতিহ্যের আবর্তে নিজের কর্ম-কাণ্ডকে সংগঠিত করতে। সচেতনভাবে তাকে কেউ উপেক্ষা করতে চাইলেও, সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না। কারণ শিল্পীর যাপন থেকে সৃজন-নির্মাণের ধারাবাহিকতায় সম্পৃক্ত থাকে ইতিহাস—যার শৈল্পিক প্রকাশ সঞ্জীবিত হয় ঐতিহ্যে। আমেরিকা-আফ্রিকার বর্ষিয়ান নাটককার সুজান-লেরি পার্কস, মনে করেন, নাটক একটি ঘটনার ব্লুপ্রিন্ট। ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়, সৃজিত হয় সাহিত্যের মাধমে তথা পরিসরে। এই—ইতিহাসে সংযুক্ত থাকে মহাকাব্য-পুরাণসাহিত্য। আমাদের ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যিক নাটককার তার সময়কালের ধারাবাহিকতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন। এক একটি ঘটনাকে নাটককার তাঁর সময়কালের ধারবাহিতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে, উপনিবেশিক বাংলায়—যখন শিল্প-সাহিত্য নতুনভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে, তখন সাহিত্য, বিশেষত নাটক ধ্রুপদি মহাকাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র সকলেই। মধুসুদন অগ্রপথিক—মহাকাব্যের খণ্ডাংশ বিনির্মাণের কথা ভেবেছেন, লিখেছেন। বাকি সকলেই পুনর্লিখন তথা চিত্রণে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভায় যে স্বাধীনতা নিয়েছেন, 'কাল মৃগয়া'য় অনেকটাই অনুগত থেকেছেন মূলভাষ্যে। রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত—বিনির্মাণে ভাবনাকে নিয়ে যেন, জীবনের প্রান্তিক পর্বের নাট্য লিখলেন—'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা, চণ্ডালিনী, শাপমোচন নির্মাণে। পরবর্তী পর্বে নাটকে ধ্রুপদি-মহাকাব্য আশ্রয়ে নাটক বহু রচিত হলেও, সাবেক ঘটনার নবদর্শনে নির্মাণের ইতিহাস প্রায় নেই।

বাংলা থিয়েটারে গতশতকের মধ্যভাগ থেকে যখন 'আধুনিক কাল'পর্ব শুরু হলো, সেই প্রাক-পর্বে—আমরা পাঁচজন নাটককারকে বিশেষ বিষয় আর সৌকর্যে পেলাম। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধায় আর মনোজ মিত্র। প্রথম চার ব্যক্তি তাঁদের সৃজন-পরিসরে ধ্রূপদি সাহিত্য বা মহাকাব্য নির্ভর নাটক রচনার কথা ভাবেননি বলা চলে। ব্যতিক্রম মনোজ মিত্র। এখনই তার কারণ বিশ্লেষণ অথবা তুল্যমূল্য কোনো আলোচনার প্রয়োজন একেবারেই নেই। পাঁচজনেই তাঁদের চলনে-সৃজনে বাংলা থিয়েটারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা শুধু দ্যাখবার চেষ্টা করবো মনোজ মিত্র কেমন কোরে ধ্রুপদি-মহাকাব্যের সঙ্গে তাঁর শৈল্পিক বোধের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন!

মনোজ মিত্র প্রথম নাটক লেখেন ১৯৫৮ সালে। 'মৃত্যুর চোখে জল', প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৯ সালে। তারপরেই গল্পকার মনোজ মিত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর গল্প নয়, এবার শুধু নাটকই লিখবেন। কলকাতা ত্যাগ করে ১৯৬১ সালে দর্শনের অধ্যাপকের দায়িত্বে চলে যেতে হয় রানিগঞ্জ কলেজে। ইতিমধে আরও চারটি নাটক লেখা হয়ে গেছে। অভিনেতা

হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৩ সালে রানিগঞ্জে থাকাকালীন সপ্তম নাটকটি লিখলেন 'অশ্বত্থামা'। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একেবারে শেষলগ্নের কাহিনী। রক্তক্ষয়ী সেই সংগ্রামের অষ্টাদশতম রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে নাটকের আরম্ভ। ১৯৬৩ সালে 'অশ্বত্থামা' লিখন ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন নাটককার:

> "অশ্বত্থামা নাটকটা লিখি ১৯৬৩-তে, রানিগঞ্জে কলেজে যখন পড়াচ্ছি। কলেজের অধ্যাপকরা সে সময় অভিনয়ও করেছিলেন নাটকটা। সাত বছর পর '৭০-'৭১ সালে নাটকটা আমি পাল্টে লিখি।"

এই প্রথম মনোজ মিত্র ধ্রুপদি সাহিত্যের নির্ভরতায় নাটক লিখলেন। প্রায় একযুগপর যখন নাটকটি পুনর্লিখিত হয় (বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশ: ১৯৭৮— সে বিষয় আমরা পরে প্রসঙ্গ বিস্তারে যাব।) তার আগে আমরা দুটি প্রেক্ষিত লক্ষ করি—প্রথমত এই সময়, ১৯৬৩ সাল, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে, উত্তাল। বাংলা বিকল্প অন্য তথা গ্রুপ থিয়েটারের প্রাঙ্গন ক্রমশ দখল নিচ্ছে বাম রাজনৈতিক মতাদর্শ। গণনাট্য পর্বে যে সামাজিক-রাজনৈতিক কথাধারার প্রয়োগগত সাফল্য দ্যাখা গিয়েছিল, এই পর্বে-ষাটের দশকে—আরও বিশেষ রাজনৈতিক ইশত্‌াহারের আনুগত্যে তীব্র হতে শুরু করে। উৎপল দত্ত এই কালপর্বকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। মোহিত চট্টোপায়-বাদল সরকার নাটক রচনার শিল্পপথে 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর সহযোগী হয়ে উঠতে শুরু করবে দুজনেই, কিন্তু রাজনৈতিক মননে নাটক লেখবার কথা ভাবেননি। বরং সেই সময় বিদেশী সাহিত্যের—নাটকের সে-বাস্তব-উত্তর পথে জীবন পরিচয়ের একটি ভিন্ন বোধের উন্মেষ ঘটে—দু-জনে ছিলেন তারই অনুসারী। মনোজ মিত্র ছিলেন সম্পূর্ণ দূরবর্তী-ভূখণ্ডের প্রতিবেশী, প্রায় প্রথম থেকেই তিনি 'পরিচিত পরিমণ্ডল-এর উপেক্ষিত খণ্ডাংশ নির্ভর নাটক লিখতে চাইছেন। ১৯৬৩ সালে অশ্বত্থামা লিখলেন, লিখলেন কোনো বিনির্মাণের পরিকল্পনায় নয়; লিখলেন জীবনচর্যায় সত্য অন্বেষণের দর্শনচেতনায়। নাটকটির বিষয় ব্যাখায় জানাছেন:

"আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে সমন্ত্যপঞ্চকের হ্রদের কূলে একা মৃত অপেক্ষায় ভগ্নোরু করুরাজ দুর্যোধন—দিবাবসানে দুর্যোধনের সাক্ষাতে এলো করুপক্ষের অবশিষ্ট তিন যোদ্ধা—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা—হতাশ, পর্যুদস্ত, তিন বীর দুর্যোধনকে ঘিরে—বসে বিপুল পরাজয়ের শৈত্য পোহাছে—তাদের গভীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঊষর সমন্ত্যপঞ্চক অঞ্চলে বাতাস ক্রমশ ভারী এবং উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।... তখন নাটকে ছিল দুজন দুর্যোধন। একজন রণোন্মাদ, আর একজন ক্লান্ত, বিমর্ষ, যুদ্ধের ভরা পরিণতিতে শোকাকূল। দ্বৈতসত্তায় দুর্যোধনই' ছিল নাটকের কেন্দ্র চরিত্র।"

তারপর নাটককার পরবর্তীতে পুনর্লিখনের বদল-রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে বোঝবার আগে আমরা বুঝতে পারি, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ এই পাঁচ বছরে মনোজ মিত্র

তাঁর জীবনে এই নাট্যের-পথে সত্য-সন্ধানের চলনই একমাত্র উপায়ের মর্যাদায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাঁচবছর সময়কালে যে পাঁচটি লিখছেন— পাখি (১৯৬০), মোরগের ডাক (১৯৬০), নীলকণ্ঠের বিষ (১৯৬০), মহাত্মা (১৯৬২) আর অবসন্ন প্রজাপতি (১৯৬৩)। তাঁর রচনা বিস্তারে তখনও নিজস্ব স্বাতন্ত্রিক শিল্প প্রতীক নির্মাণ করে উঠতে পারেননি। সন্ধানী মনোজ মিত্র 'আধুনিক থিয়েটার' মঞ্চের শৈল্পিক বৈভবে দূরন্ত বিশ্বাসে টেনে আনছেন নিজস্ব ঐতিহ্যের ধ্রুপদি মহাকাব্যের গল্পাংশ। মহাকাব্য নির্ভর রচনার দুটি উদাহরণ তখন খুব স্পস্ট। একটি ধারা, মহাকাব্যের গল্পাংশের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে, সমকালিনতার অলঙ্কারে তার সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা। গিরিশচন্দ্র ছিলেন এই পথের প্রধান সফল কাণ্ডারী। তাকেই অনুসরণ করা হয়েছে পরবর্তী শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথের কাণ্ডারী মাইকেল মধুসুদন আর রবীন্দ্রনাথ—এই দুই পথকেই পরিহার করতে চেয়েছেন মনোজ মিত্র। বিনির্মাণের কোনো ঝুঁকি তিনি নিজে চাননি, অথবা ঐতিহ্যের বিনির্মাণকে হয়তো গ্রাহ্য করতেই চাননি, তাঁর সৃষ্ট শিল্পভূমিতে। পরবর্তী পর্বে যখন 'অশ্বত্থামা' নাটকটি পুনর্লিখিত হবে—তার পরিবর্তন-সৌকার্যে—যতটা মগ্ন থাকবেন নাটককার, বিষয়ের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই অনুগত মূলের প্রতিক্ষায়। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে যে দুজন দুর্যোধনের উপস্থিতি থাকে—তা প্রধানত মনন দর্শনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। বিকল্প বিন্যাসের পথ ধরে নয়। প্রসঙ্গত পাঠকের মনে পড়ছে 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮) নাটকটির প্রসঙ্গ। নাটকটি অনেক বেশি কৌতুক আশ্রিত। নাটকটির একেবারে উপান্তে এসে সীতা যে প্রতিবাদটুকু করতে চায় —তা তাঁর সৃষ্টিকর্তা বাল্মীকি পাতাল প্রবেশ ভাবনায় অনেকটাই করে রেখেছেন। তাছাড়া এই নাটকটি যখন লেখা হয়, তখন সাধারণ পাঠকের হাতেই একাধিক গঠনের রামায়ণের আখ্যান পৌঁছে গেছে—ভারতেই শুরু হয়ে গেছে পুনর্নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের প্রচেষ্টা। মনোজ মিত্র অনেক বেশি ব্যতিক্রমী।—'যা নেই ভারতে' (২০০৫) নাটক নির্মাণে। সে-প্রসঙ্গ আমরা আরও কিছু পরে আসবো!

'অশ্বত্থামা' প্রথম পাণ্ডুলিপি রচনার পর, প্রায় দশবছরের অধিক ব্যবধানে যখন নাটকটি সংশোধিত হচ্ছে তার মধ্যে মৌলিক কতগুলি পরিবর্তন ঘটেছে, নাটককার মনোজ মিত্র-র রচনা-যাপনে, আর বাংলা থিয়েটারে। মনোজ মিত্র ইত্যবসরে চব্বিশটির বেশি নাটক লিখেছেন। যার মধ্যে আছে 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৭), 'চাকভাঙা মধু' (১৯৬১), 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০), 'পরবাস' (১৯৭০), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪), আর 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬)। মনোজ মিত্র অর্জন করেছেন আপন বাক্‌ধারায় 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'। স্বীকৃতি এসেছে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল সহ সাধারণ্যের জনপ্রিয়তায়। বাংলা থিয়েটারে তখন মনোজ মিত্র একজন অগ্রবর্তী নির্ণায়ক। নাটকের আখ্যান নির্বাচনে আত্ম-অভিজ্ঞতার শৈল্পিক পুনর্নির্মাণ, যার শরীরে আপত সরলতার সামাজিক মানবিক দ্বন্দ্ব। সংলাপে বৌদ্ধকোজ্জ্বলতার অফুরান আলো। এরই মধ্যে মনোজ মিত্র 'অশ্বত্থামা' ফিরে লেখার সময়—নিজেকে প্রথিত

করেন ধ্রুপদি-কাব্যের বাতাবরণে। গিরিশ-ক্ষীরোদ প্রসাদ মহাকাব্যিক সৌকর্য নির্মাণের প্রয়োজনে ছন্দ-সংলাপ রচনাকেই বারবার গ্রহণ করেছেন। মনোজ মিত্র এই নাটকে, অশ্বত্থামার জন্য ব্যবহার করতে চাইলেন সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন সংলাপ—ভাষা। ছন্দকে বর্জন করলেন। কাব্যকে সম্পৃক্ত করলেন আবহাওয়ার ধ্রুপদি-উষ্ণতাকে তৈরি করবার জন্য।

> "অশ্বত্থামা : যুদ্ধ... মানে ঘনযোর যুদ্ধ! (বড় বড় নিংশ্বাস ফেলতে ফেলতে) উড্ডীন খড়্গ! দেখেছে আজ শত্রুসেনা! কৃতবর্মা, আজও সহস্র পাণ্ডবসেনা.. আর আমি...আমি... একা! আঘাতে আঘাতে ছত্রখান করে দিচ্ছি! ওরা ছুটছে...পালাচ্ছে...মৃতুর ভয়ে কলরব করছে! তুমুল কলরব! পাখির কুলায়ে শিকারী বাজের হানা দেখেছেন কৃতবর্মা! বাঁচাও...বাঁচাও...রক্ষা করো! একে একে একেকটি কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিচ্ছি! সংহার...সংহার...দেব না বাঁচতে! (খড়্গটা জড়িয়ে গরগর হাসতে হাসতে—সহসা থেমে) এমন সময় আপনার দূত কৃতবর্মা...সর্বনাশের খবর বয়ে নিয়ে..."

পাঠক পাশাপাশি 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার' কিংবা 'সাজানো বাগান'-এর নিম্নসমাজ—কল্পসমাজের (নকশা গড়নে) সংলাপ পাঠে তুলনা করলে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন মনোজ মিত্র-র লিখন-শৈলী কতটা বিস্তৃত করেছিলেন আখ্যান প্রেক্ষিতে।

১৯৬৩-তে 'অশ্বত্থামা' রচনা, প্রথম ধ্রপদি সাহিত্যাঙ্গনের সঙ্গে সম্পর্কস্থান, এবং পরবর্তী ২৪ বছর, অর্থাৎ 'অশ্বত্থামা' ফিরে লেখা কালপর্বে, আরও কয়েকটি নাটক-বিষয় সংগৃহীত হয়েছে মহাকাব্য থেকে। 'তক্ষক' ছোটো নাটকটি রচিত হয় ১৯৬৭ সালে। পুনর্লিখন হয় ১৯৮১ তে। বিষয় : মহাভারত এর খণ্ডচিত্র। অর্জুন পৌত্র তথা অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ মৃগয়ার সময় বনের মধ্যে পথ হারিয়ে পিপাসা কাতর। ধ্যনস্থ শমীক মুনির কাছে জল ভিক্ষা করেও না পেয়ে মৌনব্রতধারী শমীক মুণির গলদেশে মৃতসর্প অর্পণ করলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নাটকেও ব্যবহৃত হয় ভিন্নবাঁধনের সংলাপ।

মহাকাব্যের কাছে নাটককার মনোজ মিত্র ফিরে গিয়েছেন দীর্ঘসময় পার করে-২০০৫ সালে 'যা নেই ভারতে' রচনায়। বয়স তখন ৬৭ বছর। সৃজিত নাটকের সংখ্যা স্পর্শ করেছে ৮০তে। পাঠক হিসেবে এই নিবন্ধ লেখকের কাছে 'যা নেই ভারতে' নাকটি মনোজ মিত্র-র শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। মহাভারতের খণ্ডিত কাব্যাংশ এখানে বর্ণিত হয়েছে সপরিচয়ের পরিসরে। একদিকে যেমন গবেষণা লব্ধ প্রত্যাশার ঐশ্বর্যে আখ্যান ছড়িয়েছে অচেনা-অজানা প্রান্তে, সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে টুকরো টুকরো ঘটনার প্রখর বাস্তবতায় শৈল্পিক বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা, থিয়েটারের ভাষা অবলম্বনে। কঞ্চুকী আর পাতকিনীর অসাধারণ ব্যবহার মহাভারত-সমাজচেতনার আধুনিক টীকাকরণ বলা যায়। নাটক শুরু হয় কঞ্চুকীর সংলাপে। আপাতভাবে কুঞ্চুকী-কে এ-নাটকের সূত্রধর বলে মনে হলেও দ্রুত আখ্যানে সংযোগী চরিত্র হয়ে যায়। নাটক শুরু হয় রূপকথার অনুকরণে:

"কুঞ্চুকী।। এক ছিল নাবালক রাজী... তার ছিল এক জোড়া রানি, আর জোড়া জোড়া সহচরী, বিলাসসঙ্গিনী। প্রণয় প্রমোদে নিংশ্বাস ফেলার ছিল না বালক রাজার। ফলস ফলে ফলতঃ...ব্যভিচারী বালকের প্রাণপ্রদীপের তেল ফুরালো অকালে, অকস্মাৎ বিগত!

'অশ্বথমা'-'তক্ষক' থেকে সরে এসেছেন সংলাপ বিন্যাসে—শব্দ নির্বাচন আর বাক্যছন্দের ব্যবহারে। ২০০৫ সালে এই নাটকটি রচনা কাল পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের একটি ছাড়া আর উল্লেখযোগ্যভাবে মহাকাব্য নির্ভর নাটক লেখা হয়নি। উৎপল দত্ত করেছেন গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (পি. এল. টি প্রযোজনা) আর গৌতম হালদার 'মেঘনাদ বধকাব্য' (নান্দীকার প্রযোজনা)। উপস্থাপন সৌকর্য নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছে। নাটকের রচনাশ্রমে সৃজনে ধ্রুপদি মহাকাব্যিক উদাহরণ নেই। একমাত্র 'নাথবতী অনাথবৎ'— শাঁওলী মিত্র রচিত - অভিনীত-নির্দেশিত (পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত) ব্যতিক্রমী উদাহরণ। শাঁওলী মহাভারতের একটি চরিত্র দ্রৌপদীর আবর্তে তাঁর নাট্যিক গ্রন্থন করেছেন। ইরাবতী কাণ্ডের বিশ্লেষণ এবং পাণ্ডবানীর উপস্থাপন সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছিল 'নাথবতী...'। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে নারীবাদি দর্শনের প্রেক্ষিতে মহাকাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি বিচারের চেষ্টা অবশ্যই 'নাথবতী...'-র সফলতার দিক্ মান সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'যা নেই ভারতে' নাটকে প্রচলিত ধারাকে অবলম্বন করলেও, নাটককার মনোজ মিত্র 'অশ্বথামা'র চলনকে এ নাটকে সম্পূর্ণভাবেই পরিহার করলেন। 'যা নেই ভারতে' মনোজ মিত্র-র নির্দেশনায়, তাঁর সংগঠন 'সুন্দরম' উপস্থাপন করে। কঞ্চুকীর চরিত্রে অভিনয় করেন নাটককার নিজে। চরিত্রায়নে ছিল মহাকাল আর বর্তমানতার সেতুবন্ধে এক বহুবর্ণিক উজ্জ্বলতা। অতি বিস্তার (মহাকাব্যের সাধারণ ধর্মে)-কে তিনি সংযত করেছেন সাধারণের কৌতূকে, নিহিত যন্ত্রণায়। সত্যের প্রথাগত উচ্চতাকে খর্ব করে প্রকাশ করেছেন দৈনন্দিন-জনলোকের ব্যবহারিক মুদ্রায়!

২০০৮ সালে লেখা হয় 'ভেলায় ভাসে সীতা'। দিব্য রামায়ণ আর আধ্যাত্ম রামায়ণ নির্ভর এই নাটকের আখ্যান নির্মাণ। এই নাটক-প্রসঙ্গ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

মনোজ মিত্র তাঁর প্রায় শতাধিক নাটক ভাণ্ডারে বিষয় বৈচিত্রের শতফুলের মালা গেঁথেছেন। মানুষ ভালোবেসেছেন তাঁকে বহু সৌরভের আনন্দে, বোধের-তৃপ্তিতে-প্রত্যাশার মেঘমালায়। বাংলা থিয়েটারে আধুনিকতার প্রাঙ্গণে—ধ্রুপদি মহাকাব্যের নতুন প্রতিমা নির্মাণের গর্বিত বিজয় শিরোপা বহু বহুদিন উজ্জ্বল থাকবে।

আ লো ক দে ব
আমাদের বাঞ্ছারাম

যতদূর মনে পড়ে দু' হাজার পাঁচের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে এক অভিনব ভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। উপলক্ষ্য ছিল, শেক্সপিয়রের রচনা করা নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রিয় চরিত্র যাচাই করা। ফলাফলে প্রকাশ নাট্যমোদীদের সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল হ্যামলেট। আজ যদি আমাদের প্রিয় নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটকের চরিত্রগুলিকে নিয়ে ওই ধরনের ভোট হয়, আমার আগাম ভোট থাকলো বাঞ্ছারামের পক্ষে। শুধু মনোজ মিত্র কেন—নতুন ধারার থিয়েটারের কাল থেকে এ-পর্যন্ত যে-সব স্মরণীয় চরিত্র উপহার দিয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট নাট্যকারেরা, সেখানে বাঞ্ছারামের জায়গা হবে প্রথম সারিতে। সম্ভবতঃ প্রথম।

বড়ো আশ্চর্য চরিত্র সাজানো বাগান-এর বুড়ো বাঞ্ছারাম। আজকের এই কালো সময়ে দাঁড়িয়ে যখন বাঞ্ছারামের দিকে ফিরে তাকাই মাথা ঝুঁকে-আসে। বাঞ্ছারাম এক পরম বিস্ময়। কী ধাতুতে গড়া মানুষটা তার তল পাওয়া ভার। আমাদের জল মাটিতে মানুষ, বিশ্বাস হয় না। জীবনকে নিয়ে এত কৌতুক, মজা করা, উপভোগ করা, খেলা-কী করে করে মানুষটা? জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে এমন অকুতোভয় মানুষ- কে- কোথায় দেখেছে? কোথায় পেয়েছে আমাদের থিয়েটার? গ্রাম্যমানুষ, নিরক্ষর চাষি—টিপ ছাপের বাইরে আর কোনো আঁক যে শেখেনি কখনো, তার জীবনে কী করে ধরা পড়ে কবির চরণ দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না আমি ভয় করব না ভয় করব না।

কোথা থেকে এল বাঞ্ছারাম? একি স্রষ্টার নিছক কল্পনা নাকি বাস্তব? কল্পনাই যদি তবে এত রক্তমাংসের মনে হয় কেন? এত জীবন্ত? আসলে মাটি থেকে চয়ন করেছেন স্রষ্টা। কী গুণ সে মাটির যে মাটি ছেনে বাঞ্ছারামের মূর্তি গড়েছেন স্রষ্টা? দেশের মাটি। যে মাটি বলে জীবনের সার্থকতা তার ফলনে। মাটি বলে বীজ বোনো। ফসল ফলাও। কেবল নিজের জন্যে না। ফল ভোগ করুক চারপাশের মানুষ। যে মানুষের মধ্যে তুমি বাস করো। যারা তোমার পড়শি। আজ হয়তো এই সুর আগের মতো তেমন বাজে না। হারিয়ে যাচ্ছে, তবু আছে। আছে বলেই আজও গ্রামের মানুষ, চাষি সমাজ মাটি ফেলে রাখতে পারে না। লোকসান অবশ্যম্ভাবী জেনেও ঋণ করে। ফসল ফলায়। সবুজে সবুজে ভরিয়ে তোলে মাঠ। বাঞ্ছারাম সেই দর্শনের, যৌথ জীবনবোধের প্রতিনিধি। তাই সে বাগান সাজায়। সাজিয়ে রাখতে চায় আগামী দিনের কথা ভেবে। যখন সে থাকবে না তখনও যেন বাগানটা থাকে। তাই বাঞ্ছা চুক্তি করে চুক্তিবদ্ধ হয় জোতদারের সঙ্গে। যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে চায় বাগানকে। আজকের রাতই হয়তো তার শেষ রাত। কাল ভোরের আলো আর দেখা হবে কিনা জানা নেই। তবু পিছন ফিরে তাকানো নেই। মাটিতে বসে ঘসে ঘসে চলা মানুষটা

এক সময় যখন উঠে সিধে হয়ে দাঁড়ায়, হকের দাবি নিয়ে মুখোমুখি হয়—সেই মানুষটার কাঙ্গালের ধন যে চুরি করে—'এতকা দিয়েছি। এবারে নেব। টাকাটা দেবেন কত্তা'।

লড়াইয়ের এই যে চলন, নাটকটি যতবার দেখি মন বলে উঠে—সাবাস সাবাস। যেখানে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠা নেই, লাঠিসোটা নিয়ে দলবেঁধে ধাওয়া করা, সব মিলিয়ে প্রতিবাদের প্রতিরোধের লড়াইয়ের এই যে ভাষা, ব্যাঞ্জনা, শৈল্পিক রূপ—আমাদের থিয়েটারে বিরল।

এবার স্রষ্টার বিষয়ে জন্য কিছু কথা 'আমাদের থিয়েটারে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকই নাটক লিখেছেন অনুবাদ বা রূপান্তর করেছেন দলের কথা ভেবে, দলের প্রয়োজনে। সেই ধারাই অনুসরণ করে এসেছেন পরবর্তীকালের দলের কর্ণধারকূল। যেভাবেই হোক দলের জন্য নাটক চাই। তার বাইরে অতিরিক্ত কোন তাগিদ অনুভব করেননি কেউ। করতে দেখা যায়নি কখনও। সেইখানেই মনোজদা, মনোজ মিত্র ব্যতিক্রম। তিনি কেবল নিজের দলের জন্য লেখেননি, লিখেছেন দশের কথা ভেবে। নাটকের জন্য নাটক।

লিখেছেন আর বিলিয়েছেন। যেমন 'চাকভাঙা মধু' দিয়েছেন থিয়েটার ওয়ার্কশপকে। পরিচালক ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, তাঁদের আরও দিয়েছেন - 'অশ্বত্থামা', 'নরক গুলজার'। বিভাসদা যখন অন্য থিয়েটার দল করলেন পেয়েছেন 'নাকছাবিটা', 'এক আত্মগোপন'। যখন অশোক মুখোপাধ্যায় থিয়েটার ওয়ার্কশপের পরিচালক—পেয়েছেন 'পালিয়ে বেড়াই', 'বৃষ্টির ছায়াছবি'। কুমার রায় নিজেদের ছাঁচ ভেঙে বেরুতে পেরেছেন—'রাজদর্শন' এবং 'কিনু কাহারের থেটার'। পেশাদার মঞ্চকেও নিরাশ করেননি। দিয়েছেন জহর রায়কে 'বাবা বদল', রঙ্গনাকে 'দম্পতি', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে 'দর্পণে শরৎশশী'। এই সব বিশিষ্ট নাটকগুলির গা দিয়ে নিজের দল সুন্দরমের জন্য লিখেছেন, পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন একাধিক কালজয়ী নাটক 'পরবাস', 'সাজানো বাগান', 'মেষ ও রাক্ষস', 'নৈশ্যভোজ', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা', 'ছায়ার প্রাসাদ', 'গল্প হেকিম সাহেব', 'রঙের হাট', 'যা নেই ভারতে'। ভোলেননি ছোটদের কথা। লিখেছেন অপারেশন ভোমরাগড় / আমার A স্কার। পরম সৌভাগ্য হয়েছিলো তাঁরই চারটি নাটক প্রতিকৃতির প্রয়োজনায় করার/ 'কেনারাম বেচারাম', 'দর্পণে শরৎশশী', 'দম্পতি' এবং 'সাদাখোল কালোপাড়'। দুটি নাটক 'কেনারাম বেচারাম' এবং 'দম্পতি' আজও বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়ে চলে। আমাদের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'কোপাইনদীর বাঁকে', 'বীরসা মুন্ডার গান' এবং 'ইবসেনের এনিমি' নাটকের সঙ্গে। এর বাইরে আরও যে কত দল, নতুন পুরাতন মনোজদার নাটকগুলিকে অবলম্বন করে পাদপ্রদীপের আলোয় ওঠে এসেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মনোজদা পুর্ণাংগ নাটক লিখেছেন পঁয়ত্রিশটি। একাংক নাটক শতাধিক—সবগুলিই বাংলা থিয়েটারের অহংকার। বাংলা থিয়েটারের সম্পদ।

অ পূ র্ব দে

রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক ঃ সর্বকালীন আবেদন

> "রামায়ণ', 'মহাভারত'-এ দুটোরই শৈশব থেকেই প্রথমে শোনা, প্রায় প্রতিদিনই শোনা, তারপর....আসলে আমাদের শৈশবে গ্রামের জীবনে, মানুষদের, বিশেষত পঞ্চাশোর্দ্ধ মানুষের একমাত্র রিক্রিয়েশনই ছিল রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করা বা পাঠ শোনা। এটা প্রায় ঘরে ঘরেই চলত, সব ঋতুতে। আমার প্রবীণা ঠাকুমা নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ তো করতেনই আবার আমাদের অনুরোধে যে কোনও ফাঁকা সময়েও তিনি শোনাতেন। শুনতে শুনতে ওই শৈশব থেকেই আমার এমন অনুভূতি হয়েছিল যে, এ দুটো বই আমার, আমার নিজস্ব সম্পদ। মনে হয়েছে, বই দুটোর উপর আমার দখল আছে, এতটাই দখল যে, এখানে ভাঙাচোরা কিছুই আটকায় না আর কোনও নৈতিকতাতেও বাধে না। বরং এটা করতে পারলে আমি খুব একটা সার্থক বোধ করি। আসলে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বই দুটি।"[১]

—কথাগুলি বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের অবিস্মরণীয় নাট্যকার মনোজ মিত্রের। এই দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পড়া ও শোনা ফলস্বরূপ তিনি উপহার দিয়েছেন রামায়ণ ও মহাভারত আশ্রিত বেশ কিছু নাটকের। যেমন 'অশ্বত্থামা' (১৯৬৩), 'তক্ষক' (১৯৬৭), 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'পুঁটি রামায়ণ', (১৯৯০), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮), 'আশ্চর্য ফান্টুসি' (২০১০) ইত্যাদি। এই নাটকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারতের কথাই আমাদের শুনিয়েছেন তিনি। নির্দ্বিধায় প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, "রামায়ণ-মহাভারতের কথা অমৃত সমান/মনোজ মিত্র কহে শুনে পূণ্যবান"। নাট্যকার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান সময়ে বা প্রত্যক্ষ করেছি বা করছি আমাদের জীবনে, রামায়ণ-মহাভারতের কালের সময় বা সমাজের সঙ্গে তার ভীষণ মিল আছে। রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনিকার তো আর আলাদা করে একটা জগৎ সৃষ্টি করেননি। যা করেছেন তা তাঁদের নিজের দেখাশোনা জগতের মধ্যে থেকেই করেছেন। তাই প্রাচীন কালের আবরণটা গায়ে জড়িয়ে তিনি চলে গেছেন তাঁর সময়ের মধ্যে থেকে অন্য এক সময়ে; বিচার করতে চেয়েছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রামায়ণ-মহাভারতের সময়কালকে। তিনি নির্ভয়ে মানুষের কথা বলেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, মানব সভ্যতার নানা অসঙ্গতি, বর্তমান সময় ও সমাজের নগ্নরূপ। বিতর্ক হবে জেনেও তিনি রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যানকে উক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে মেলে ধরেছেন বর্তমানের পাদপ্রদীপে।

'অশ্বত্থামা' নাটকটি ১৯৬৩ সালে লেখা। নাট্যকার নাটকটি ১৯৭২-৭৩ সালে পুনর্লিখন

করেন এবং প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের শারদ সংখ্যায়। মহাভারতের 'সৌপ্তিক' পর্ব থেকে 'অশ্বত্থামা' নাটকের কাহিনি গৃহীত। নাটকে মোট তিনটি চরিত্র অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য। পর্ব দুটি—গোধুলি পর্ব ও নিশীথ পর্ব। কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৌরব পক্ষে যোগদান করে। পিতা দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ফলে গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগে তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করলে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের হত্যা করার শপথ নেন। পিতার কাছ থেকে পাওয়া নারায়ণ প্রদত্ত নারায়ণাস্ত্র তিনি পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবরা অস্ত্র ত্যাগ করে অস্ত্রের দিকে পিছন ফিরে তাকালে সে যাত্রায় পাণ্ডবরা বেঁচে যান। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা তাঁর কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের বিনাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারোতম দিনে ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধন উরুভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকেন। এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্বত্থামার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। রাতের অন্ধকারে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য নিয়ে সে পাণ্ডব নিধনে যায়। পাণ্ডব শিবির দ্বারে পাহারায় ছিলেন স্বয়ং মহাদেব। অশ্বত্থামা শিবের স্তব করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব খুশি হয়ে পাণ্ডবদ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এমনকি তাঁর খড়্গটি অশ্বত্থামাকে প্রদান করেন। অশ্বত্থামা সেই খড়্গের আঘাতে পঞ্চপাণ্ডব ভুল করে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করেন। পরম আনন্দে তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড এনে দুর্যোধনকে উপহার দেন। দুর্যোধন তাদের চিনতে পেরে নির্বংশ হওয়ার শোকে প্রাণত্যাগ করেন।

মহাভারতের এই কাহিনির মধ্যে নানা ভাঙচুর ঘটিয়ে মনোজ মিত্র সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হাজির করেছেন। সত্তর দশক অস্থির রাজনৈতিক দশক। একদল যুবসমাজের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দশক। নকশাল আন্দোলন সারা পশ্চিমবঙ্গের সমাজের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। তরুণ-যুবকদের বুকের উষ্ণ রক্তে ভিজে গিয়েছিল কলকাতার রাজপথ। চারিদিকে তখন মৃত্যুর হাতছানি, গুপ্ত হত্যা চলছে—'অশ্বত্থামা' নাটকটি থিয়েটার ওয়ার্কশপ বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় প্রযোজনা করে। প্রথম অভিনয় ১৯৭৪ সালের ২রা মে, 'রঙ্গনা' থিয়েটারে। বিভাস চক্রবর্তী এই নাটকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন:

> "তখন নকশালবাড়ির আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে'। কিন্তু আন্দোলনের পুনর্মূল্যায়নের একটা চেষ্টা চলছে চারধারে। মনোজের মূল্যায়নে সেই অশ্বত্থামাতে এমন অন্ধতা, খড়্গ হাতে নিয়ে অন্ধভাবে কে শত্রু কে মিত্র না চিনে হত্যায় লিপ্ত হওয়া। ভ্রাতৃহত্যায় লিপ্ত হওয়া। পরবর্তী প্রজন্মকে হত্যায় লিপ্ত হওয়া। মহাভারতের ওই পর্ব অষ্টাদশ দিনে, কুরুক্ষেত্রের শেষে এই ব্যাপারটার সঙ্গে কিন্তু অনতিপূর্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটা অদ্ভুত মিল। সেই মূল্যায়নটা করা হয়েছিল অশ্বত্থামা নাটকে।"[২]

বোঝা যায়, 'অশ্বত্থামা' নাটকে অশ্বত্থামা নকশাল আন্দোলনের সময়কার যুবসমাজের প্রতিনিধি। যিনি শত্রু-মিত্র না চিনে, না বুঝে রাষ্ট্রনায়কের প্ররোচনায় গুপ্তহত্যা করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে। চিহ্নিত হয়েছে শিশুঘাতী গুপ্তঘাতক হিসেবে নাটকের শেষে আত্মহননে দগ্ধ অশ্বত্থামা উচ্চারণ করে :

> "কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি...নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই... দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই... তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে-কাতারে মৃতদেহ, শ্মশান শকুনি। এমন রিক্ত নিঃস্ববিধবা ধরিত্রী। ওরে, কোথা হতে আসে নীতি... কোথায় বাস করে পূণ্য! বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়, সৃজন!...অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে।'

নাটক শেষ হয়েছে দুর্যোধনের মৃত্যুতে এবং পাণ্ডবদেব রথ আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে। অর্থাৎ ক্ষমতাদর্পী শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তি আগমনের সঙ্কেতধ্বনি।

অশ্বত্থামার দুই পাশে ছিল দুই মাতুল কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। কৃতবর্মা অশ্বত্থামাকে উত্তেজিত করেছে পান্ডবদের বিরুদ্ধে—"পঞ্চম কৌরব সেনাপতি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য...অশ্বত্থামা! বীর অশ্বত্থামা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। পঞ্চপাণ্ডবের বিজয় হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা।...চাই পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন শির।" মহাভারতে ভোজরাজ কৃতবর্মার তেমন কোনো ভূমিকা নেই। মহাভারতের এই অপ্রধান চরিত্রকে নাট্যকার মনোজ মিত্র অসাধারণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তার বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়েছেন কৃপাচার্যকে। যে অশ্বত্থামাকে অকারণ রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে বার বার নিষেধ করেছেন। এই দুই ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ্ব গতি পেয়েছে। দু'জনের টানাপোড়েনে মানসিকভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন অশ্বত্থামা। দুর্যোধনের প্রতিভূ কৃতবর্মা চরিত্রটি নাটকে ক্ষমতালোভী, হিংসাপরায়ণ, ধূরন্ধর চরিত্ররূপে চিত্রিত। কৃপাচার্য রাজ অনুগ্রহে পালিত। ফলে দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যায় কাজ জেনেও পাণ্ডব নিধনে সামিল হয়েছেন। নীরবে অশুভ কাজের সাক্ষী থাকার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই সংলাপে :

> "আমি যে একজন অন্নদাসী শাস্ত্রজীবী...কোনো দিন নিঃসংশয়ে প্রতিবাদ করতে পারিনি।...মূর্খ ছিলাম। বুঝিনি রাজার উদ্দেশ্য কখনো এমন জলের মতো স্বচ্ছ নয়। বুঝিনি রাজা ধীরে ধীরে তার শক্তি সঞ্চয় করছে। এই দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে।"

রাষ্ট্রশক্তি তো এভাবেই বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিদের আয়ত্ত করে তাদের ভাতা কিংবা পুরস্কার দিয়ে। চিরন্তন এই সত্য প্রকটিত হয় কৃপাচার্যের নিম্নোক্ত সংলাপে:

> 'রাজার অন্ন, হা পুত্র, এত গুরুপাক...তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার বিষক্রিয়ায়
> চিরদিন স্তব্ধ হয়ে আছি।'

যুগে যুগে দেশে দেশে বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত মানুষেরা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অসমাজিক, অপরাধমূলক কাজের সাক্ষী হয়ে যায় রাজ অনুগ্রহ লাভ করে। কৃপাচার্য তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিস্ময় স্রষ্টা এই নাটকে পুরাণকে আশ্রয় করলেও পৌরাণিক, অলৌকিক কাহিনিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। মহাভারতের পাণ্ডবদ্বার পাহারারত শিবের উপস্থিতি নেই নাটকে। নাট্যকারের আধুনিক মন পাণ্ডব শিবিরের অসতর্কতার কারণ হিসেবে যুক্তি খুঁজেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পাণ্ডব শিবির। বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে তারা শোকরজনী পালন করবে। তাই আলো না জ্বালিয়ে, অস্ত্র ত্যাগ করে তাঁরা মৃত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। এই পরিস্থিতিরই সুযোগ নিয়েছে অশ্বত্থামারা। ফলে 'অশ্বত্থামা' নাটকটি মহাভারত কেন্দ্রিক হলেও নিছক পৌরাণিক নাটক হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে পুরাণকে আশ্রয় করে এক আধুনিক নাটক।

২০০৫ সালে লেখা মনোজ মিত্র তাঁর 'যা নেই ভারতে' নাটকে এক নতুন ভারতের সন্ধান দিয়েছেন। মহাভারতকে অবলম্বন করে মনের মাধুরী মিশিয়ে মহাভারতের নানান চরিত্রকে নানান মাত্রা দিয়েছেন। যুদ্ধ, যুদ্ধ-বিরোধিতা, হিংসা, লোভ, নারীর অসহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে মহাভারতের কাল আর সমকাল কোথায় যেন একাকার হয়ে গেছে এই নাটকে। কৌরব প্রাসাদের অন্দরে আলো ফেলে নাটককার সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলিকে হাজির করেছেন। অন্তঃপুরের প্রবীণতম অধ্যক্ষ কঞ্চুকী এবং অকাল প্রয়াত বিচিত্রবীর্যের বড়ো রানি অম্বিকার চোখ দিয়ে মহাভারতের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই আছে ভীষ্ম-অম্বিকা দ্বন্দ্ব। নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর হস্তিনাপুর রাজ্যে সঙ্কট দেখা দেয়। সিংহাসনে বসবে কে? ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সিংহাসন গ্রহণ করবে না এবং বিয়েও করবে না। বংশধর রক্ষায় কঞ্চুকীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রানি অম্বিকাকে নিয়োগপ্রথায় সন্তান লাভ করার বিষয়ে রাজি করাতে হবে। কিন্তু অম্বিকা ভীষ্মের ঔরসজাত সন্তানকেই কামনা করে। অম্বিকার ভীষ্মের প্রতি ভালোবাসা ভীষ্মের চোখে 'স্পর্দ্ধা' রূপে প্রতিভাত হয়। সদর্পে ভীষ্ম ঘোষণা করে—"ওকে জানিয়ে দিন, আমরা যাকে নিয়োগ করব, তাকেই শয্যায় গ্রহণ করতে হবে।" ভীষ্মর সিদ্ধান্ত মানতে অম্বিকা বাধ্য হলেও প্রতিবাদের ধ্বজা উর্দ্ধে তুলে ধরে :

> "ওঃ ভীষ্ম তার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে পারবে না, ত্যাগ যা করতে হবে অম্বিকাকে। যত দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীকে। তার বেলা পঙ্কে পতন নয়! স্বপ্ন সাধ পূরণের প্রত্যাশী সে হতে পারে না! যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে তাকে?"

কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সামনে অম্বিকা যে প্রতিবাদ করে তাতে মহাভারতের যুগ পার হয়ে আজকের অদি আধুনিক যুগের নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে।

নাটকের দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে অম্বিকার দ্বন্দ্ব। কুরুকুল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মাতা সত্যবতী ও কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের আদেশে শারীরিকভাবে মিলিত হতে হয়েছে ব্যাসদেবকে অম্বিকার সঙ্গে। ভয়ানক দর্শন ব্যাসের মুখ দেখতে চায় না অম্বিকা। অথচ ভীষ্মের আদেশে তাকেই শয্যাসঙ্গ দিতে বাধ্য হয় অম্বিকা, উপলব্ধি করে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই তাকে ব্যবহৃত হতে হয়। উভয়ের মধ্যে কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ব্যাস ও অম্বিকা তারা দু'জনেই রাষ্ট্রশক্তির ইচ্ছার দাস, শাসনতন্ত্রের নিযুক্ত কর্মীমাত্র। অম্বিকা স্পষ্ট উচ্চারণে ব্যাসদেবকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে পুত্র সন্তান উৎপাদনে তারা দুজনেই রাজতন্ত্রের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছে :

> "আমি যেমন আপনার মনোনীত কামিনী নই, আপনিও নন আমার কামনার
> পুরুষ। একটি রাজবংশ রক্ষার তাড়নায় নিযুক্ত আমরা দুটি নারী পুরুষ।...
> আপনি আপনার দায় পালন করেছেন।...আমি আমার।"

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত কুরু সিংহাসনে বসে অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র—যিনি আদর্শবাদী ও শান্তিকামী। তার কাছে অশ্বমেধের ঘোড়া হচ্ছে 'আধিপত্যের প্রতীক'। কুরুবংশের অশ্বমেধের ঘোড়া মগধরাজ আটক করলে ভীষ্ম তাকে উচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতে—'অশ্বমেধ কোনও যজ্ঞই নয়', 'ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র।' ভীষ্মকে তিনি সহজভাষায় জানিয়ে দেন :

> 'কোনও প্রয়োজন নেই পররাজ্যে ঢুকে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার।
> আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না জেঠামশাই। যা করতে হয় এখন
> থেকে আমিই করব।'

যুদ্ধবিরোধী ধৃতরাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত প্রাসাদ রাজনীতির ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়ে যুদ্ধবাজ ধৃতরাষ্ট্রে পরিণত হন। নাটকে এই বিষয়টিও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কঞ্চুকি। অম্বিকা ও অম্বালিকার দুই শিশু পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে মানুষ করেছে কঞ্চুকি। কঞ্চুকি ভীষ্মের আসল রূপটা সকলের সামনে তুলে ধরে। জীবনে কোনোদিন সিংহাসনে বসবেন না—এই প্রতিজ্ঞা যে আসলে ভীষ্মের একটা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি তা কঞ্চুকি প্রকাশ করে দেয়। সিংহাসনে না বসলেও সিংহাসনের পিছনে থেকে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন ভীষ্ম। কঞ্চুকি সরাসরি আঙুল তুলে ভীষ্মকে বলেন—"...রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না।" আড়ালে থেকে ক্ষমতা পরিচালনার কূটনীতিতে যে ভীষ্ম দক্ষ কারিগর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নাটকে পাতকিনী চরিত্রটিও খুবই আকর্ষণীয় চরিত্র। হস্তিনা রাজ্যের অবৈধ শিশুগুলিকে জঙ্গলে লালন পালন করার মহান ব্রতে ব্রতী সে।

বঞ্চিত, অবাঞ্ছিত, অসহায় শিশুদের কাছে সে যেন মাতৃস্বরূপা। ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসলে পাতকিনী তার লালিত ছানাপোনাদের জন্য ভিক্ষা চাইতে যায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র পাতকিনীর কাছ থেকে দেশের বেজন্মা ছেলেপুলের মধ্য থেকে একশোটি শিশুকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"রাজা যে দেশের বাপ—দশের বাপ। তাই আমার ওই শাবকগুলির বাপ সে। দায় তার।" পাতকিনীর এই নারীসত্তা তথা মাতৃসত্তা এটাই প্রমাণ করে যে, শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না, সন্তানকে লালন-পালন করেন, সন্তানের সুখে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন তিনিও মা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। আসলে এই নাটকে মনোজ মিত্র মহাভারতকে আশ্রয় করে ভীষ্ম, ব্যাস, অম্বিকা, শকুনি, গান্ধারী ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে হাজির করেছেন। এ যেন "মহাভারতের কথা অমৃত সমান/মনোজ মিত্র কহে শুনে পূণ্যবাণ।"

মহাভারতের আদি পর্বের 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' কাহিনি অবলম্বনে মনোজ মিত্র রচনা করেছেন 'তক্ষক' নাটকটি। ১৯৬৩ সালে লেখা 'তক্ষক' নাটকে তিনি মহাভারতের কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ করেননি। মূল কাহিনির মধ্যে নানা ভাঙচুর ঘটিয়ে নাটককার নাটকটিকে সমকাল তথা চিরকালের উপযোগী করে তুলেছেন। মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায় যে, ষাট বছর বয়সে রাজা পরীক্ষিত তক্ষক দংশনে নিহত হ'ন। রাজা পরীক্ষিৎ ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে তপস্বী শমীকের কাছে উপস্থিত হয়ে নানা প্রশ্ন করেন। ধ্যানমগ্ন ঋষি শমীক সে সব প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নিরুত্তর থাকেন। ক্রোধে রাজা পরীক্ষিৎ ঋষির গলায় একটি মৃত সাপ জড়িয়ে চলে আসেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী বন্ধুর কাছে তার পিতার এহেন অপমানের খবর শুনে রাজাকে অভিশাপ দেন। তক্ষক দংশনে রাজার মৃত্যু ঘটবে সাতদিন পর। শৃঙ্গীর এই অভিশাপের কথা শুনে ঋষি শমীক পুত্রকে তিরস্কার করেন। কেননা হস্তিনাপুরের রাজা পরীক্ষিৎ মৃগকে সেবা করছিল। উপরন্তু যে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। তিনি পুত্রকে শিক্ষা দেন যে পূণ্য অর্জন করলেই চলবে না, তাকে রক্ষাও করতে হবে। তিনি গৌরমুখ নামে এক শিষ্যকে পরীক্ষিতের কাছে পাঠালেন তাকে অভিশাপের কথা জানাতে। রাজাকে সতর্ক থাকার অনুরোধও করেন। তা সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদে রাজা পরীক্ষিত মহানাগ তক্ষকের দংশনে মারা যান।

'তক্ষক' নাটকে রাজা পরীক্ষিৎ বৃদ্ধ নয়, তরতাজা এক যুবক। সুন্দর, সুঠাম, উজ্জ্বল শরীরের অধিকারী। প্রতিনিয়ত তাকে মৃত্যুভয় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার চারদিকে যেন মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাজা সর্বত্র মৃত্যু দেখতে পান। কোথাও তৃষ্ণা মেটানোর জল পান না। গুল্মলতাপাতাকে মনে হয় সাপের ছোবল। ঝর্ণার জলে পড়ন্ত রোদের চাকচিক্যে তার মনে হয় যেন সাপের মণি। তক্ষকের ভয়ে রাজা শঙ্কিত, আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত। ঋষি শমীক পরীক্ষিতের দ্বারা অপমানিত হয়েও তৃষ্ণার্ত রাজার প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। রাজার

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি তৈরি করেন মায়ার সরোবর, ঝর্ণা। যদিও অভিশাপগ্রস্ত রাজা জলের মধ্যে গরল প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পিতা শমীক, পুত্র শৃঙ্গী দুই বিপরীত সত্তা নিয়ে নাটকে হাজির। পিতা ক্ষমাশীল। মানবতার প্রতিমূর্তি। প্রাণকে বাঁচানোই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। পক্ষান্তরে পুত্র উদ্ধত, অহঙ্কারী, প্রাণহানি করতেই তার আনন্দ। পিতা-পুত্র যেন জীবন ও মৃত্যু। জীবনেরই সন্তান মৃত্যু—এই দার্শনিক উপলব্ধি নাটকটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। সারথী তন্ত্রিপালের সংলাপে দার্শনিক বোধের দিকটি উন্মোচিত হয়—'মৃত্যু সে তো জীবনের ভবিষ্যৎ'। মৃত্যুভয়ে ভীত রাজাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"জীবনের একটা দিন একটা সমুদ্র যদি হয়, তবে যে তো আজ হতে সপ্ত সমুদ্র দূরে। আজই কেন মরবেন... কেন হার মানবেন! এখনো তো সাতটা দিন।... বাঁচুন... বাঁচুন...মহারাজ বাঁচুন।' নাটকের শেষে রাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুভয় কাটিয়ে ওঠেন। জীবনের স্বাদ খুঁজে পান। উপলব্ধি করে মৃত্যু জীবনেরই নামান্তর। শৃঙ্গীর মধ্যেও শুভবোধের সঞ্চার হয়। পিতার তিরস্কারে সে অনুতপ্ত হয়। অসুস্থ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে উপলব্ধি করে—"আমি পাপ করেছি। সাধনা আমাকে অহঙ্কারী করেছে, বিদ্যা আমাকে সৃজন শেখায়নি, বিনাশের মন্ত্র দিয়েছে! তাই তক্ষকের কামড়ে আমি মরবো পিতা! আমি আমার নিজের ব্রহ্মতালুতে দংশন করে নিজের বিষ নিজের ওপর ঢালবো! পরীক্ষিৎ তুমি বেঁচে যাবে।" কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ যে তখন মৃত্যুভয়কে পিছনে ফেলে জীবনের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে। অনুভব করেছে মৃত্যুভয় নিয়ে বাঁচা যায় না। তাই শৃঙ্গীর ব্রহ্মশাপের কারণেই যেন রাজা পরীক্ষিৎ নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম। মৃত্যুভয় নিয়ে সে আর বাঁচতে চায় না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাকে আঘাত করে। হারিয়ে জীবনকে ভোগ করতে শিখেছে। নতুন করে বাঁচার রসদ পেয়েছে। রাজার পায়ের কাছে একটা তক্ষক ভয়ে ছটফট করে। বোঝা যায়। তক্ষক নিজের বিষেই নিজে জ্বলতে থাকে। বিজয়লক্ষ্মী যেন পরীক্ষিতের গলাতেই পরিয়ে দেয় বিজয়মাল্য।

ষাট-সত্তর দশকের অস্থির রাজনীতির ছায়া পড়েছে 'তক্ষক' নাটকে। যুব সমাজের বুকের রক্তে সে-সময় কলকাতার রাজপথ লাল হয়ে গিয়েছিল। যুব সমাজের সামনে সেদিন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আতঙ্ক। হাড় হিম করা ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বীভৎসতায় তরুণ-যুবকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তারা সত্যের মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। পরীক্ষিৎ যেন সেই যুব সমাজের প্রতিনিধি। যে মৃত্যুভয়কে জয় করে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে চায়। হার না মানা মানসিকতা নিয়েই সে মৃত্যুকে আহ্বান করে। উপলব্ধি করে মৃত্যুই জীবনের থেকে বড়ো নয়। শৃঙ্গী হচ্ছে ক্ষমতাদর্পী, প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রশাসন তথা রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে শাসকশক্তিই শেষ কথা বলে না। ইতিহাস রচনা করে সাধারণ মানুষ। কেননা তারাই মৃত্যুঞ্জয়ী। জীবনের সঞ্জীবনী সুধা পান করে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে তারা শিরদাঁড়া সোজা করে প্রতিবাদের স্বরকে

উর্দ্ধে তুলে ধরে। শৃঙ্গী আর পরীক্ষিতের লড়াই, দ্বন্দ্ব নিছক ঋষি আর রাজা। কিংবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের লড়াই নয়; এই সংগ্রাম দেশে দেশে যুগে যুগে শাসক আর শোষিতের লড়াই। যে লড়াইতে জীবনের সুর ধ্বনিত হয়, বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। তৃষ্ণার জলের অভাব যে একসময় তীব্র সঙ্কটের রূপ নেবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে। সুতরাং 'তক্ষক' নাটকটি মহাভারতের সীমাকে লঙ্ঘন করে মহাকালের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে।

'মেষ ও রাক্ষস', 'পুঁটি রামায়ণ', 'ভেলায় ভাসে সীতা' ও 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' নাটকগুলির প্রধান অবলম্বন 'রামায়ণ'। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকটি সম্পর্কে মনোজ মিত্র নিজেই বলেছেন—"রামায়ণের ইল্বল ও বাতাপি—দুই রাক্ষসের উপাখ্যান আশ্রয় করে লেখা 'মেষ ও রাক্ষস"। তবে পুরাণের আশ্রয়ে কল্পনার বিস্তারের যেমন সুযোগ থাকে, ইতিহাসে তা নেই।' নাটকটির শুরুতেই কল্পনার বিস্তারের যেমন সুযোগ থাকে, ইতিহাসে তা নেই।' নাটকটির শুরুতেই নান্দীমুখের ব্যবহার আমাদের নিয়ে যায় সুদূরে ফেলে আসা অতীত সংস্কৃত নাটকের সন্ধানে। রামায়ণের 'অরণ্যকাণ্ড' থেকে নরমাংসলোভী ইল্বল ও বাতাপি নামক দুই ভাইয়ের কাহিনি নিয়ে নাট্যকার রূপককে আশ্রয় করে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই দুই রাক্ষস কৌশলে ব্রাহ্মণ হত্যায় লিপ্ত হয়েছিল। ইল্বল ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতো। বাতাপি মায়াবিদ্যার মাধ্যমে মেষে অর্থাৎ ভেড়ায় পরিণত হতে পারতো। মেষরূপী বাতাপি কেটে তার মাংস রান্না করে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের দেওয়া হতো। ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হলে ইল্বল উচ্চস্বরে বাতাপিকে ডাকতো। বাতাপি সঙ্গে সঙ্গে অতিথির পেট চিরে, মেষের রবতুলে রাক্ষস রূপে বের হয়ে আসতো। ত্রিকালদর্শী অগস্ত্য মুনি একদিন আমন্ত্রিত হয়ে আসেন দুই রাক্ষসের কাছে। তিনি মেষের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে তাকে যেন মেষের পুরো মাংসই দেওয়া হয়। ইল্বল মহা আনন্দে মুনির জন্য বাতাপিকে কেটে রান্না করলো। অগস্ত মুনি পরম তৃপ্তিতে পুরো মাংস খেয়ে বাতাপিকে হজম করে ফেলেন। ইল্বল বাতাপি-বাতাপি ডাক ছাড়লে মুনি জানান, বাতাপি আর পেট চিরে বের হয়ে আসতে পারবে না। কেননা বাতাপিকে তিনি উদরস্ত করে ফেলেছেন। রাগে ক্ষোভে ইল্বল মুনিকে হত্যা করতে উদ্যত হলে অগস্ত মুনি তাকে হত্যা করে।

'মেষ ও রাক্ষস' নাটকের কেন্দ্রেও আছে এক রাক্ষস। রূপ নগরের রাজা বিচিত্রদন্ত। সেও এক জাদুদণ্ড। যে জাদুদন্ডের এক দিকে হাঁ-করা হাঙরের মুখ, অন্যদিকে লম্বা পাঁচটা নখ। এই ভয়ঙ্কর জাদুদণ্ডের সাহায্যে রাক্ষস আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে পারতো নরখাদক বাজপাখির দলকে, জাদুদণ্ডের একটা আঘাতেই মানুষকে মেষ বানাতে পারতো, নাচাতে পারতো হলুদ হাড়ের কঙ্কাল। বিচিত্রদন্ত কঙ্ক পণ্ডিতের চোখ দুটো নষ্ট করে দেয় গরম শিক ঢুকিয়ে। তার কাজের কেউ বিরোধিতা করলেই জাদুদণ্ডের পাশবিক আঘাতে সে মেষে পরিণত হয়ে যেত। হিমপাহাড়ের মাথায় বসবাসকারী এক মহাজ্ঞানী তাপসের কাছে আছে

রাক্ষসের মৃত্যুবাণ। কঙ্ক পণ্ডিতের তিন শিষ্য কামারের ছেলে হীরামন, কুমোরের ছেলে সুবর্ণ আর কাঠুরের ছেলে নীলকমল ছুটছে তপস্বীর কাছে রাক্ষসকে মারার উপায় জানতে। পণ্ডিতের ঘোষণা অনুযায়ী যে রাক্ষসকে মারতে পারবে, সেই হবে রূপনগরের রাজা এবং পাবে কঙ্ক পণ্ডিতের একমাত্র কন্যা চন্দ্রলেখাকে। এরপরেই শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের তিন ডাইনীর মতো তিন ভূতের আগমন ঘটে। এই তিন ভূত তিন যুবককে হিম পাহাড়ে পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করে ও বিভ্রান্ত করে। এই তিন প্রেত আসলে রাক্ষস বিচিত্রদন্তের অনুচর বণিক ধনপতি, সেনাপতি ও বিচারপতি প্রেতের ছদ্মবেশে হিম পাহাড়ের যাত্রা পণ্ড করতে চেয়েছে। অবশেষে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জানা যায় যে রাক্ষসের মৃত্যুবাণ নিয়ে তিনকুমার ফিরে আসবে। কিন্তু তারা নিজেরাই স্বার্থদ্বন্দ্বে উত্তেজিত তাদের দুর্বলতার সুযোগে ও ভুলে কারাগারে বন্দী রাক্ষস বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপরেই রাক্ষস সাধুর ছদ্মবেশে একের পর এক গুপ্তহত্যা করে চলে। অস্ত্র তার মেষে ও তার শিং। সুবর্ণ ও নীলকমল বন্দী হয় রাক্ষসের হাতে। অবশেষে হীরামন উদ্ধার করে তার দুই বন্ধুকে। তিন পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে তিন বীর রাজপুত্রের বিয়ে হয়। সত্যিই যদি মানুষ মনের দুর্বলতা এড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর উপর আঘাত হানতে পারে তাহলে তার জয় হবেই। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে এই বার্তাই ফুটে উঠেছে। 'দেশ' পত্রিকায় এই নাটকটি সম্পর্কে লেখা হয়েছিল :

> "রূপকথার আদলে এই নাটকে আসলে সর্বাধুনিক একটি রূপক যা আমাদের সমাজের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের জটিল আবর্তকে স্বচ্ছ বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ করায়। গল্পের কাঠুরের ছেলে বিভ্রান্তকারী প্রেতদের উদ্দেশ্যে যখন বলে, রাক্ষসের এঁটো খাওয়া কুকুর আজ বুঝি এসেছে আমাদের মাঝে হানাহানি শুরু করে দিতে! প্রেত তোরা সত্যিই প্রেত! পালা বদলের দিনে তোদের খেলা প্রেমের খেলা।"[৩]

—পাঠক 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকটি পাঠ করে রামায়ণের কালের চেতনা থেকে বর্তমান কালের চৈতন্যে ফিরে আসে। রামায়ণের চেনা কাহিনিতে আসে নতুনত্বের স্বাদ।

'পুঁটি রামায়ণ'-এর রচয়িতা মনোজ মিত্র কি হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচী? এই বিতর্ককে দূরে সরিয়ে আমরা 'পুঁটি রামায়ণ'-এর অন্দরে আলো ফেলি। আমরা পেয়ে যাই রামায়ণের লঙ্কেশ্বর বারণ, ঘরভেদি বিভীষণ, ছ'মাস ঘুমের দেশে পাড়ি দেওয়া অলস কুম্ভকর্ণ, মামা কালনেমি, রামভক্ত হনুমান প্রমুখ চেনা চরিত্রগুলিকে। এমন কি বিংশ শতাব্দীর পুঁটিরাম নিজেই রামায়ণের একটি বিশেষ চরিত্ররূপে হাজির। 'পুঁটি রামায়ণ'-এর নায়ক পুঁটিরামই দশানন রাবণ নয়। কেননা বিংশ শতাব্দীতে রাবণ ফসিলে পরিণত। পুঁটিরামই এই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, পুঁটিতন্ত্রের প্রয়োগকর্তা। পুঁটিরামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

"একালের পক্ষে পুঁটিরামই মানানসই বিশেষ করে বছরে আড়াই মাসটাকে চুল গজাবার অব্যর্থ ডাক্তারি....দেড় মাস বাইসাইকেল কারিগর, পৌনে তিনমাস তেলাপিয়া মাছের আড়তদারি, পাঁচমাস সাড়ে সতের দিন খোলা জানলায় আঁকশি ঢুকিয়ে গেরস্থ ঘরের থালাঘটিবাটি হাতাখুন্তি ঝাড়াঝাড়ি.....করে করে ক্লান্ত পুঁটিরাম।"

—অবশেষে পুঁটিরাম রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছে। তার রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে দেখা যায় যে তার নব্য রামায়ণ শুনে রাবণ পুঁটিরামকে রাজসিংহাসন ছেড়ে দিতে চায়। রাবণ এখানে একালের ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী সমাজব্যস্থার নায়ক। তার রাজ্যে হানাহানি, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। স্বর্ণলঙ্কায় বন্দী হনুমানকে রাবণ ফাঁসি দিতে চায়। কিন্তু লঙ্কায় কুলাঙ্গার একটা ফাঁসুড়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ফাঁসির কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। বন্দী হনুমানের জন্য প্রচুর খরচ হয়ে যাচ্ছে। রাবণকে পুঁটিরাম পরামর্শ দেয়। বেতন বাড়ান স্যার, বেতন বাড়ান। ফাঁসুড়ে পোস্টের জন্য একটা লম্বা স্কেল করুণ। দেখবেন কুলাঙ্গারেরা গোপন আস্তানা ছেড়ে ছোঁক করে বেরিয়ে আসছে।...দেশের সর্বোচ্চ বেতন ধার্য করা হোক দেশের সর্বোত্তম কুলঙ্গারটির জন্যে। সেই সঙ্গে দিন ফ্রি কোয়াটার। যেটা হবে লঙ্কেশ্বর দশাননের সুবিশাল সুবর্ণ-প্রাসাদের চেয়ে দশগুণ বড়ো। যার মধ্যে থাকবে সোনার জলের ফোয়ারা, জ্বলবে সোনার ঝাড়বাতি, সোনালি প্রজাপতির মতো একঝাঁক সেবাদাসী সোনার নূপুর পায়ে দিবারাত্র নাচবে সেখানে।" টাকা, সোনা, প্রাসাদ, মদ, নারী-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখভোগের লোভে হাজার হাজার কুলাঙ্গার কর্মপ্রার্থী হিসেবে উপস্থিত হয়। শ্রেষ্ঠ কুলাঙ্গারের প্রতিযোগিতায় সকলেই অংশ নিতে চায়। হেরোইনভক্ত কুম্ভকর্ণ, রাবণ ঘনিষ্ঠ পণ্ডিত, রোগী হত্যাকারী বৈদ্য সকলেই ফাঁসুড়ের পদের জন্য লালায়িত। যা দেখে স্বয়ং লঙ্কেশ্বর পুঁটিরামের কাছে জানতে চায়—'পুঁটিরাম, এত কুলাঙ্গার ছিল আমার দেশে।' পুঁটিরাম জানায় সব ব্যাটা গা ঢাকা দিয়েছিল। পুঁটিরাম দশাননকে প্রস্তাব দেয় যে হনুমানকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত কুলাঙ্গারকে ফাঁসিতে লটকে দিন। পুঁটিরামকেই ফাঁসটা টানার আদেশ দেওয়ার জন্য সে রাবণকে অনুরোধ করে। কেননা হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচী শুধু কুলাঙ্গার নয়, কালজয়ী কুলাঙ্গার। রাবণ পুঁটিরামের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাকেই রাবণের গুষ্টি নাশ করার দায়িত্ব দেয়। সানন্দে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পুঁটিরাম হনুমানের হাতে তুলে দেয় কার্বোরাইসড দেশলাই। আর বলে, 'লঙ্কার ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যা হনু।' পুঁটিরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীতামাকে উদ্ধার। তাই সে হনুমানকে বলে—''তোর রামচন্দ্রকে বলিস, হাওড়ার পুঁটিরাম তাঁর কাজ চোদ্দআনা সেরে রেখেছে। এখন দয়া করে তিনি নিজে একবার এসে সীতামাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেই হয়।" স্বর্ণলঙ্কায় এসে পুঁটিরাম উপরি হিসেবে পায় রাবণের দামী মাছরাঙাকে। তাদের ভালোবাসা পরিণতি পায় চার হাত এক করে। ফাঁসির মঞ্চে চলতে থাকে পণ্ডিতের বিয়ের মন্ত্র—'যদিদং মম, তদিদং হৃদয়ং তব'। মনোজ মিত্র ও পুঁটিরাম নাটকে একটা সময় এক বিন্দুতে মিলে যায়। উভয়েই 'ফাঁসি' নামক রাষ্ট্রের

আইনগত হত্যাকে সমর্থন করে না। সভ্যতার চরম অসভ্যতার বিরুদ্ধে পুঁটিরাম ধিক্কার জানিয়ে বলে :

> "ফাঁসি! সভ্যতার চূড়ান্ত। আমাদের কালে আসামিকে পেটপুরে খাইয়ে চান করিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়, তারপর গলায় ফাঁস পরিয়ে ঘ্যাঁচ করে দড়িয়ে টেনে দেওয়া হয়...পুরো আইনমাফিক হত্যাকাণ্ড।"

—এখানে পুঁটিরামের অন্তরালে নাটককার মনোজ মিত্র যেন সেই কথা বলে উঠেছেন। ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে জানি তিনি নিজে ভীষণভাবে ফাঁসির বিরুদ্ধে। তাই হয়তো নাটকে শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতের ফাঁসি হয় না। পুঁটিরামের জল্পনা-কল্পনায় গড়ে ওঠা লঙ্কাকাণ্ড সত্যিই একখণ্ড মধুভাণ্ড হয়ে ওঠে। 'পুঁটিরামায়ণ' আয়তনে ছোটো, দামে খাটো (আট আনা), কিন্তু গভীরতায় ও রামায়ণের নব্যব্যাখ্যায় অনন্য।

'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকে রামায়ণের সীতা ও শূর্পনখার নবরূপায়ণ ঘটেছে। রামায়ণের বিষয়কে আশ্রয় করে দুই নারীর জীবন-যন্ত্রণার কথাও তাদের প্রতিবাদের সুর উচ্চারিত হয়েছে এই নাটকে। অবশ্য আর একজন নারীও আসছেন তিনি মন্দোদরী। দেশজ লোকনাট্যের ঢঙে লেখা এই নাটক। নাটকের শুরুতেই হনুমানের প্রস্তাবনা গীতির মাধ্যমে একে একে চরিত্ররা মঞ্চে আছেন। জানা যায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে পঞ্চবটী বনের উদ্দেশ্যে চলেছেন। রাজা জনক সীতাকে মাটি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই তিনি ভূমিসুতা। ভূমির প্রতি তাঁর আকর্ষণ সীমাহীন। তাই হয়তো পঞ্চবটী বনে এসে সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ সীতাকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। নগর সভ্যতার বাইরে পঞ্চবটী বনকে তার মনে হয় 'সত্যি এ যে মায়াকানন'। পদ্মসরোবর, সোনার হরিণ, মাটিমাখা হাঁস, দুষ্টু ভ্রমণ তাঁকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। পঞ্চবটী বনেই শূর্পনখার সঙ্গে সীতার সখ্যতা গড়ে ওঠে। বনচারী তথা রানী শূর্পনখা সীতাকে জানায় যে পঞ্চবটী রাজ্য হস্তগত করার উদ্দেশ্যেই রামচন্দ্রের এখানে আসা। তার অকাট্য যুক্তি—'পিতৃসত্যপালনে যিনি একবস্ত্রে বনবাসে আসছেন, তাঁর পিছু পিছু অযোধ্যার মালবাহকেরা কেন রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্রের পেটিকা বয়ে এনেছিল বলতে পারো? সারিবাঁধা শকটে অস্ত্র ঢাকা দেওয়া ছিল কেন সীতা?' রামচন্দ্রের প্রতি সীতার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও গভীর বিশ্বাস ধাক্কা খায় শূর্পনখার যুক্তিতে। কোমল স্বভাবা সীতার মধ্যেও ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল প্রতিবাদের আগুন। তাই লক্ষ্মণ যখন চক্রান্ত করে শূর্পনখার নাক কেটে দেয় তখন সীতা প্রতিবাদে ঝলসে ওঠেন। লক্ষ্মণের দিকে সীতা একটা ভারী পাথরের টুকরো ছুড়ে দিয়ে বলেন—'তুমি কি পুরুষ?' পাশাপাশি রামের প্রতি তাঁর সন্দেহ জাগে। পঞ্চবটীতে যে রাম এসেছেন নিছক পিতৃসত্য পালনের জন্য নয়, বরং অনার্যরাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে—রামের এই অভিসন্ধি ধরতে পেরে সীতা যুদ্ধের বাধা হয়ে দাঁড়ান। সীতা বাধা হয়ে দাঁড়ালে পঞ্চবটী জয় এবং রাবণকে সিংহাসনচ্যুত করা অসম্ভব হবে। নাটকীয় ঘটনায় রাম ও সীতার মাঝে এসে দাঁড়ায় মায়া-সীতা। ঋষি শরভঙ্গ

যজ্ঞের অগ্নি থেকে সৃষ্টি করলেন মায়াসীতা। এই সীতা রামের অন্যায়-অবিচারের কোনো প্রতিবাদ করবে না। বরং রামের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন করবে। রামচন্দ্রের পদসেবা করবে, দেহমন সর্বস্ব নিবেদন করে তাঁকে তুষ্ট করবে। রামের লঙ্কা বিজয়ের পথ সুগম হবে। মায়াসীতার সৃষ্টি হওয়ায় সীতার স্বামীর প্রতি গভীর বিশ্বাসে চিড় ধরে। হতাশার সুরে স্বামী রামচন্দ্রে কাছে জানতে চায়—"আচ্ছা এমন তো নয় রাম, এখন থেকে আমাকে ছেড়ে তুমি এই মায়াসীতাকে নিয়েই কাল কাটাবে?" রামচন্দ্র ছলনার আশ্রয় নিয়ে সীতাকে বোঝাতে চান যে মায়াসীতা আর সীতা একই ব্যক্তি। সীতা আর মায়াসীতা অভিন্ন। রামের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করে সীতা জানায়—"নিশ্চয় না—আমি তোমাকে পঞ্চবটীতে রক্ত ঝরাতে দেব না—কারও ভূমি দখল করতে দেব না...ওই পুতুলটা নিশ্চয়ই তা দেবে। আমি চিৎকার করব, বিন্ধ্যপর্বত ডিঙিয়ে ফিরে যেতে চাইব—পুতুলটা নিশ্চয়ই তা চাইবে না। .... এই পথের কাঁটা সরিয়ে তুমি পুতুলটাকে নিয়ে থাকতে চাও"।

এরপর রাবণের হাতে জানকী অপহৃত হন। কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ অনেক চেষ্টা করেও সীতার মন জয় করতে পারেনি। তাই সে সীতাকে মুক্তি দিয়েছে। ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়েছে পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সীতা ফিরে এলেও রাম তাঁকে গ্রহণ করলেন না। কেননা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার থেকেও রামচন্দ্রের কাছে বড়ো আর্যজাতির বীরত্ব প্রতিষ্ঠা। অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাদের রাজত্ব ধ্বংস করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করতে চান। সুতরাং জানকীকে যুদ্ধের টোপ হিসেবেই ব্যবহার করতে চান রামচন্দ্র। সীতা বাধ্য হন লঙ্কার অশোককাননে ফিরে যেতে। সীতার করুণ, অসহায় অথচ আপোষহীনা পরিচয়ে জরাগ্রস্ত গ্লানিতে ও যেন জীবনের নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করে। সে জানে তার কোনো শক্তি নেই। কিন্তু তার আবেগ, স্বপ্ন, ভালোবাসা দিয়ে সে তার সীতামা-র পাশে দাঁড়াতে চায়। সীতামা ফিরে আসায় তার উচ্ছ্বাস, আনন্দ যেন বাঁধনহারা স্রোতের মতো কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে—"আমার যদি শক্তি থাকত মা, আমি এখুনি আকাশে উড়ে উড়ে পঞ্চবটীকে জাগিয়ে দিতাম, ওগো শোনো, আমাদের সীতামা ফিরেছে...ও সোনার হরিণেরা আমাদের সীতামা ফিরেছে...ও মাটিমাখা হাঁসেরা দেখে যাবে তোরা, কে ফিরে এল।" সীতার প্রেমকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে, নিজের বীরত্বকে জাহির করতে রামচন্দ্র যখন সীতাকে বর্জন করেন। ভেলায় ভেসে সহায়সম্বলহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অসহায় সীতা ফিরে যান অশোককাননের অভিমুখে; তখন সীতামার বেদনাশ্রু উপলব্ধি করে সম্পাতি গেয়ে ওঠে—"আমার যদি শক্তি থাকত তোমায় কাঁদতে দিতাম না/ যদি অনেক রাগ থাকত তোমায় কাঁদতে দিতাম না/যদি থাকত রে সুখ অনেক, ওই আঁচলে বেঁধে দিতাম/ যদিরে থাকত ভালবাসা তোমায় ভাসতে দিত না"। সীতার মুক্তি হয়েছিল পঞ্চবটীর আকাশে বাতাসে, আলোয়, সরোবরে, ঘাসে ঘাসে। সম্পাতি জরাগ্রস্ত সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সীতামার বেদনা, যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা ঝাপটিয়ে নিজের অস্তিত্বকে

জানান দিয়েছিল। শ্রদ্ধেয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকে সীতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন :

> "...তথাকথিত 'ধর্মযুদ্ধ'-এর অধর্মকে আঘাত করে মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতেই যেন ভেলায় ভাসে সীতা-র সীতার প্রয়াস।"[৪]

এই নাটকে রামচন্দ্রের দৈবমহিমার মুখোশ খসে পড়ে—যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্য বিস্তারকামী, ক্ষমতাদর্পী এক রাষ্ট্রনায়কের মুখ ফুটে ওঠে। অনার্য আদিবাসীদের বশীভূত করে আর্য ক্ষমতার বিস্তার, নারীর উপর সরাসরি শারীরিক আক্রমণ, ভূমিসুতা সীতা, ফলনের দেবী সীতা, প্রকৃতিপ্রেমি সীতাকে অপদস্ত করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র পুরুষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকীয়ভাবে মায়া-সীতা তৈরি করে রামের সীতার প্রতি চক্রান্তের দিককটি যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমনি রামের প্রতি সীতার মোহভঙ্গ ঘটে। পাশাপাশি সীতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তীব্র হয়। এই সীতা, শূর্পনখা ও মন্দোদরীর সখ্যতা নাটকে আলাদা একটা মাত্রা যুক্ত করে। পশ্চিম মেদিনীপুরের 'যড়ভুজ' নাট্যসংস্থা 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকের প্রযোজনা করে ড. তরুণ প্রধানের নির্দেশনায়। ২০১৬ সালের ৩১ শে মে 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ এই প্রযোজনার প্রথম অভিনীত হয়। প্রচারিত পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল :

> "... নাট্যকার একাধারে এখানে নারী চরিত্রের উত্তরণের সাথে সাথে নারীর আত্মজাগরণ, অধিকারবোধ, প্রতিকূলতার সাথে জীবনসংগ্রাম, মনুষ্যত্বের মহিমাকে মূল্য দেওয়া, উপেক্ষিত মানুষের অনাবিস্কৃত জগতের পরিস্ফুটন ও তাদেকে মানুষের মর্যাদা দান প্রভৃতি যেমন নাট্যায়িত করেছেন তেমনি মানবত্বকে অস্বীকার করলে কীভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত চরিত্রের মহিমা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়, আত্মঅহংকার যে একসময় মানুষের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে উঠতে পারে, তাকেও সরস সংলাপ ও চরিত্রের অসাধারণ উপস্থাপনায় তুলে ধরেছেন।"

—এই বিষয়ে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই।

নাটকের নাম 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' অর্থাৎ 'Fun to see'. এই নাটকে নাটককার রামায়ণের এক পরিচিত কাহিনিকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছেন। দস্যু রত্নাকরের রামায়ণ পাক্কা সিঁধেল চোর মাধবচন্দ্র চুরি করে। সে এই পালাগানের নাটককারও বটে। তার হাতে পড়ে রামায়ণের কাহিনী ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে যায়। সীতাহরণ দিয়েই নাট্য কাহিনির শুরু। তবে সীতা উদ্ধারে এই নাটকে হনুমান নয়, হনুমতী ঢুকে পড়ে অশোককাননে। নাটককার মনোজ মিত্রের যুক্তি বুদ্ধিমান থেকে বুদ্ধিমতী হয় কিংবা শ্রীমান থেকে শ্রীমতী। তাহলে হনুমানের স্ত্রীলিঙ্গ হনুমতী হবে না কেন? তাছাড়া নারীর বেদনা তো আর এক নারীই বুঝতে পারে। হনুমতী তাই সহজেই অশ্রুসজল সীতাকে বুঝতে পারে, চিনতে পারে। পাশাপাশি

উপলব্ধি করে লঙ্কার অন্দরমহলে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী, কুম্ভকর্ণের স্ত্রী বজ্রবালা ও বিভীষণের স্ত্রী সরমা—এই তিন নারীও সীতার মতো ভাগ্যহীনা, অবহেলিতা। কেননা মন্দোদরীর স্বামী নারীলোলুপ, পরস্ত্রী হরণকারী—এই বদনাম বয়ে বেড়াতে হয়। ব্রজবালার পতি কুম্ভকর্ণ ছয় মাস গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। আর সরমার স্বামী বিভীষণ ঘরভেদি বিভীষণ, যোগ দিয়েছে স্বর্ণলঙ্কার শত্রু রামের পক্ষে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। রামায়ণের কালের সঙ্গে আজকের সময়ের সেতু তৈরি করেন নাট্যকার। আর নির্যাতিতা নারীর সুখদুঃখের সাথী হয়ে যায় মামা কালনেমী। সে আবার কন্যার পিতা হয়েছে। সে নেই কন্যাকে কোথায় রাখবে? কোন পরিবেশে তাকে লালিত পালিত করবে? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সব নারীরই যে শোচনীয় অবস্থা। হনুমতী তাই সীতা, মন্দোদরী, ব্রজবালা, সরমা ও শিশুকন্যাকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকায় চড়ে যাত্রা করে এমন এক দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে পুরুষের আধিপত্যবাদ থাকবে না, নারী স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে। পঞ্চকন্যার ময়ূরপঙ্খি নাও যখন পাল তুলে যাত্রা করেছে, তখন ভেসে আসে গান—''ও আকাশ ও পারাবার/অসীম অপার/বলো এবার/আমি কবে হব আমার।" নারী অন্য কারও সম্পত্তি নয়; নারী নারীরই—এ বার্তা দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে।

মনোজ মিত্র নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে দস্যু রত্নাকরের রামায়ণ পাক্কা সিঁধেল চোর মাধবচন্দ্রের হাতে পড়ে হলো কিনা ছাক্কা মশলাদার শিককাবাব। নাটক পাঠে এই বোধে উন্নীত হওয়া যায় যে ফ্যান্টাসি আর রূঢ় বাস্তবের মশলার মিশেল ঘটেছে নাট্যদেহ জুড়ে। সুন্দরম প্রযোজিত, মনোজ মিত্র নির্দেশিত 'আশ্চৌয ফান্টুসি' নাটকটি দেখে রিভিউ করতে গিয়ে লিখেছিলাম :

"প্রযোজনাটি ফ্যান্টাসিতর জগৎ থেকে বাস্তবে, বাস্তবের দুঃখ থেকে মজায়, মজা থেকে কান্নায়, সাধারণ থেকে গভীরতায় পৌঁছে দেয় দর্শককে। নাটক শেষে কল্পনার ডানায় ভর করে আমরা চলে যাই রূপকথার জগতে। যে জগৎ নারীর শিকল ভাঙার জগৎ, বাঁধন হারার জগৎ, যে জগৎ নারীর একান্তই নিজের। যে জগতের খোঁজ করে চলেছে নারী আজও"।[৫]

—এ নাটক রামায়ণের কাহিনির মোড়কে আবহমান রূঢ় বাস্তবের নগ্ন ছবি। এ নাটক ছোটোদের আনন্দ দেয় রামায়ণের চেনা চরিত্র, জানা ঘটনাগুলির কারণে। ফ্যান্টসির মজাদার মশালায় ছোটোরা আনন্দ পায়। পক্ষান্তরে এ নাটক রামায়ণের অন্য যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায়, নারীর জীবন যন্ত্রণার প্রশ্নে কাটা ঘায়ে লবণ ছিটে দেওয়া ব্যঙ্গের কারণে বড়োদের ভাবায়।

মনোজ মিত্রের মহাভারত রামায়ণকে আশ্রয় করে লেখা নাটকগুলি এককথায় গভীর মননের ও জিজ্ঞাসার। রামায়ণ-মহাভারতের চেনা আখ্যানকে তিনি তাঁর মেধা, মনন, রসিকতার মাধ্যমে নিজের মনমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন। তারপর সেই আখ্যানগুলিতে সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের মানসিকতা, দ্বন্দ্ববেদনা ও লড়াইসংগ্রাম।

মহাভারত-রামায়ণের বিষয় নিয়ে আধুনিক জীবনের ভাষ্য রচনা করেছেন আলোচ্য নাটকগুলিতে। রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক নাটকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারতের হীরে মানিকজ্বলা চরিত্রগুলির পাশাপাশি আমাদের ঘরে ছেঁড়া-ত্যানা কাঁথায় মোড়া সাধারণ চরিত্রগুলিও স্থান পেয়েছে। প্রতিটি চরিত্রই যেন তাদের ভিন্নতা নিয়ে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে, গোটা জীবনটা নিয়েই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নাটকগুলি পড়তে পড়তে আমাদের অজান্তে, অলক্ষিতে অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে তাঁদের এক একটি জীবনছবি। অথচ তাদের বিষয়, প্লট, চরিত্র, আলাদা আলাদা। তারা আলাদাভাবেই তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে। আলাদা করেই পূরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মোড়ক উন্মোচন করে কঠোর কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের লড়াইয়ের ভাষা আলাদা। তারা যে সমাজের কথা বলে, যে জীবনের কথা বলে তার সুর ভিন্ন ভিন্ন। তবু তাদের বিচিত্র, বর্ণময় জীবন প্রবাহের নানা ওঠাপড়া, ভাঙন, সংগ্রাম আমাদের মুগ্ধ, মুগ্ধ করে। বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা আখ্যানগুলি সময়ের অমোঘ প্রহর সহ্য করেও জেগে থাকে আমাদের অন্তরে, আমাদের বোধের গভীরে। ফলে গতিশীল সময়ের ও দ্রুত পাল্টে যাওয়ার সমাজের অভিঘাতেও আলোচ্য নাটকগুলিকে সেকেলে মনে হয় না। মনে হয় সমকালীন সময়ের প্রতিবিম্ব হয়েও উত্তরকালের বা বর্তমানকালের প্রতিনিধিত্ব করছে। চিরপরিচয়ের মাঝে নবপরিচয় হয়ে বেঁচে আছে নাটকগুলি। বেঁচে থাকবেও সর্বকালীন বিশেষণে ভূষিত হয়ে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'অথবা বাঞ্ছারাম', দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নেওয়া সাক্ষাৎকার—মনোজ মিত্রে ৭৫ বছর বয়সে, 'ছুটি', সংবাদ প্রতিদিন, রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৩

২। 'কিছু লোক, কিছু নাটক', 'বাংলা নাট্য : হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', মনোজ মিত্র, ২০০১, পৃ: ১৮।

৩। 'মুখবন্ধ: ভেলায় ভাসে সীতা', শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মনোজ মিত্র: নানা বর্ণে, নানা রঙে' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, দিয়া পাবলিকেশন, জুন, ২০০২, পৃ:৩৭।

৫। 'তথ্যকেন্দ্র পত্রিকা', সম্পাদক-মঞ্জুশ্রী তালুদার, মে, ২০১৩, পৃ: ৬৬

জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র
বুদ্ধদেব থেকে মনোজ মিত্র : এক আশ্চর্য জীবন

"আমি ছোটবেলা থেকেই লিখতাম। স্কুলে পড়াকালীন আমার লেখা গল্প 'বসুমতী', 'মন্দিরা'র মতো তখনকার দিনের জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাবতাম আমি গল্পকার হব, কিন্তু হঠাৎই ঘুরে যায় জীবনের মোড়।"[১] গল্পকার নয়, আমরা পাই একালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার মনোজ মিত্রকে। শুধু নাট্যকার? তাও নয়, অভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও শিক্ষক মনোজ মিত্রও ছিলেন সমান জনপ্রিয়।

বুদ্ধদেবের ছেলেবেলা :

২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ মনোজ মিত্রের জন্ম হয় বাংলাদেশের খুলনা জেলার ধুলিহরে। পিতা অশোক মিত্র ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের পন্ডিত। পেশায় আদালতের বিচারক। মা রাধারানী দেবী সাধারণ গৃহবধূ। মনোজ মিত্র ছিলেন চার ভাই বোন। মনোজ মিত্র, উদয়ন মিত্র, অমর মিত্র ও অপর্ণা সাহা। মনোজ মিত্র সবার বড়ো। ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল 'বুদ্ধদেব'। পিতার বদলির চাকরির কারণে শৈশবের আটটা বছর তিনি পিতা-মাতার খুব একটা সান্নিধ্য পাননি। শৈশবের অনেকটা সময় তাঁর কেটেছে ঠাকুরদা অন্নদাচরণ মিত্র ও ঠাকুমা হেমলনিনীর কাছে। ঠাকুমা হেমলনিনী ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের। মাদার পন্ডিতের কাছে হাতেখড়ি। নামতা পড়া থেকে ধারাপাত পর্যন্ত ছিল তাঁর এক্তিয়ারে। কিন্তু পড়াশোনায় মন ছিল না ছোট্ট বুদ্ধদেবের। মাদার পন্ডিতের বাজখাঁই গলা শুনলেই নাতিকে কোলে বসিয়ে ঠাকুমা শুরু করে দিতেন তার বাল্যের কথা, বাপের বাড়ির কথা, যৌবনের কথা, বাপের বাড়ির প্রতিবেশীদের কথা—কার সুখ কার দুঃখ, কার কী সমস্যা সব। লেখাপড়ার বহর দেখে পিতা অশোক মিত্র সিদ্ধান্ত নেন ছেলেকে নিজের কাছে রাখবেন। ১৯৪৬ সালে আট বছর বয়সে ধুলিহর ছেড়ে বাবা মায়ের কাছে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে যান ছোট্ট মনোজ। কিন্তু শৈশবের ধুলিহরের স্মৃতি কখনো ভুলে যাননি। ৮০ বছর বয়সেও গড়গড় করে বলেছিলেন—"ধুলিহরের আমাদের বাড়িটা ছিল হাটখোলা। সকালবেলায় কিছুতেই আন্দাজ করা যেত না কতগুলো পাতা পড়বে আজ দুপুরে। কে যে কখন আসছে যাচ্ছে, কোন হিসাব নেই। কাছে দূরের কিছু আত্মীয়, অনাত্মীয় এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। স্থায়ীদের মধ্যে ছিলেন স্কুলের মাস্টারমশাই, পুরুত ঠাকুর মশাই, ঠাকুরদার নায়েব, গোমস্তা। ছিল নিত্য দিনের অতিথি সমাগম। নদীর ওপারের চাষি প্রজারা আসত। ফাল্গুনে—চৈত্রে এমন কিছু ব্যক্তি আসতেন, যাদের সঙ্গে ঠিক কী যে সম্পর্ক আমাদের বুঝতাম না। এঁরা প্রপিতামহ যাদবচন্দ্রের আমলের দান অনুদান প্রাপকের বংশধর। কারো নামে ধানের জমি, কারো নামে গাছপালা চিহ্নিত করা আছে। ফসল সংগ্রহ করতে আসতেন এঁরা, কেউ কেউ সপরিবারে ফল পাকুড়, ধানচাল বেচাকেনা করতে দু-তিন মাস কাটিয়ে দিতেন।"[২]

সিরাজগঞ্জে নতুন মাস্টার :

সিরাজগঞ্জে গিয়ে মনোজ মিত্র পেলেন এক নতুন মাস্টার। সুশ্রী শিক্ষিত যুবক। তাঁর অংক শেখানোর পদ্ধতি ছিল ছড়ায় ছড়ায়। চমৎকার লেগেছিল মনোজের। কিন্তু পড়াতে এসেছিলেন মাত্র একদিনেই। "কাহিনীভিত্তিক অংক পেয়ে আমি চমৎকৃত। নিছক সংখ্যা ভিত্তিক সরল করা গ.সা.গু. ল.সা.গু. আমার ভালো লাগতো না মোটেই। পরের দিন বিকেল থেকে মাস্টারমশাইয়ের জন্য সেজেগুজে বসে রইলাম। না জানি মাস্টারমশাই আরো কত রহস্যময় ছড়া শেখাবেন। মাস্টার মশাই কিন্তু এলেন না। পরদিনও না। মাকে জিজ্ঞেস করলে মা চুপ করে থাকে। দিন কয় পরে কি করে যেন জানতে পারলাম, আমার অংক শেখানোর পরের দিন তিনি পাগলা গারদে ভর্তি হয়েছেন।[৩]" কথাগুলো বলেছিলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। সিরাজগঞ্জ থেকে পিতা অশোক মিত্র বদলি হয়ে যান ময়মনসিং জেলার ঘাটাইল। মনোজ মিত্রের এখানের একটি স্মৃতি উজ্জ্বল। ৪২-এর মন্বন্তরে চাষীরা যখন ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে মহাজনদের হাতে নিঃস্ব হয়ে পড়ছিল—তখন এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করেছিল ঋণ-সালিসি বোর্ড। একজোড়া আদালি, একজোড়া করণিক, একজোড়া দেহরক্ষী নিয়ে ভ্রাম্যমান কোর্টের বিচারক ছিলেন অশোক মিত্র। অশোক মিত্রের এক কলমের খোঁচায় দরিদ্র কৃষকরা ঋণ মুক্ত হয়। কিন্তু মহাজনরা চটে যায় বিচারকের ওপর। বিচারক অশোক মিত্রকে রক্ষা করে দরিদ্র মুসলমান কৃষকরা।

রঙিন ছাতা হারিয়ে গেল :

১২ বছর বয়স পর্যন্ত মনোজ মিত্র স্কুলের মুখ দেখেননি। ঘাটাইলে জুটেছিল এক নতুন মাস্টার।

নাম পটুবাবু। পটুবাবু দু'বার পড়াতে আসতেন। সকাল সন্ধ্যা। একবেলা ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, আর একবেলা ইতিহাস, মনীষীদের জীবনী। পটুবাবু চমৎকার গান গাইতেন। "চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পরে আলো" চমৎকার লাগতো তাঁর গলায়। '৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট অশোক মিত্র স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ময়মনসিংহের কালিহাতি ছাড়েন। মনোজ মিত্র লিখছেন "'৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট আমরা ময়মনসিংহ ছাড়ি। সেদিন খুলনা জেলা ছিল ভারতে। ১৭ই আগস্ট আমরা যখন স্বাধীন ভারতের খুলনা জেলার পথে স্টিমারে, খবর এলো খুলনা গেছে পাকিস্তানে। পরিবর্তে ভারত পেয়েছে পাকিস্তানের মুর্শিদাবাদ। বাড়া ভাতে ছাই পড়লো আমাদের। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে মা আমায় একটা রঙিন ছাতা কিনে দিয়েছিল। স্টিমারে সেটা হারাই। সেই থেকে ছাতা হারানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আরো তিন বছর আমরা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম। ঢাকার ভারতীয় হাই

কমিশনে কর্মরত। পঞ্চাশে চলে এলাম এপারে। এপারের মাটিতে পা রাখতেই আমার ছোট্টবেলাটা হারিয়ে গেল আচমকা।”[৪]

এলেম নতুন দেশে :

দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে মেজকাকা, ঠাকুরদা, ঠাকুমার সাথে ১২ বছরের মনোজ এদেশে পা রাখেন। প্রথমে ভর্তি হন 'ট্যাংরা ভূতনাথ মহামায়া ইনস্টিটিউশন'এ। তিন মাস এখানে থাকার পর চলে যেতে হয় উত্তর ২৪ পরগনার দন্ডিরহাট। এখানে দণ্ডিরহাট নগেন্দ্র কুমার উচ্চ শিক্ষা নিকেতনে'র সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে শিক্ষক হিসেবে পান সুধীর বসুকে। তাঁর সান্নিধ্য কিশোর মনোজকে শিল্প সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী করে তোলে। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিদ্যালয়ের হাতে লেখা পত্রিকা 'কল্পনা'য় 'বাঁশির সুর' গল্প লিখে প্রথম সকলের নজর কাড়েন। “বিচিত্র সমাদর জুটে ছিল গল্পকারের। হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসতে ডাকলেন। গায়ের বকুলতলায় নিত্য গাঁয়ে এলিয়ে হুকোটানা ছাড়া আর কোন কর্ম দেখেনি যাকে, সেই অশিতিপর কাছে ডেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বিস্তর আশীর্বাদ জানিয়ে সঙ্গীদের জানিয়ে দিলেন—বড় হয়ে একদিন সরকারি চাকুরি করবেই করবে। জনবিরল পথে পাড়ার এক দিদি হাত নেড়ে কাছে ডেকে চোখ পাকায়, হ্যাঁরে জানালায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চেয়ে বউটা কি ভাবছিল রে? তোকে সে বলেছে, নাকি কারো লেখা থেকে টুকে লাগিয়েছিস?—তখনকার মত দৌড়ে বাঁচি। সুধীর মাস্টারমশাইকে কথাটা বলতে তিনি তক্ষুনি একবাক্যে উড়িয়ে দিলেন—“আরে টুকলে যেমন দোষ, আবার জায়গা মতো সেটা বসাতে পারলে দোষ—গুণের ঊর্ধে চলে গেল। ওটা তখন ডেকোরেশন। “পিঠ চাপড়ে দিলেন মাস্টারমশাই -“লেখা ভালো হয়েছে, আরো লেখো”।[৫] যার জন্য এই উৎসাহ মনোজ মিত্রকে লেখার নেশা ধরিয়েছে। স্কুলে পড়াকালীন মনোজ মিত্র 'বসুমতী', 'মন্দিরা', 'যুগান্তর', 'ছোটদের পাততাড়ি' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প লেখেন। কিন্তু সবটাই বাবাকে লুকিয়ে। অশোক চাইতেন না ছেলে লেখক হোক, থিয়েটার নাটকে অভিনয় করুক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য “ওসব গল্পটল্প লেখালেখি করে কিছু হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্যের ওপর আমার অত বইপত্র রয়েছে সে সব পড়। জাতক কাহিনি, উপনিষদের কাহিনি পড়। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুলের কবিতা পড়। মনীষীদের জীবন পড়।”[৬]

থিয়েটারে নতুন নেশা :

তখন মনোজ মিত্র ক্লাস নাইন। বাবার কড়া আদেশ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগে গল্প লিখে পৃথিবীর জল আর ঘোলা করা যাবে না। কিন্তু তখন শুধু গল্প লেখা নয়, নতুন করে পেয়ে বসেছে থিয়েটারে অভিনয়ের নেশা। 'দন্ডিরহাট বান্ধব নাট্য সমাজ'—এ মনোজ মিত্রের আনাগোনা শুরু হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি হাজির থাকতেন রিহার্সালে। কাজ নিয়েছিলেন প্রম্পটারের। নাট্যকার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, “মহড়ায় প্রম্পটারের কাজটা

ভারী পছন্দ হয়েছিল আমার। সব চাইতে সংলাপ পরপর বলে গেলে ক'দিনের মধ্যে দেখা যাবে প্রম্পটারের গলায় চরিত্রগত এবং পরিস্থিতিগত সব ঐক্য ধরা পড়ছে। বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ ভঙ্গি, স্বর সংঘাত, কণ্ঠে তীব্রতা, উদাত্ততা বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দের এবং বাক্যের ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা স্পষ্ট হচ্ছে। প্রবীন সুধীর বসু, সতীদুলাল বসুরা বলতেন, তুমি বই ধরো। অরুণদা বলতেন, আমার কিন্তু একটুও মুখস্থ নেই, শুধু কথা শোনালে হবে না ভাই, চরিত্রটাও ধরিয়ে দিতে হবে। আমার গলায় তখন চরিত্রের রাগ অনুরাগ, ভয়-ত্রাস, ভালোবাসা দৌর্দণ্ডপ্রতাপ আবেগের পাশে সূক্ষ্ম হালকা-পলকা অনুভূতিগুলোও বারবার পড়তে পড়তে আপনা থেকে ভেসে উঠছে। ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয়ের চেয়েও এই যে কি উপভোগের হয়ে উঠেছিল আমার কাছে।"[৭] মনোজের নতুন ভালোবাসা জন্মালো থিয়েটারে। দন্ডিরহাট স্কুলে পড়াকালীন কিশোর মনোজ প্রথম মঞ্চে পা রাখেন। অভিনয় করেন 'রোগের চিকিৎসা', 'মুকুট', 'ডাকঘর', 'হলদিঘাট', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'অবাক জলপান', 'সিরাজের স্বপ্ন'-এর মতো ছোটদের নাটকে। বাড়ির বড়োরা কেউ কোনদিন অভিনয় না করলেও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মনোজ মিত্র লিখেছেন : "পূর্ব পাকিস্তানের ধুলিহরে আমাদের ফেলে আসা গ্রামেও শরৎ ও বসন্তকালে বছরে ৩-৪ রাত্রি থিয়েটার হতো। সেদিন এই কিন্তু ছিল ঢের। এই নিয়ে সারা বছর অঞ্চলটা মুখর থাকতো। বাক্স-বোঝাই রাজ-পোশাক, নবাব পোশাক, সাহেবী হ্যাট-কোর্ট বকলস, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, খাড়া, নকল বন্দুক, ঢাল তলোয়ার থাকতো আমাদের একটা ঘরে। তা বলে আমার বাবা, কাকা, ঠাকুরদার কোন পুরুষে কেউ কোনোদিন মুখে রঙ মাখেননি। থিয়েটার দেখা দূরের কথা, নাম শুনলে মুখ হাঁড়ি হয়ে যেত তাঁদের। আমাদের চন্ডীমন্ডপে উঠোনে স্টেজ বাঁধা হতো। সেদিকে ঘোরাঘুরিরও অনুমতি ছিল না। স্রেফ সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই ওদেশে আমাদের পরিবারটিকে থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হতো। নইলে সিনেমা, কী থিয়েটারে তাঁদের এতটাই বিপ্রকর্ষণ, জীবতকালে বাবা, কাকারা কেউই একেবারে জন্যও আমার একটি অভিনয়ও দেখে যান নি।"[৮]

২৭ বি ইন্দ্র বিশ্বাস রোড :

১৯৫৪ সাল মনোজ মিত্ররা সপরিবারে দন্ডীরহাট ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ঠিকানা ২৭ বি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। ভাড়া বাড়ি। মনোজ মিত্রর কথায় "সেই বাসাবাড়িতে তিনখানা ঘর, তিনখানা ঘরে ৩০ জন মানুষ। এই ২৭ / বি বাবার কলকাতার বাসা বাড়িতে ৩০ জন হলো কি করে? কেন, বাবার মাসতুতো ভাই, মামাতো ভাই আমার বড় মামা, মেজ মামা, ধুলিহরের আরও কেউ কেউ, যারা ওপারে আমাদের পরিবারের কেউ না, আলাদা পরিবার, তারা সেন বাড়ি, ধর বাড়ির কেউ কেউ ঢুকে পড়েছে সাতাশের বি-তে। যৌথ পরিবার মস্ত হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে ফণিবাবু এসে ঢুকেছেন, এই অনেক লোকের

বাসাবাড়িতে, তিনি আমার মেজকাকার বন্ধু, তিনকুলে কেউ নেই। ফণিবাবুকে নিয়ে একটা নাটক আছে আমার। 'পরবাস' নাটকে অন্য নামে আছেন তিনি।"[৯] এখানে এসে মনোজ কুমার মিত্র ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে। শিক্ষক হিসেবে পান বিপিনচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস ভট্টাচার্য, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অধ্যাপকদের। এই কলেজেই বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, নৃপেন্দ্র সাহা, দেবকুমার ভট্টাচার্য, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অতনু সর্বাধিকারী, কেয়া চক্রবর্তীদের। স্কটিশ চার্চ কলেজের বহুকাল থেকেই সাহিত্যচর্চায় ছিল উচ্চ স্থান। এই কলেজ থেকেই মনোজ মিত্র আনন্দ বাগচি, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'মহুয়া' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'বেতনার চর' আর 'বাঁশি' গল্প সেকালে পাঠকদের নজর কেড়েছিল। 'যাত্রী' নামে একটা ছোটগল্পের পত্রিকা চালাতেন বিজিত দত্ত, সুভদ্র সেন, নৃপেন্দ্র সাহা। মনোজ মিত্র তাঁদেরও সঙ্গী ছিলেন। শিকড়, নেশা নামের গল্প দুটো ওখানে প্রকাশ পায়। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় ১৯৫৮ সালে 'অন্যস্বর' নামে একটি গল্প সংকলনের সম্পাদনাও করেছিলেন। মনোজ মিত্র কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকেন। তাঁর ভাষায় "ভাবতাম আমি গল্পকার এই হব, কিন্তু হঠাৎই ঘুরে যায় জীবনের মোড়। কলেজে তখন আমার সমসাময়িক অনেকেরই নাটকের প্রতি প্রবল উৎসাহ। প্রেরণাদাতারা ছিলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, গুরুদাস ভট্টাচার্যের মত অধ্যাপকরা।"[১০] ১৯৫৪ সালে কলেজে পড়াকালীন সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কলেজ সোস্যালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই—তো' নাটকে মনোজ মিত্র নায়িকার ভূমিকার অভিনয় করেন। এই নাটকে তাঁর অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

'সুন্দরম' পথ চলা শুরু :

যখন বহুরূপী, এল. টি. জি, রূপকার, থিয়েটার ইউনিট, থিয়েটার সেন্টার, শৌভনিক গ্রুপ থিয়েটারে নতুন জোয়ার এনেছে। কলকাতায় এক নতুন নাট্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় পার্থপ্রতিম চৌধুরী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মনোজ মিত্ররা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা নাটকের দল গড়েন। শ্যামবাজারের মোড়ে বাজার বাড়ির মাথায় একটা ঘর দিন চুক্তিতে ভাড়া নিয়ে। ১৫ ই আগস্ট, ১৯৫৭ দলের কাজকর্ম শুরু হয়। দলের প্যাডে লেখা হলো 'জীবন ছোট কিন্তু শিল্প বড়'। পার্থপ্রতিম দলের নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'পথের পাঁচালি'। মনোজ মিত্র বললেন 'উলুখাগড়া'। কিন্তু শেষমেশ পার্থপ্রতিম চৌধুরীর বাবা বিশ্বনাথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় নাম হয় 'সুন্দরম'। তার মনে ছিল 'বন্ধু শুভঠাকুরের শিল্প সৌন্দর্য তত্ত্বের প্রবন্ধ পত্রিকাটি নাম 'সুন্দরম'। চমৎকার নাম। সকলের সম্মতিতে দলের নাম হলো 'সুন্দরম'। প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। সভাপতি বিশ্বনাথ চৌধুরী। ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ 'বিশ্বরূপা'য় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'পথের পাঁচালি' নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে 'সুন্দরম'-এর পথচলা শুরু। মনোজ মিত্র সেদিনের

ঘটনার কথা জানিয়ে লিখেছেন, "প্রথম ও শেষ সেই একটি রাত্রে একবারের জন্য বিশ্বরূপা মঞ্চে কাশবনের মধ্য দিয়ে রেল গাড়ি ছুটেছিল। ছোট্ট অপু টেলিগ্রামের পোস্টেও কান পেতেছিল। অধুনালুপ্ত 'বিশ্বরূপা'য় 'সেতু' নাটকে রেল গাড়ি ছুটিয়ে ছিলেন তাপস সেন। তার ঢের আগেই তাপসদারই হাতে 'সুন্দরম-এর কু-ঝিকঝিক ছোট্ট রেলগাড়ি হামাগুড়ি দিয়েছিল অধুনালুপ্ত ওই 'বিশ্বরূপা'তেই।"[১১] ওই বছরেই মঞ্চস্থ হয় অতনু সর্বাধিকারীর 'সিঁড়ি' নাটক। নির্দেশনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী। অভিনয়ে মনোজ মিত্র, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, রত্না গোস্বামী। আমরা নাট্যকার মনোজ মিত্রকে পেলাম ১৯৫৯ সালে। মনোজ মিত্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দর্শনের ছাত্র। 'সুন্দরম' ঠিক করে তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার' একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। ঠিক ছিল অতনু সর্বাধিকারীর 'সিঁড়ি' নাটকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। কিন্তু দলের কাজকর্মের প্রতি গোঁসা হওয়ায় তিনি নাটকটি তুলে নেন। দশ দিন বাদে নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা, অথচ হাতে নাটক নেই। মনোজ মিত্র একরাত্রি জেগে একটা নাটক লিখলেন। নাম 'মৃত্যুর চোখে জল'। মনোজ মিত্রর কথায়—"গত শতকের ইংরেজি পঞ্চাশের দশকের শেষ বছরে ছাত্র অবস্থায় একরাত্রি জেগে একটা ছোট নাটক লিখে ফেলেছিলাম 'মৃত্যুর চোখে জল'। খানিকটা আমাদের সদ্য গঠিত দল 'সুন্দরম'-এর প্রয়োজনে, খানিকটা আমার পরিবারের অতি চেনা কিছু ব্যক্তির জীবন মঞ্চের উপর তুলে দেখাবো বলে।"[১২] নাটকটি তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার' একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পায়। বৃদ্ধ বঙ্কিম চরিত্রে অভিনয় করে একুশ বছরের মনোজ সেরা অভিনেতা হন। বিচারক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। নাটক শেষে তিনি মনোজ মিত্রকে বলেছিলেন "বড় আশ্চর্য হয়েছি, আজ তোমার গুণে নয় বাপু, দোষে। আমাদের কালের বাঘা বাঘা অভিনেতাকে দেখেছি, তাঁরা নিজের নিজের সংলাপের মূল আবেগ থেকে ধরে নিয়ে গলায় পোষা সাপটিকে লেলিয়ে দিতেন। সবাই ভাবে সংলাপটা কেবল দর্শককে শোনাতে। তা কিন্তু নয়। যে বলছে সে নিজেও কিন্তু শুনছে। শুনছে বলে এই কথাটা তার নিজের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। করবেই। তখনই মনের ভাব অনুভবের পরিবর্তন ঘটবে, অভিব্যক্তিরও বদল ঘটবে। আচ্ছা, তুমি স্মৃতি থেকে যে কোন ঘটনা আমাকে শোনাও—দেখবে, বলতে বলতে তোমার বাইরের ভাবভঙ্গি কণ্ঠস্বর এবং অন্তর্জগত কেমন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে বদলে যাচ্ছে।"[১৩]

দল ভাঙে, দল গড়ে :

মনোজ মিত্রের 'মৃত্যুর চোখে জল' ১৯৫৯ নাগাদ সারা বাংলা জুড়ে প্রচার পায়। 'সুন্দরম' পরিচিতি পায়। কিন্তু হঠাৎ ১৯৬০ সাল নাগাদ 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী ভেঙে যায়। মনোজ মিত্র, অতনু সর্বাধিকারীরা দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এজন্য মনোজ দায়ী করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আত্মপ্রেমকে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য "সাংগঠনিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল ওর। না হলে দলের সভাপতি আর কোষাধ্যক্ষের পদ দুটিতে

বাবা-মাকে বসাবে কেন? দলের মধ্যে তাঁরা ছিলেন অলংকরণ আলপনা হয়ে। কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না দুজনের। দেখেছি যে দলে যত নিষ্ক্রিয় অনুরাগের ভিড়, সে দল তত অথর্ব হয়েছে।"[১৪] ১৯৬০ সাল নাগাদ মনোজ মিত্র 'সুন্দরম' ছেড়ে যোগ দেন শ্যামল ঘোষের 'গন্ধর্ব'তে। এই 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মনোজের 'মোরগের ডাক', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'মহাত্মা' নাটক। 'গন্ধর্ব'তে মনোজ মিত্রের বেশি দিন থাকা হয়নি। ওই বছর মনোজ মিত্র চাকরি পান সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে-এ। কিন্তু তাঁর মন টেকেনি। কলেজে যোগদানের একদিন পর থিয়েটারের টানে কাউকে না জানিয়ে বন্ধু অতনু সর্বাধিকারীর সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। "ভোরবেলা তখনো কারোর ঘুম ভাঙেনি মাঠের কিনারে মস্ত এক ক্যাওড়া গাছের বাসা থেকে ঝাঁক ঝাঁক বক দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে। হঠাৎ কলকাতার জন্য মন কেমন করে উঠল। আমি অতনুর রিক্সায় উঠলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে কলকাতার পথ ধরলাম।"[১৫] সিউড়ির পর মনোজ মিত্র চাকরি পান মগরা কলেজে। কিন্তু মগরা কলেজে চাকরি করতে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না পিতা অশোক মিত্রের। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে চাকরির এ্যপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন পিতা অশোক মিত্র; চেয়েছিলেন ছেলের থিয়েটারের ভূতটা ঘাড় থেকে নামাতে। কলকাতা থেকে ভাগাতে। তাঁর ধারণা ছিল কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে থিয়েটারটা চালিয়ে যেতে পারে পুত্র মনোজ।

১৯৬১ সালে মনোজ মিত্র চাকরি পান রানীগঞ্জ ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজে। ২৩ বছরের মনোজ কলকাতা ছেড়ে, থিয়েটার ছেড়ে, অভিনয়ের সুযোগ ছেড়ে রানীগঞ্জ কলেজে যোগদান করেন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে। অধ্যাপনার সঙ্গে শুরু হয় গবেষণার কাজ। বিষয় "Ethical Scepticism"। কিন্তু গবেষণায় মন টেকেনি। তিন বছর পর ১৯৬৪ সাল নাগাদ রানীগঞ্জে নাট্যকার মন্মথ রায় এলে, মনোজ মিত্র তাঁর কাছে থিয়েটারে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাণীগঞ্জ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। যোগ দেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ-এ। এক বছর অধ্যাপনার পর চলে যান নিউ আলিপুর কলেজে। ১৯৬৫ তে গড়ে তোলেন নিজের নাট্যদল 'ঋতায়ণ'।

'ঋতায়ণ' বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা করে—'অবসন্ন', 'প্রজাপতি', 'নীলা', 'আরক্ত' 'গোলাপ', 'সিংহদ্বার', 'কাল বিহঙ্গ', 'নেকড়ে', 'কামধনু' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তবে 'ঋতায়ণ' বেশিদিন টেকেনি। ১৯৭০ সালে সভা ডেকে একদিন দলের সমাধি ঘোষণা করেছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মনোজ মিত্র। মাঝখানে (১৯৬৭ - ১৯৬৯) সাধনকুমার ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে 'শিল্পে রূপ সর্বস্বতাবাদ' নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেও সাধনবাবুর অকাল প্রয়াণে গবেষণায় চিরতরে ছেদ পড়ে। এর মধ্যে অভিনেতা মনোজ মিত্র 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর', 'কাল বিহঙ্গ', 'নেকড়ে', 'কামধেনু', 'চাকভাঙা মধু',

'কোথায় যাবো', 'পরবাস', 'বাবা বদল', 'কেনারাম বেচারাম'-এর মতো নাটক লিখে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ ও মনোজ মিত্র :

১৯৭০ সালের কন্যা ময়ূরীর জন্ম। মনোজ মিত্র তখন কোনো দলে নেই। নাটক লেখায় ব্যস্ত। 'সুন্দরম' এর অবস্থা ছন্নছাড়া। মনোজ পর পর লিখছেন 'চাকভাঙা মধু', 'অশ্বত্থামা', 'নরক গুলজার', 'সাজানো বাগান'-এর মতো ব্যতিক্রমী সব নাটক। 'চাক ভাঙামধু' নাটক পড়ে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ইচ্ছা হয়েছিল এই নাটক মঞ্চস্থ করে 'সুন্দরম' এর হাল ফেরাতে। পার্থপ্রতিম এই নাটকের জন্য কালি ব্যানার্জি, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেনের মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাস্ট করলেন। দলের ছেলেরা পার্ট না পেয়ে দল ত্যাগ করল। মহলা শুরু হলেও অধিকাংশ শিল্পীরা অনুপস্থিত। একমাত্র অপর্ণা সেন প্রতিদিন আসতেন। বাকিরা অনিয়মিত। সুন্দরম-এ শেষ পর্যন্ত 'চাকভাঙা মধু' হলো না। বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'চাকভাঙা মধু' মঞ্চস্থ করে। থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনা বাংলা মঞ্চ-নাটকে মিথ হয়ে ওঠে। অভিনয় করেছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ। মায়া ঘোষের 'বাদামী'র অভিনয় দেখে অপর্ণা সেন বলছিলেন, "অন্তর থেকে বলছি মায়া ঘোষের বাদামীর মতো হত না আমার বাদামী। নাটকটা বেঁচে গেল।" থিয়েটার ওয়ার্কশপ ১৯৭৪-তে করে 'অশ্বত্থামা'। কৃতবর্মা চরিত্রে মনোজ মিত্র অভিনয় করেন। নাটকটি 'বহুরূপী'র শারদ সংখ্যায় পরিমার্জিত হয়ে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর নাট্যনির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর হাতে এলো মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার'। নাটকটি পুরাণের আবরণে রাজনৈতিক স্যাটায়ার।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৬ আকাদেমি নাট্যমঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে ১৯৮৭-তে বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনাতেই 'ওয়ান ওয়াল থিয়েটার'-এ তিন দিক খোলা মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। ব্রহ্মা চরিত্রে অসাধারণ কৌতুকাভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনেক পরে 'আত্মগোপন' নাটকটি প্রযোজনা করে। মানব সম্পর্ক ও মূল্যবোধের দায় নিয়ে নাটকটিতে নাট্যকার দেখিয়েছেন ক্রিকেটের গড়াপেটার চেনা ছকে বাংলার ফুটবল খুব একটা কলঙ্ক মুক্ত নয়। এক অন্য স্বাদের নাটক। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় নাটকটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ করে 'পালিয়ে বেড়ায়'। যার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল "পাওয়া হারানোয় হারিয়ে পাওয়ার মধুর গভীর জীবন নাট্য "। নির্দেশক ছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়।

"সুন্দরম"-এর হাল ধরলেন মনোজ মিত্র :

'৭২ থেকে' ৭৫ 'সুন্দরম' তালা বন্ধ ছিল। '৭৫ সালে সব আবর্জনা পরিষ্কার করে দুলাল ঘোষকে সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে মনোজ মিত্র 'পরবাস' নাটক নিয়ে মঞ্চে ফেরেন। প্রায় ডুবে যাওয়া সুন্দরম বাংলা থিয়েটারে নতুন করে জায়গা করে নিল এই নাটক থেকেই।

প্রবীণ গজমাধব চরিত্রে মনোজ মিত্রের অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নিল। পরের বছর 'সাজানো বাগান'। বাঞ্ছারাম চরিত্র তাঁকে অভিনেতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দিল।

'মৃত্যুর চোখে জল'-এর বঙ্কিম, যেন 'সাজানো বাগান' নাটক এ নতুনরূপে ধরা দিল বাঞ্ছারাম হয়ে। বঙ্কিম বাঁচতে চেয়েছিল। বুড়ো চাষী বাঞ্ছা দুমড়ে যেতে যেতে যেন সিধে হয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো মৃত্যুর বিপক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে। পুরাণকে আশ্রয় করে কল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে সত্তর দশকের অস্থির সময়কে রূপকের আড়ালে রেখে রচনা করলেন 'মেষ ও রাক্ষস'। ৯ই জুন, ১৯৮০ 'সুন্দরম' প্রযোজনা করে আকাদেমি মঞ্চে। মনোজ মিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনোজ মিত্রের কথা আসে। ভালো অভিনয় করেছেন। কিন্তু কেন জানিনা দেখা মাত্রই সাজানো বাগানের বাঞ্ছারামের কথা মনে আসে।" ১৯৮৮-তে "অলকানন্দার পুত্রকন্যা" নাটকটিতে আছে শিকড়হীন মানুষ ও তাঁদের বাঁচার তীব্র লড়াইয়ের কথা। আছে অলকানন্দার মত সমাজের সমস্ত মূল্যবোধকে আঁকড়ে, সমস্ত সময়ের যন্ত্রণাকে বুকে চেপে রাখা স্নেহশীলা প্রতিবাদী নারীর কথা। ৩ নভেম্বর, ১৯৮৯ মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় নাটকটি আকাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়েছিল। থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটকটিকে নাটক হিসেবে সত্যেন স্মৃতি পুরস্কার দেয়। ১৯৯০-এ রচিত হয় 'শোভাযাত্রা'। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের ধাক্কাধাক্কি কিভাবে পরিবারকে বিধ্বস্ত করে দেয় তার কাহিনি 'শোভাযাত্রা'। ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানা কিভাবে হয়ে যায় সমষ্টির সম্পদ তার ছবি 'শোভাযাত্রা'। মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় সুব্রত চৌধুরী, চিত্রা সেনরা চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। 'গল্প হাকিম সাহেব' মনোজ মিত্রের অন্যতম মঞ্চ সফল নাটক। ২০০ বছর আগের বঙ্গদেশের সামাজিক প্রশাসনিক পটভূমি অবলম্বন করে লেখা নাটক। বিষয়বস্তুর পরিবর্তনে কাহিনীর অভিনবত্বে এই নাটক বাংলা নাট্য সাহিত্যের সম্পদ। ২৮ শে মার্চ, ১৯৯৪ আকাদেমি মঞ্চে সুন্দরম প্রথম প্রযোজনা করে। ওয়ালী খাঁর চরিত্রে মনোজ মিত্র দাপটে অভিনয় করেছিলেন। 'ছায়ার প্রাসাদ' ইতিহাস আশ্রয়ী—নাটক। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের যে দ্বন্দ্ব-সংকুল সময় বৃত্তের বিন্দুসারের ক্ষমতায় আসীন। সেই অস্থির সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ'। সুন্দরমের প্রযোজনায় মনোজ মিত্র দ্বৈপায়ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল— "যে চরিত্রের জন্য প্রযোজনা দর্শক মহলে স্থায়ী আসন পাবে সেটি হল মনোজ মিত্রের দ্বৈপায়ন।"[১৬] 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' ব্যতিক্রমী নাটক। নির্বাচনের আগে রাজনীতিবিদের টাকা-পয়সার লেনদেন , অপহরণ নানা বিষয় নিয়ে হাসি মজার এই নাটক। 'সুন্দরম' এর প্রযোজনায় মনোজ মিত্র ধৃতিকান্ত চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। দিব্যেন্দু পালিত লিখেছিলেন "মনোজ মিত্রের ধৃতিকান্ত এতটাই যথাযথ এর চেয়ে একটু অন্য রকম হলে বেমানান হতো।"[১৭] 'রঙের হাট' নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল—'উল্টোপাল্টা হাসির নাটক'। মানুষ ও ছাগলকে চরিত্র বানিয়ে এক অদ্ভুত নাট্য

আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন এই নাটকে। দালাল ফজলু চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মনোজ মিত্র। অধ্যাপক দিপেন্দু চক্রবর্তী লিখেছিলেন, "তার দালাল চরিত্রটি জাত গোত্রহীন এক শিকড়ছিন্ন মানুষের নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণকে মর্মবেদী বঞ্চনায় সমৃদ্ধ করে তোলে।"[১৮] মহাভারতের কাহিনীকে নিয়ে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় লেখা নাটক 'যা নেই ভারতে'। মহাভারতের ভারত ও এই সময়ের ভারতকে মিলিয়ে দিয়েছেন নাটককার এই নাটকে। লোভ, হিংসা, অপরাধ, যৌনতা, ভালোবাসা, পাপ, পুণ্য সব মিলিয়ে এই নাটক হয়ে উঠেছে সমকালের এক জরুরি সংযোজন। ২০০৯ সালে অকাডেমি মঞ্চে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল। কঞ্চুকি চরিত্রে মনোজ মিত্র চমৎকার অভিনয় মনে থাকবে বহুকাল। 'ভেলায় ভাসে সীতা' পুরাণ ইতিহাস নির্ভর নাটক। এই নাটকে মনোজ মিত্র রাম কাহিনির নব মূল্যায়ন করেছেন। রাম কথকতা অবলম্বন করে এক নতুন রামায়ণ রচনা করেছেন। মনোজ মিত্রের শেষ নাটক 'দৈবকন্ঠ'। বাংলা থিয়েটারে তাঁর কন্ঠ থেকে যাবে। বাংলা নাটক থিয়েটারে তাঁর নাম বারবার উচ্চারিত হবে। সিনেমাতেও।

চলচ্চিত্র ও বাঞ্ছারামের বাগান :

মনোজ মিত্র শতাধিক চলচ্চিত্র অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, উৎপলেন্দু চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, রাজা সেন, বাসু চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত রায়, অঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ পরিচালকের নানা ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'আদালত ও একটি মেয়ে', 'ময়নাতদন্ত', 'মোহনার দিকে', 'শত্রু', 'ঘরে বাইরে', 'গণশত্রু', 'হুইল চেয়ার', 'চরাচর', 'আজব গাঁয়ের আজব কথা', 'আলো', 'জানালা' তাঁর অভিনীত গুরুত্বপূর্ণ ছবি। কিন্তু যে ছবিটি তাঁকে অমর করে রেখেছে তা 'বাঞ্ছারামের বাগান'। মূল রচনা মনোজ মিত্র। পরিচালনা তপন সিংহ। এই সিনেমায় দীপঙ্কর দে, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও মনোজ মিত্র অভিনয় করেছিলেন। বাঞ্ছারামের চরিত্রে অভিনয় করেন মনোজ মিত্র—১৯৮০ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান। এই সিনেমাকে কেন্দ্র করে একটি বিষাদময় ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন মনোজ মিত্র। এই সিনেমায় দীপঙ্কর দে'র জায়গায় অভিনয় করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। শুটিং হবার কথা ছিল ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু উত্তম কুমার ডেট দিলেন মার্চ মাসে। তপন সিংহ উত্তম কুমারের জায়গায় দীপঙ্কর দে'কে নিলেন। উত্তম কুমার মামলা করলেন। আদালতে মামলা উঠলো। তপনবাবু যুক্তি দেখালেন মার্চ মাসে শীতের সর্ষে ফুল থাকবে না। আর তিন মাস অপেক্ষা করলে প্রযোজক ধীরেশ চক্রবর্তীর আর্থিক ক্ষতি হবে। উত্তমকুমার সেই মামলায় হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মনোজ মিত্র পাঠক-দর্শকের হৃদয়ে জয় করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আজকাল পত্রিকা, ৯ই আগস্ট ১৯৮৮
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর ১৯৯৭
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. আজকাল, ৯ জুন ২০১৩
৬. আজকাল ১৬ ই জুন ২০১৩
৭. আজকাল ১৪ই জুলাই ২০১৩
৮. ঐ
৯. ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ: ১৪৯,৭৪
১০. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ শে মে, ২০০৯
১১. এইসময়, রবিবারোয়ারী ৩০ জুন, ২০১৩
১২. বাংলা নাট্য হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ: মনোজ মিত্র, সৃষ্টি প্রকাশন ২০০১, পৃষ্ঠা ১৩
১৩. বাঞ্ছারাম থিয়েটার সিনেমায়, মিত্র ও ঘোষ, বইমেলা ২০০০, পৃ: ২৭
১৪. বাঞ্ছারাম থিয়েটার সিনেমায়, মিত্র ও ঘোষ, বইমেলা ২০০০, পৃ: ৫১-৫২
১৫. ঐ
১৬. আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ই জুলাই, ১৯৯৯
১৭. প্রতিদিন, ৭ই জুন ২০০২
১৮. দেশ পত্রিকা ১৭ ই মে, ২০০৭

সৌ রে ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

মনোজ মিত্রের কয়েকটি নাটকে হাসির উপাদান

সমাজ সচেতন নাট্যকার হলেন মনোজ মিত্র। একথা ঠিক তিনি অবশ্যই একজন সুঅভিনেতা। মঞ্চ এবং রূপালি পর্দায় তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় করেছেন। অভিনেতা হওয়ার কারণেই চরিত্র নির্মাণে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমাজ সচেতনতার কারণে তাঁর রচনাগুলিতে সমকালীন সামাজিক সমস্যা এবং মানুষের যন্ত্রণার কথা অনেক বেশি পরিমাণে ধরা পড়েছে। একথা ঠিক সমগ্র বিশ্বে নানা পর্বে পর্বে রূপক-সাংকেতিক, তত্ত্ব, গণনাট্য, নবনাট্য লেখার পাশাপাশি উদ্ভট নাটক লেখা চলেছে দীর্ঘকাল। অথচ তিনি সেভাবে কোনো বিশেষ কোনো মদাদর্শগত পথ বেছে নেননি। সামাজিক নাটক লেখারই চেষ্টা করেছেন। যদিও কোথাও কোথাও রূপক কিছুটা হয়তো প্রবেশ করেছে। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজার, যুদ্ধের আবহাওয়া, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, শাসকের নানা ধরনের দুর্নীতি অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রচ্ছন্নভাবে কিম্বা সরাসরি তাঁর রচনায় প্রবেশ করেছে। এই সমাজ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কখনো ব্যঙ্গ, শ্লেষ কিম্বা কৌতুকের সাহায্য নিয়েছেন। উইট, স্যাটায়ার, হিউমার, ফান সবকিছুই নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'চোখে আঙুল, দাদা', 'কেনারাম বেচারাম', 'সাজানো বাগান', 'নরক গুলজার', 'নৈশভোজ'।

নাটকে মূলতঃ দ্বন্দ্বকে সামনে রেখে কাহিনি আবর্তিত হয়। আরোহন অবরোহন এবং চূড়ান্তক্ষণ সব নাটকেই নানা ভাবে থাকে। সমাজ সচেতন নাটকে তাই লক্ষ করা যায় নাট্যকার জীবনের সমস্যাকে তুলে ধরবে নানা চরিত্রের অবলম্বন করে। নাট্যকার মনোজ মিত্র এই চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত। সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিগত নানা কাঠামো নির্মাণ করে মানুষের মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গগুলিকে তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে জন্মগ্রহণ থেকে প্রায় বারো বৎসর তিনি সেখানেই কাটিয়েছিলেন। খুলনা জেলার প্রকৃতি, মানুষের শান্তভাব, সচলতা, সহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক প্রীতিভাব সবকিছুই তার ওপর প্রভাব ফেলেছে। মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করেছিলেন ঠাকুমা ও বাবার আচরণের মধ্যে দিয়ে। বাবা অশোক মিত্র ছিলেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক। বিচারক হিসেবে অবশ্যই কৃষকের প্রতি পক্ষপাত করতেন। একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি নাট্যকারের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। মন্তব্য করেছিলেন—"ইংলন্ডের রাজপরিবারকে এখনো বাঁচিয়ে-রাখা গেছে যখন, আমাদের বাংলার একটি একান্নবর্তী পরিবারকেও সংরক্ষণ করে রাখা যেত যদি।" তিনি যে সময় থেকে মূলতঃ নাটক লেখা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম 'নেকড়ে' (১৯৬৮), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯),

'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪), 'মেঘ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'রাজদর্পণ' (১৯৮১) 'নৈশভোজ' (১৯৮৪) প্রভৃতি নাটকগুলিতে তিনি সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র এঁকেছেন। যেখানে মূলতঃ সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রকেও নিশানা করেছেন। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব বিশেষ স্থান অধিকার করেছে যেখানে শোষকের প্রতি ক্ষমাহীন নাট্যকার।

'নেকড়ে' বা 'চাকভাঙা' মধুতে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। 'নরক গুলজারে'র মধ্যেও সেই ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত। শ্লেষবাক্য ব্যবহার করে পাপী-তাপীকে বিদ্ধ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেই যেন যুদ্ধে পাঠিয়েছেন মানিকচাঁদকে। সর্বহারা মানিক যেন শিকল ছিঁড়েছেন নিজের পরিবারের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবীর অন্বেষণ করতে। মানিকের সঙ্গে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন ভগবানকে গাভীর রূপ দিয়ে। যে গাভী নানাভাবে সেবা করবে মানিকদের। আসলে তিনি মানিককে জেতাতে চান আর তার জয়ের জন্য সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চান। মানিক শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় সে আসলে শোষিত সমাজেরই প্রতিনিধি। মানিকদের যারা পদানত করে শোষণ করতে চায় তাদের ও তাদের সমর্থকদের গাভীরূপ দিয়ে মানিকের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৭০) বা হুগলীর হরিপালের 'উদয়তীর্থ নাট্যদল'ই হোক সকলেই সময়ের ব্যবধানে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে উৎসাহী হয়েছেন। দেবতা বা ভূতের আধিপত্য ঘটিয়ে নাটকে হাসির খোরাক যোগান দিয়ে গেছেন নাট্যকার। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষকয়ের চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত। 'নরক গুলজার' কথাটি আমরা ব্যবহার করে থাকি যখন অনেক খারাপ বা "বদ" লোক একসাথে আসর বসায় এবং যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটায়। উত্তেজিত ঘোড়ুইএর হঠাৎ মৃত্যু তার মৃতদেহ ঘিরে নরকের ভয়ায়হ ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচদের পৈশাচিক উল্লাস এবং একই সাথে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনির মধ্যে দিয়ে 'নরক গুলজারে'র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দুটি অঙ্ক এবং দশটি দৃশ্য বিশিষ্ট এই নাটকে তেরোটি চরিত্র রয়েছে। সমকালীন সমাযের প্রতিনিধি হয়েও যারা বর্তমান সময়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কেউ তাঁবেদার আবার কেউ ভণ্ড, প্রতারক। তাদের সঙ্গে রয়েছে 'দু কাঠি মাদল', স্বয়ং নারদ। যিনি ঝগড়া গণ্ডগোল নিয়েই থাকেন। নাটকে সংলাপের মধ্যে দেখতে পাবো সাধারণের ওপর শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যবাদী বক্তব্য—'মানকো—এই শালা মানকো, এতবড়ো সাহস তোর, তুই আমার গাছে হাত দিস, একগাছ তেঁতুল আমার রাতারাতি ফরসা।' প্রজাপতি ব্রহ্মা হয়ে উঠেছেন রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। যিনি উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। সাধারণত অসঙ্গতি সৃষ্টি করে হাস্যরস সৃষ্টিতে মনোজ মিত্রের জুড়ি নেই। তবুও এই উৎকোচ গ্রহণকারী রাষ্ট্র শক্তিকে আমরা ভয় পাই, ঘৃণা করি। মূলতঃ রাষ্ট্র নায়কদের মুখ যেন ব্রহ্মার মুখের সাথে মিশে গেছে। আধুনিক সময়কেও যেন আমরা আরো বেশ করে খুঁজে পাবো শেষ দৃশ্যে ব্রহ্মার সংলাপের মধ্যে দিয়ে—'নচ্ছার পাজি বর্ণচোরা ফ্রাঙ্কেলস্টাইন নিখলি কিনা স্বর্গ নরকে সবারই গো জন্ম।...

আমারই সই, আমারই ব্ল্যাংক পেপার। এ সই যে আমারই মুখের জিওগ্রাফি এমনি পালটে দেবে কে জানতো... একটা রিকয়েস্ট গোরুর মধ্যেও আমাদের একটু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট কোরো...” খুবই পরিচিত দৃশ্য। ব্রহ্মা যখন মুখোশ ঢেকে বলেন তখন আর কিছু বলার থাকে না। একই ভাবে নারদ তার কোন্দল লাগানোর ভূমিকা বড় করে ধরে সুরেলা কণ্ঠে যখন গান করেন—“কথা বোলো না, কেউ শব্দ কোরো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন গোলযোগ সইতে পারেন না।’ তখন দেশ নায়কদের প্রতি যে নিদারুণ ব্যঙ্গ তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

স্বর্গ ও নরক, ভূত ও পিশাচ নিয়ে নানা রচনা রয়েছে। তবে রঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ দীনবন্ধু মিত্রের ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ একটি অসাধারণ হাস্যরসাত্মক নাটক, যেখানে গ্রামের ছেলে সিদ্ধেশ্বর ও মাধুরীর প্রেমের বিয়েতে আপত্তিকারী হরি গুণ্ডা দিয়ে সিদ্ধেশ্বরকে হত্যা করায় এবং কন্যা মাধুরী আত্মহত্যা করে। ভুলবশতঃ সিদ্ধেশ্বরকে জীবন্ত আবস্থায় নরকে পাঠানো হয় আর সেখানে গিয়ে স্বর্গ ও নরকে বিপ্লব শুরু করে সে। তার প্রিয় ষাড়ের সাহায্যে যম ও চিত্রগুপ্তকে নরক থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং পরে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর সহায়তায় মাধুরির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর আবার মর্ত্যে ফিরে আসে। এই ধরণের রচনা ত্রৈলোক্যনাথ থেকে রাজশেখর বসুর কলমেও উঠে আসে। তবে মনোজ মিত্রের ‘নরক গুলজার’ নাটকে একটি সমাজ মনস্ক ও রাজনীতি সচেতন ভাবনা অবশ্যই রয়ে গেছে।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তার সমস্ত চরিত্রের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছিলেন। মনোজ মিত্রের সম্পর্কেও আমরা সেই কথা বলতে পারি। ছোট, বড়, প্রান্তিক সমস্ত চরিত্রই তাঁর সুচিন্তিত আবেগের পেয়েছে। সমাজে অবহেলিত অবজ্ঞতাকে জীবন যুদ্ধে জিতিয়ে দিতে চান নাট্যকার। কেনারাম বা বেচারাম, গজমাধব, বাঞ্ছারাম, তুষ্টু চামার, ঘন্টাকর্ণের মতো অসহায় প্রান্তিক মানুষকে জিতিয়ে দিতে চান। পুরানো মূল্যবোধগুলির প্রতি তার সহানুভূতির কথা রয়েছে। বেচারাম শেষ পর্যন্ত ফিরে পান সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠা। সংসারে বা পরিবারের সকলে নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় কেনারামকে বাবা বলে স্বীকৃতি দিতে চলেছিল। তারা মাথা নিচু করে এসে দাঁড়িয়েছে বেচারামের পাশে। সকলের স্নিগ্ধ হাসিতে নাটক শেষ করেছেন নাট্যকার। এই নির্মল হাসিতে মানুষকে পৌঁছে দেওয়াই আসলে মনোজ মিত্রের অভিপ্রায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘বেচারাম কেনারাম’ নাটক রয়েছে। আর মনোজ মিত্রের ‘কেনারাম বেচারাম’ ১৯৭১-এ রঙমহলে নিয়মিত অভিনীত হয়েছিল ‘বাবা বাদল’ নামে। নির্দেশনায় ছিলেন জহর রায়। মূল চরিত্র নগেন পাঁজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। সেই নাটকটি কিছুটা বদল করে ‘কেনারাম বেচারাম’ করেন নাট্যকার। ‘প্রতিকৃতি নাট্যসংস্থা’ এই নাটকের অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে ‘কেনারাম বেচারাম’ চলচ্চিত্রায়িত হয় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। তবে এই নাটকের চাটুজ্যে এবং বাঁড়ুজ্যের আগমন মনে করিয়ে দেয় অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত নাটক

'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'-কে যেখানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জহর রায় অভিনয় করেছিলেন। যদিও এখানে সে কাহিনির সঙ্গে তেমন মিল নেই। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নগেন পাঁজা এসে হাজির হয়ে বেচারাম চাটুজ্জ্যেকে খুঁজে আনতে চায় মূলতঃ সম্পত্তির জন্য। তার পরিবর্তে কেনারাম বাড়ুজ্যেকে বেচারাম বলে সাজিয়ে এনে সে সম্পত্তি হস্তাগত করার আগে বেচারাম চাটুজ্জ্যে এসে হাজির হয় এবং পরিবারের নির্লজ্জতা ধরা পড়ে যায়। এক সময় একান্নবর্তী পরিবারে কর্তামশাই নিয়ে এমন সম্পত্তি সংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দিত। সিন্দুকের চাবি কোথায়! ফেলে আসেনি তো! এমন অদ্ভুত প্রশ্ন থাকে। বেলের পানা স্ট্র দিয়ে টানছেন... এমন সব অদ্ভুত কথা পরিবারের মানুষদের থেকে যখন শোনা যায় বেচারামের আসল গুরুত্ব তার সম্পত্তি।

"নগেন।। এর মধ্যে থেকে আসল লোকটিকে ছেঁকে তুলে নিন।

চারু।। এই দণ্ডে তুমি তোমার কলাপোড়াটিকে নিয়ে কেটে পড়ো দেখি।

নগেন।। পুরস্কার দিন, আমি যাচ্ছি। কিন্তু ওঁকে নিয়ে যাব কেন ওঁর বাড়ি থেকে? বলছি তো ইনিই বেচারাম চাটুজ্যে।

চারু।। আমাকে বেচারাম চালাতে এসেছো?'

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলরাম জামাতা' গল্পের মতোই যেন জামাই চেনার প্রসঙ্গটি 'বেচারাম' চেনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে সেক্ষেত্রে জামাইয়ের শরীরের পরিবর্তন হয়েছিল, এক্ষেত্রে বেচারামের স্থানে কেনারামকে আনা হয়েছে। নগেনের উদ্দেশ্যে কেনারামের উক্তি—'হচ্ছে নগেন' যেন হাসির খোরাক জুগিয়েছে। প্রসঙ্গত ভাওয়ালের নকল রাজা প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে। বেচারাম ফিরে এসে যখন বলে—'বাপু হে এ সংসারে কেউ নিজের না। টাকা! নিজের কেবল টাকা! টাকা দাও, সবাই আছে... না দেবে কেউ নেই।' কেনারামকে নিয়ে নগেন পাঁজা বর্ধমানের উদ্দেশ্যে হাঁটছে আর ফিডিং বোতল থেকে চুক্‌কুককরে ডুডু খাচ্ছে কেনারামের সেই দৃশ্য একইসঙ্গে হাসি এবং যন্ত্রণা দুই সৃষ্টি করে। এক কথায় অনবদ্য সৃষ্টি।

'সাজানো বাগান' যা বাঞ্ছারামের বাগান হিসেবে জনপ্রিয় তা আসলে এক সময় উদ্বাস্তু সমস্যার জটিল মনস্তত্ত্ব। অন্যের জমি-বাগান দখল করার পাশাপাশি বাগানবাড়িকে ভালোবাসার, প্রকৃতিকে ভালোবাসার নিখুঁত চিত্র যেন উপস্থিত। মূলতঃ সংলাপের মধ্যেই সেই হাস্যরসের প্রবাহ রয়েছে। আর নাট্যকারের জীবন দর্শনও সেখানে উপস্থিত। মোপাসাঁর একটি গল্পে যেখানে ক্ষুধার্ত ঘোড়াটিকে ঘাস খেতে না দিয়ে রাখালটি মেরে ফেলে আর তার মৃতদেহের উপরে গজিয়ে ওঠে প্রচুর ঘাস। সেই গল্পই যেন বাঞ্ছাকে অন্যভাবে মনে করায়। মনোজ মিত্র বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখে, তার খোঁটাকে অস্বীকার করে। এ খোঁটা বয়সের যত না তার চাইতেও বেশি পারিপার্শ্বিকের। সে খোঁটা কখনো প্রয়াত ছকড়ি, কখনো বা জ্যান্ত নকড়ি। একটু হাত বাড়ালেই যে জীবন, যে বেঁচে থাকা, তা যাতে বুড়ো বাঞ্ছারামের

নাগালে না পৌঁছায় তার জন্য চেষ্টা চলে অবিরাম। এই বেঁচে থাকার জোর বাঞ্ছারামকে যুগিয়ে দেন নাট্যকার। নিজের সৃষ্টি করা চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিবশত নয় এ বেঁচে থাকা বাঞ্ছারামের অর্জনেরই ফসল এমন উপলব্ধি থেকে। তাকে নিয়ে পয়সার জোরে এবং জমির লোভে ফাটকা খেলতে চাইবে বিত্তবান এ অন্যায় উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে বাঞ্ছারাম। উত্তরপুরুষের অধিকার কেউ প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়। আধুনিক সময়ে অন্যের বাড়ি নিয়ে প্রমোটিং ব্যবসার মতোই একটা রেশ থেকে যায়। তার বেঁচে থাকাটা ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজি কমেডি হতে পারতো, কিন্তু মনোজ মিত্র অন্যভাবে দেখান- 'কাঁদে না দাদুভাই, কত পাখি আছে.. হ্যাঁ হ্যাঁ, ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়, হ্যাঁ হ্যাঁ কাল সকালে দেখো... তোমারে দিয়ে যাবো... তোমার জন্যই তো সাজায়ে রেখেছি গো... হ্যাঁ হ্যাঁ। (সাজানো বাগান, দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য)।

জীবন যে তত্ত্ব নয় তাই যেন বোঝাতে চান। সুন্দরামের প্রযোজনায় বাঞ্ছারামের ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্বয়ং মনোজ মিত্র। নাটকের শুরুতে পরলোকগত জমিদার ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসে, গাছ থেকে পড়ে তার কোমর ভেঙে গেছে। এই প্রেতাত্মার কোমর ভেঙে যাওয়ার বিষয়টা অবশ্যই হাসির খোরাক তৈরি করে। সে যখন বলে—'সব গিলেছি... পারিনি শুধু ওইটা... ওই সব ফলের বাগানটা।' তখন বোঝা যায় আবার সেই অন্যের জমি বা বাগান দখল করার লোভ ও চক্রান্ত। আবার বাঞ্ছা যখন সংলাপ বলে "সারা জনম রক্ত জল করে বানালাম, আজ ভূতের ভয়ের দাঁত ক্যালায়ে ছেড়ে দেবো! আমি ভোগ করবো না?' তখন আমরা জীবন মরণের এক গভীর রহস্য উপলব্ধি করতে পারি। গুপিকে যখন বলে-"আমার কানন বেচে তুই ভাটিখানা মারবি? তখন সব স্পষ্ট হয়।' প্রকৃতির প্রতি, বাগানের প্রতি কী গভীর ভালোবাসা তার সামাজিক পরিচয় উঠে আসে। তবে হাসির খোরাক আনতে কখনো অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে পিছপা হননি নাট্যকার। কারণ চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সেই শব্দ বা বাক্যের প্রয়োজন। বাঞ্ছারামের কথায় শালা শব্দটি তার বাচনভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এগুলি সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জমিদার ভূত হয়েও যখন বাগানের লোভ ছাড়তে পারেনি তখন সেই ভূতের প্রতি বাঞ্ছার খোভ—"ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেব। বাঞ্চোৎ। আমার নেবুগাছে চড়ে পোঁদপাকামি হচ্ছে।" ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়োস্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয় তাহাই অশ্লীলতা তা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সে রূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল তিনি ধর্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তররের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা।" আবার ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী যখন লেখেন "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার

মধ্যে আর্ট আছে"। তখন আমরা অশ্লীলতার রকমফেরটিও বুঝতে পারি। মনোজ মিত্রের চরিত্ররা যখন খুবই অশ্লীল সংলাপ বলে তখন তার চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানানসই হয়ে যায়। গ্রাম বাংলার জীবনের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত হয়ে যায়—গুয়োর ব্যাটা, শালা, কান্তিন, এটুলি, হারামজাদা প্রভৃতি বিশেষণগুলি আসলে শুচিবায়ুগ্রস্ত শব্দ নয় বরং লোকশব্দ। একদিকে জীবনের অর্থ অনুসন্ধান অন্যদিকে আধুনিক ভোগবাদী, বিলাসপ্রিয় আত্মকেন্দ্রিক সমাজে তিনি প্রতিনিয়ত যে মূল্যবোধের বিনষ্টি দেখেছেন তার চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি এবং প্রকৃতি সংলগ্ন মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার নানা পরিচয় নাটকের সংলাপেও রয়েছে।

'রাজদর্পণ' নাটকে অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এমনকি মরে গিয়ে রাজা নন্দের শরীরে ঢুকেও বেরিয়ে আসতে হয় লোভী লম্বোদরকে। বরং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা স্বভাব কেউ বদলে দেয়-তাঁর পরজীবী, সুবিধাবাদী মনোভাবকে তখন সে ত্যাগ করে, বলে 'ওরে ও অভিরাম নামা... আমায় নামিয়ে দে। ঐ দ্যাখ সবাই আমার দিকে কি রকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।" তার সেই বিখ্যাত সংলাপ যেখানে হিউমার ও স্যাস্টায়ার মিশে রয়েছে—"মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটা করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা...। (সহসা উর্দ্ধবাহু হয়ে) নির্বংশ করো... হে ভগবান নির্বংশ করো।" (প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, রাজদর্পণ)। এ কিছুটা যেন ঔদারিক পূর্ণ চক্রবর্তীকে মনে করিয়ে দেয়। গরীব ব্রাহ্মণের অসহায় আর্তনাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মনোজ মিত্রের আরেকটি অসাধারণ একাঙ্ক নাটক 'চোখে আঙুল দাদা' হাসির নানা উপাদানে পূর্ণ। নাট্যকার যেভাবে মজা করতে অভ্যস্ত সেই সমাজ সচেতন দৃষ্টিতে শ্লেষ ব্যাঙ্গের কষাঘাতে চরিত্রগুলি নির্মাণ করে চলেন। স্বর্গ-মর্ত্য-নরক এর আবহাওয়া সৃষ্টি করে পাপ পুণ্যের মাপকাঠি তৈরি করে সমাজে বাস করা, সমালোচনাকারী কিছু অলস মানুষকে সামনে তুলে ধরতে তিনি 'চোখে আঙুল দাদা'-দের বর্ণনা করা শুরু করেছিলেন। নাটকের যে সমস্ত চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে ঘোষক, চিত্রগুপ্ত, বিধাতা দানব, সুরকন্যাদ্বয় এবং চোখে আঙুল দাদা রয়েছে। জগতে কি কর্ম করে মানুষ স্বর্গে এলো তার হিসাব দেওয়ার কথা প্রথমেই গানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে। সবাইকে ফাঁকি দিলেও ঈশ্বরের কাছে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। বিধাতা ঘুমের নাক ডাকছেন আর চিত্রগুপ্ত প্রভো প্রভো করে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে তার উক্তি— '(আরক্ত চোখে) "কাতলা মাছের মত হাপাসি কাটছো কেন? হলোটা কি?' স্বর্গে জাবে বলে 'চোখে আঙুল দাদা' চেচাচ্ছে তার ধাম বংশ পরিচয়, কর্ম, নেশা এইসব জানতে চান। তখন চিত্রগুপ্ত জানান- "আজ্ঞে সবারই আছে, আর সক্কলের আছে ধরুন শুধু এই একটা লোকেরই নেই।" আর তারপর সেই চোখে আঙুল দাদার যে বর্ণনা দিয়েছেন—

চিত্র।। আজ্ঞে হ্যাঁ, মর্ত্যে নাকি আজকাল এদের খুব ঢোলা প্যান্টালুন আর রংচঙা

ঢোলা-পাঞ্জাবি কাঁধে ঝুলি দেখা যাচ্ছে। ধরুন পরনের মাথায় বটের ঝুড়ির মতো চুল... ছাগুলে দাড়ি ... রুটি সেকা চাটুর মতো দুচোখে দুখানা বেগুনি রঙের কাঁচ বসানো চশমা, আর ধরুন সর্বদাই দাঁতে চুরুট কামড়ে আছে। খালি প্যাড়দারি করে ঘুরে বেড়ায়।

বিধাতা।। অ্যাঁ

চিত্র।। আজ্ঞে হ্যাঁ, যতো অঁতেলের আমদানি হয়েছে।

বিধাতা।। কি তেল?

চিত্র।। আঁতেল।

এই আঁতেল যে আসলে ইন্টেলেকচুয়াল তা পরে বোঝা যায়। বিধাতা বুদ্ধি মগজে দিয়েছিলেন এরা সেটি চোয়ালে নামিয়ে এনেছেন। সারাক্ষণ খালি চোয়াল চলছে। চিত্রগুপ্ত প্রভুকে চিনিয়ে দিতে বলেছেন 'এই সেই মাল'। স্বর্গের দরজা খোলার জন্য চোখে আঙুলের দাবীকে নস্যাৎ করে চিত্রগুপ্ত বলে- 'স্বগগো তোমার ভারতবর্ষের রেলের কামরা! টিকিট থাক না থাক লাফিয়ে চড়ে বসলাম।" বাস্তবিক সামাজিক নানা ক্ষেত্রকে আঘাত করতেই এই ধরনের সংলাপ। চোখে আঙুল দাদা যখন জানিয়েছে 'লোকের চোকে আঙুল দিয়ে লোকের ভুল ধরিয়ে দেওয়া' তার কর্ম, তখন বিধাতা বলেছেন "বহুব্রীহি সমাস"। ভোরবেলা কখনোই এরা বিছানা ছেড়ে ওঠেনা। সকাল দশটায় উঠে বৃদ্ধা মাকে দিয়ে চা ডিমের পোচ খেয়ে আবার মায়ের কাজের ভুল ধরতো। ঝাড়ুদারেরও ভুল ধরত কিন্তু কোন কোন দিন অফিসে চাকরি করতে না গিয়ে কফি হাউসে বসে সারা বিশ্বের সমালোচনা করতো। সি এম ডি এ-কে কাটছি মাটি দেখবি আয় বলে ব্যঙ্গ করা, মাটিকাটা পাইক বসানো সবকিছুতেই বিরূপ সমালোচনা করে। আর্যভট্টের সঙ্গে স্ফুটনিকের সমালোচনা করে লেখাপড়া সম্পর্কে তার মন্তব্য 'বাউন্ডেড ইগনোরেন্স' বিশুদ্ধ অজ্ঞানতা। রবি ঠাকুরের কবিতার চোদ্দটি লাইনও মুখস্ত থাকে না, সত্যজিতের সিনেমা সম্পর্কে বিধাতাকেই প্রশ্ন করে বসে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হচ্ছে না, হবে না, হতে পারে না বলে আবার জানতে চায় কোথায় হচ্ছে যেন? আসলে সমালোচনা করা বা ছিদ্র বের করাই এদের উদ্দেশ্য। নারীকে বিবাহ সম্পর্কে এর বক্তব্য—'ললিপপ বিশুদ্ধ ললিপপ'। বিধাতা যে বিশ্ব ঠিকমত গড়তে পারেনি তার সমালোচনা শুরু করে। জোনাকি নিয়ে বক্তব্য 'জ্বলছে যদি নিরবে কেন', যদি জ্বলেই থাকত তাহলে গ্রামের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বিধাতাকে যখন বলে 'বুড়ো ভাম, রিটায়ার কচ্ছোনি কেন?' তখন আমরা সংলাপে যে হাসির উপাদান রয়েছে তা বুঝতে পারি। অবশেষে ফ্রাঙ্কেলস্টাইনের গল্পের মতো চোখে আঙুল দাদার নিজের হাতের তৈরি দানব তাকেই ধ্বংস করেছে। দানব যখন মন্তব্য করে 'পিতা শালা তুমি পিতা। আমার হাতের জায়গায় পা বসিয়েছো চোখের উপর নাই কুণ্ডলি শালা এই তোমার পিতাগিরির নমুনা।' তখন আমরা নাট্যকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। 'দানবের কোমরে ডিসি ব্র্যান্ডের বল বিয়ারিং' বসিয়ে তার দক্ষতা কতটা নিম্নমানের তা দেখিয়েছেন নাট্যকার। 'ভগবানের মার

দুনিয়ার বার' এই কথাও যেন প্রতিষ্ঠা করলেন চিত্রগুপ্তের সঙ্গে নাট্যকার। আসলে হাসির উপাদানগুলি নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতি, নাটকীয়তা, চরিত্রাভিনেতার ভঙ্গি এবং উচ্চারণ পদ্ধতির ওপরও বেশ খানিকটা নির্ভর করে। সুঅভিনেতার ব্যঙ্গ করার কৌশলও অনেক সময় এই হাসিকে যথার্থ করে। তবে শুধু ব্যঙ্গ নয় শ্লেষপূর্ণ সংলাপই পাঠক, দর্শককে মুগ্ধ করে। শব্দ ব্যবহার, বাক্যের প্রয়োগ, জীবন যন্ত্রণা এবং মানুষের জয় লাভের আকাঙ্ক্ষা মনোজ মিত্রের নাটকগুলিকে আরো উজ্জ্বল করেছে। চরিত্রগুলির প্রতি শুধু সহানুভূতি নয় অসৎ ভণ্ড বিশ্ব নিন্দুকের প্রতি ঘৃণাও বর্ষণ করেছেন নাট্যকার।

অ হী না দে

মনোজ মিত্রের নাটকে কতিপয় প্রতিবাদী নারী

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে কিংবদন্তী নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে নারীকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন, এবং নাটকে বহু বর্ণময় ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন; তারা প্রত্যেকেই যেন নিজস্ব মহিমায় মহীয়ান। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'চাকভাঙা মধু' (১৯৬৯)। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বামী পরিত্যক্তা মাতলা ওঝার মেয়ে বাদামী। সে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারী। এ নাটক যেন বাদামীর নাটক। নাটক শুরু বাদামীকে দিয়ে, আবার নাটকের যবনিকাও বাদামীকে ঘিরেই। অসহ্য ক্ষুধা যন্ত্রণা সহ্য করেও সে স্বপ্ন দেখে পেটের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানোর। তার বাবা, দাদু জটা তার পেটের সন্তানকে হত্যা করে পুনরায় বিয়ে করার কথা বললে সে প্রতিবাদিনী হয়ে ওঠে। বাদামীর বাবা মাতলা গ্রামের নামকরা ওঝা। সুদখোর মহাজন অঘোর ঘোষের অত্যাচারে বাদামী ও তার পরিবারের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজন অঘোরকে সাপে কামড়ালে মাতলা ওঝার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। সে অঘোরের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু বাদামী ওঝার ধর্ম স্মরণ করিয়ে বাবাকে অনুরোধ করে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে ঝাড়িয়ে মহাজনকে বাঁচিয়ে তুলতে। বাদামী শুধুমাত্র মানবধর্ম পালন করতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত তার জেদের কাছে হার মেনে মাতলা অঘোরকে বিষ ঝেড়ে বাঁচিয়ে তোলে। প্রাণ ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঘোর তার কুৎসিত কদর্য স্বরূপে নিজের উগ্রমূর্তি মেলে ধরে। আদিম লালসায় বাদামীকে ভোগ করতে চায়। বাদামী আত্মরক্ষার্থে অঘোরকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। গোখরো সাপ রাখা কলসিকে মধুর কলসি বলে অঘোরকে খাওয়ার আহ্বান আবেদন করে। কিন্তু সাপটি মৃত হওয়ায় বাদামীর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায় না। তাঁর জানাই ছিল না বাবা গোখরোটিকে মেরে ফেলেছে। তখন বাদামী সতীত্ব আর পেটের সন্তানকে রক্ষা করতে কচ্ছপ ধরা বর্শা নিয়ে নারীলোলুপ, অসুররূপী অঘোরকে একের পর এক আঘাত করে বধ করে।। বাদামীর এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র অঘোর ঘোষ বা তার ছেলের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত শাসক, অত্যাচারী, নারীরদেহমাংসলোভী পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে। একদিকে মাতৃত্ব ও মানবতার প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে সমাজের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী নারী চরিত্র। মনোজ মিত্র অত্যন্ত সুকৌশলে বাদামীর এই লড়াইকে গ্রামের খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের একত্রিত হওয়ার লড়াইয়ের রূপ দিয়েছেন। এখানেই বাদামী চরিত্রটি অন্য একটি মাত্রা পেয়ে যায়।

'চাকভাঙা মধু'র মতোই সুন্দরবন অঞ্চলের আরেকটি আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে 'নেকড়ে' নাটকে (১৯৬৮)। এই নাটকে জল, জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন সমাজের শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক নিপীড়িত, শোষিত, অত্যাচারিত নারীর তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে

নীহারীর মাধ্যমে। বহিরাগত কংসারি আক্রাম এবং গোঁসাইয়ের সাহায্যে সুন্দরবনের দ্বীপের মানুষকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি হস্তক্ষেপ করেছে। শুধু সম্পত্তির পাশাপাশি সে অন্যের স্ত্রীকেও কেড়ে নিয়েছে। নীহারি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কংসারি নীহারিকে গর্ভবতী করলে সন্তানসম্ভবা নীহারি কংসারির কাছে গর্ভের সন্তানের জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করে। কংসারি বিষয়টি মানতে না পেরে নীহারীকে বুনো পাতার রস খাইয়ে তার উত্তরাধিকারীকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু গর্ভের সন্তানটি মরে না, বিকৃত আকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে। জন্মের পরেই গোঁসাই শিশুটিকে গভীর জঙ্গলে ফেলে আসে। নীহারি তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। একদিকে কংসারির দুটো বুলডগ ও আক্রামের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। অজানা ভয়ে কংসারির মনে হয় নীহারীর জন্ম নেওয়া শিশুটিই নেকড়ে হয়ে গেছে। আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য নীহারি রটিয়ে দেয় যে, নেকড়ে তার সন্তানকে পালন করে। তার স্বভাব হয়েছে নেকড়ের মতো, অথচ তার মাথা হয়েছে মানুষের মতো। নীহারি নিজের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কংসারিকে সক্রোধে বলে—

"নরখাদক! নেকড়ে!... (হেসে ওঠে) বাঘের কোলে আমার পুত্তুর বেড়ে উঠেছে! খাটবে... আমার কথা খাটবে...সে তোমার সম্পত্তি কামড়ে ছিঁড়ে নেবে!"

দ্বীপের সম্পত্তিতে যাদের ভোগের অধিকার নেই তাদের কাছ থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের লড়াই করতে চেয়েছে নীহারি। শহরের ছেলে কংসারির ভাইপো শশাঙ্ক বুঝতে পারে এইসব কিছুর পিছনে আছে নীহারি। এবার নীহারি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে। শশাঙ্ক নীহারিকে গুলি করে। গুলির আঘাতে নীহারি পড়ে যাওয়ার সময় ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। ঘন্টার আওয়াজে ছুটে আসে সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা। তীর ধনুক, গাছের ছাল, নেকড়ের থাবা নিয়ে। তারা তাদের অধিকার বুঝে নিতে চায়। নীহারি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে প্রতিরোধ, প্রতিশোধের আগুন। নীহারির নের্তৃত্বে জনতা একত্রিত হয়ে শোষক শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। জয় হয় সাধারণ মানুষের। সর্বগ্রাসী মানুষের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর পথ দেখিয়েছে নীহারি। এ নাটকে নীহারির এক প্রতিবাদী প্রতিস্পর্ধা চরিত্র হিসেবে আমাদের সমীহ আদায় করে নেয়।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে (১৯৯৮) নিঃসন্তান অলকানন্দা হয়ে উঠেছে প্রকৃত মা। গর্ভে ধারণ না করেও শুভ মানসী দুই পুত্রকন্যাকে সন্তানস্নেহে পালন করেছে সে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদের পর বলে ভাবতে পারেনি। শুভকে সে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়েছে এবং মানসীকে ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। শত দারিদ্রের মধ্যেও তাদের কোনো অভাব বুঝতে দেয়নি অলকানন্দা। এরপর শুভ কলেজে র‍্যাগিংয়ের স্বীকার হয়ে ঘরে ফিরে আসে। টাকা চায় অলকার কাছে। শেষপর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অ্যাসাইলামে ভর্তি হয়। অন্যদিকে মানসীর প্রতি স্বামীর অকথ্য নির্যাতনের কথা জানতে পেরে অলকা তাকে বাড়ি নিয়ে আসতে চায়। মানসী নিজের লড়াই একাই লড়তে চেয়েছে।

অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছে। তাই সে অলকার বাড়িতে ফিরতে চায় না। শত চেষ্টা করেও অলকা তার সন্তানদের নিজের কাছে আগলে রাখতে পারেনি। প্রৌঢ় বয়সে আবার দেবাহুতির দুধের শিশুকে দত্তক নেয়। জগতের সকল সন্তানকে সে নিজের সন্তান মনে করে। সাংসারিক জটিলতা, দারিদ্র্য, স্বামীর পঙ্গুত্ব ইত্যাদি সমস্যার মধ্যেও তার মাতৃত্ব অটুট থাকে। অলকানন্দার মাতৃত্বে উত্তরণ ঘটে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে। অকৃত্রিম মাতৃত্বকে বুকে ধারণ করেই সে হয়ে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী নারী।

মাতৃস্নেহের আরেকরূপ দেখা যায় 'দম্পতি' নাটকে (১৯৭৮)। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও বকুলের মা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কেননা তার স্বামী শ্যামল নিজের কেরিয়ারের কথা ভেবে তাকে দিনের পর দিন গর্ভপ্রতিরোধক ঔষুধ খেতে বাধ্য করে। শ্যামলের ধ্যানজ্ঞান অর্থ উপার্জন করা। একদিন বকুলের মাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। তার কাছে সবকিছুর থেকে সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা বড়ো হয়ে ওঠে। পরিণতিতে বকুল একদিন সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। শ্যামলের সন্দেহ হয় বকুলের সহকর্মী অপরূপের ওপর। ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে বকুল আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু গর্ভের সন্তানের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারে না। সন্তানকে সে একা মানুষ করার স্বপ্নে বুক বাঁধে। অবশেষে শ্যামল নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে বকুলের কাছে হাজির হয়। বকুলের কোমল মন তাকে ক্ষমা না করে পারে না। নাট্যকার মনোজ মিত্র সন্তানস্নেহের পাশাপাশি নারী মনের কোমলতার দিকটি বকুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মনোজ মিত্রের 'আত্মগোপন' নাটকের (১৯৯৪) কেন্দ্রেও আছে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র পাঞ্চালীক। প্রতিভাবান, সৃজনশীল মানুষের প্রতি পাঞ্চালীর অদ্ভুত আকর্ষণ। এমনই এক চলচ্চিত্র জগতের সৃজনশীল প্রতিভাবান রাজর্ষিকে জীবনসঙ্গী করে। সে স্বপ্ন দেখে রাজর্ষি একদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসপন্ন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মতো এক ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়ে উঠবে। সে বাবার পৈতৃক সম্পত্তিও বিক্রির সমস্ত অর্থ রাজর্ষির হাতে তুলে দেয়। কিন্তু রাজর্ষি অর্থের নেশায় নিম্নমানের রুচিহীন অশ্লীল ছবি তৈরি করতে থাকে। রাজর্ষি নিজের ছেলে বুবাইকে আটকে রেখে অর্থের জন্য পাঞ্চালীকে ব্ল্যাকমেইল করতে চায়। নিরুপায় হয়ে পাঞ্চালী রাজর্ষিকে ডিভোর্স দেয়। কিন্তু নিজের ছেলে বুবাইকে ফিরে পায় না। বুবাইয়ের জন্য তার মন কেঁদে ওঠে। পাঞ্চালী আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে তার থেকে বয়সে ছোটো ফুটবল প্লেয়ার অর্পণকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পাঞ্চালীর সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায় না। অর্পণও তাকে ঠকায়। প্রতিপক্ষ দলের থেকে অনেক টাকা নিয়ে সে পালিয়ে যায়। পাঞ্চালীর কাছে টাকার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে অর্পণের ভালো প্লেয়ার হয়ে ওঠা। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না। অর্পণের উন্নতির জন্য সে অর্পণের সমস্ত পরিবারকে তার লড়াইয়ের সাথী করে। এ কাজে সে সাফল্য লাভ করে। অর্পণের হারানো স্বপ্নকে সে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তার এই স্বাদ ও সাধনা তাকে অনন্যা এক নারী করে তুলেছে।

সত্তর দশকের অস্থির রাজনীতির চিত্র ফুটে উঠেছে 'নরক গুলজার' নাটকে (১৯৭৪)। স্বর্গ, মর্ত্য, নরক এই তিনটি স্থানেই নাটকের কাহিনি ঘোরাফেরা করেছে। দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে নাটকের নায়ক-নায়িকা মানিক-ফুল্লরা। দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঠেলা চালালেও দরদি জননেতা বাঁটুল বিশ্বাস তাকে উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। অর্থাভাবে মানিক-ফুল্লরার একমাত্র সন্তানকে ক্ষিদের জ্বালায় মরণাপন্ন হয়ে ওঠে। মানিক মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ফুল্লরা কিন্তু জীবনের কাছে হার মানতে চায়নি। ছেলেকে বাঁচাতে ও নিজের পেটের আগুন নেভাতে দেহব্যবসার পথ বেছে নেয়। গঙ্গার পাড়ে সাজসজ্জা করে নাচ-গানের মাধ্যমে বাবুদের মনোরঞ্জন করতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলের অসুস্থতার জন্য ফুল্লরা একদিন গঙ্গার পাড়ে যেতে রাজি না হলে জনৈক বাবু তাকে ছুরি মারে। অপঘাতে মৃত্যু হওয়ায় মানিক ফুল্লরা উভয়েরই নরকে ঠাঁই হয়। নরকের সমস্ত পিশচাচ এবং স্বর্গের ব্রহ্মা, চিত্রগুপ্ত, যম সকলকেই তাদের অপকর্মের জন্য দেবর্ষি নারদ গো জন্ম প্রদান করে। মানিক-ফুল্লরাকে মানব জীবন দান করে এবং তাদের এই গোরুদের মালিকানা দান করে। ফুল্লরা তার মাতৃসত্তা নিয়ে তার ছেলেকে ফিরে পেতে চায়। জ্যান্ত সন্তানের থাবা থেকে ছেলেটাকে বাঁচাতে চায়। মানিক-ফুল্লরা শিশুর বাসযোগ্য নতুন বিশ্ব গড়তে চায়। ফুল্লরা জীবন যুদ্ধে মার খেতে খেতে, হারতে হারতে যেন জিতে যায়। চিরকালীন মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয় ফুল্লরার মাধ্যমে।

এক গ্রাম্য অসহায় নারীর অভিনেত্রী হয়ে ওঠার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকের (১৯৯১) মধ্য দিয়ে। নাটকটি শুরু হয়েছে মনোরমার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। সে শরৎশশীর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মনোরমা বলেছে—"আমি মনোরমা...জন্ম আমার পতিতা পাড়ায়, পতিতা মায়ের পেটে।... নাক ফুটিয়ে নাকচাবি পড়ার আগে চলে এলাম থিয়েটারে। থিয়েটারের ছোটোখাটো পার্ট করা মেয়ে আমি, সামান্য নটী।"

সমাজের অন্ধকার পাঁক থেকে মনোরমা উঠে এসেছে মঞ্চের আলোয়। অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে থিয়েটারকে। থিয়েটার যেন তার কাছে মন্দির তুল্য। এমনকি অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া প্রচুর মেয়েকে মঞ্চের আলো দেখিয়েছে মনোরমা। গ্রাম্য যুবতী শরৎশশীকেও দালাল নটুলালের হাত থেকে উদ্ধার করে থিয়েটারে যুক্ত করতে চেয়েছিল। নটুলাল শরৎশশীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে রামবাগানের নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। মনোরমা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে। 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শরৎশশীকে নিয়ে আসে পাঁচক্ষীরায় জমিদার বাড়িতে। সু-অভিনেত্রী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে মনোরমা। শেষপর্যন্ত তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। জীবনের পড়ন্তবেলায় মনোরমা তার স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতিমধুর কাহিনিকে স্মরণ করেছে। পাঁচক্ষীরার 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চের

রোগসাহেবের শিকার হয়েছিল ক্ষেত্রমণি আর পাঁচক্ষীরার মাটিতে গুরুচরণের মতো নরপিশাচ শরৎশশীর নরম যৌবন খুবলে খেয়েছিল। শরৎশশীর এই পরিণাম মনোরমার জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তার মনের ক্যানভাসে প্রতিমুহূর্তে ভেসে ওঠে শরৎশশীর পেলব মুখখানি। আজও সে খুঁজে ফেরে শরৎশশী ও তার ভালোবাসার মানুষ স্মৃতিকণ্ঠকে। থিয়েটারের মতোই আলো-ছায়ার জীবন মনোরমার। মনোরমা নিজের জীবনের মাধমে বুঝেছে সমাজে নারী-লোলুপ, নারী-খাদকের অভাব নেই। তাদের পাশবিক লালসা থেকে যুবতীদের বাঁচাতে তাগিদ অনুভব করেছে। সবক্ষেত্রে যে সফল হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। যেমন তার চোখের মণি শরৎশশীকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু তাতে তার লড়াইটা মিথ্যে হয়ে যায় না।

বৃদ্ধ বঙ্কিম ও বৃদ্ধা নীহারের জীবনের করুণ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের (১৯৫৯) মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ বঙ্কিম বাঁচতে চায়। পরিবারের সকলে তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করতে চাইলেও সে চায় সংসারের সকলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। নিয়ম মেনে সে সময়মতো ওষুধও খায়। বাড়ির সকলে অসুস্থ নাতিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বৃদ্ধের নাতির কথা ভাবার সময় নেই। নাতির মৃত্যু হলে স্ত্রী নীহার তার মুখে মালিশের তেল ঢেলে দেয় আর বলে—

"কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দুজনে এ ঘরে এখনো বেঁচে আছি।"

গোটা পরিবারের কাছে অবহেলিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার করুণ কাহিনি এই নাটকে ফুটে উঠেছে। আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে স্বামী, সংসারের সুখ থেকে বঞ্চিত হয় নীহার। অসুস্থ স্বামীর প্রতি বিরক্ত হলেও স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন থেকে সরে থাকেনি। সে স্বামীর সেবায় ও আনন্দদানে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। আবার অসুস্থ নাতির প্রতি ঠাকুমার স্নেহ, মায়া, মমতাও কম নয়। নাতির মৃত্যুর পর স্বামীর মুখে তেল ঢেলে দিয়ে নীহারের প্রতিবাদ নাটকে এক অন্যমাত্রা এনে দেয়। নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর প্রথম নাটকেই নারীদের যন্ত্রণার কথা ও তাদের প্রতিবাদকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তারপর থেকে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রতিবাদী, লড়াকু, স্বভাবকোমলা, সরলা নারীদের যেন মিছিল চলেছে। প্রতিটি নারী স্বভাব চরিত্রে, মন মানসিকতায় সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ তারা যেন একসূত্রে বাঁধা। মনোজ মিত্র যেন নানা বর্ণের ফুল দিয়ে এক বর্ণময়, বিচিত্রমালা গেঁথেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, 'মনোজ মিত্র: নানা বর্ণে, নানা রঙে', দিয়া পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ২০২২।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুল, 'সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ২০১৯।

৩. রায় জয়শ্রী, 'মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ২০১৯।

মা নি ক বি শ্বা স

নাট্যগীতে সমাজচেতনা : মনোজ মিত্রের সুরেলা বিন্যাস

পাশ্চাত্যের নাট্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল যেমন ট্র্যাজেডির অন্যতম উপাদান হিসেবে 'সংগীত'কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি প্রাচ্যের নাট্যতাত্ত্বিক আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' সংগীতকে নাটকের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিনটি উপাদানই প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ড. অজিতকুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"প্রাচীন ভারতেও সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ও নাট্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। প্রেক্ষা অথবা নাট্য বলতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যি বোঝাত। এই তিনটি শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে 'সঙ্গীত' কথাটির দ্বারা এই তিনটি শিল্পকেই একসঙ্গে বোঝানো হ'ত। প্রেক্ষাগৃহেরও অপর নাম ছিল সঙ্গীতশালা।"[১]

নাটকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও সংগীত নাটকের আবহ রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। নাট্যসংগীত সাধারণ সংগীত থেকে আলাদা, কারণ এটি নাটকের চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহৃত হয়। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন:

"গানের কথা ব্যক্ত করে চবিত্রের বক্তব্যকে, সুর ব্যক্ত করে চরিত্রের ভাবাবেগের প্রকৃতিকে এবং লয় ব্যক্ত করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতাকে, উদ্দীপনার তীব্রতাকে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে নাটকীয় কার্যের আরোহনের সঙ্গে ঘটনার গতিবেগের সঙ্গে সুর ও লয়ের সঙ্গতি থাকা চাই।"[২]

নাটকে সংগীত ব্যবহারের বিভিন্ন কারণ রয়েছে : ১. ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া ২. আবেগময় অনুভূতি প্রকাশ করা ৩. ট্রাজিক ঘটনার পরে নাটকীয় মুক্তি দেওয়া ৪. নাটকের আঙ্গিক নির্ধারণ করা ৫. পরিবেশ সৃষ্টি করা ৬. নিছক মনোরঞ্জনের জন্য।

আধুনিক নাটকে এর সঙ্গে নতুন কিছু কারণ যুক্ত হয়েছে : ১. গ্রামীণ উৎসবের আবহ তৈরি করা ২. পুরনো গানের সুরের মাধ্যমে ব্যঙ্গ রচনা করা ৩. সূচনা ও সমাপ্তিতে নাটকের আঙ্গিক গঠনের অংশ হিসেবে ব্যবহার ৪. ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া ৫. এপিক নাটকের ধরণ নির্মাণ করা।

বাংলা নাটকে সংগীতের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে গান অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের মূল সুরের সঙ্গে সংগীতকে একীভূত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকেও সংগীত নাট্যবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক নাট্যকাররা যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই সংগীতের ব্যবহার

করেছেন। মনোজ মিত্রের নাটকে সংগীতের ব্যবহার লক্ষণীয়। তাঁর প্রায় পঁচিশটি নাটকে সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত পুরাণ, রূপকথা ও ইতিহাস-আশ্রিত নাটকে। পালা বা লোকনাটকের আঙ্গিকে রচিত নাটকেও সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রেখট তাঁর এপিক থিয়েটারে সংগীতকে অন্যতম উপাদান হিসেবে দেখেছেন, তবে অতিরিক্ত অলঙ্কৃত সংগীতের বিরোধিতা করেছেন। ব্রেখট লিখেছেন:

"কনসার্টে যে দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী হাজির হয়, তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে সংগীতের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক বা দার্শনিক বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।"[৩]

এপিক থিয়েটারের লক্ষ্য দর্শককে সম্মোহন থেকে মুক্ত রাখা এবং নাটকের মধ্যে ভঙ্গিগত চমক সৃষ্টি করা। ব্রেখটের মতে, থিয়েটারের গেস্টিক ভাষা (Gestic Language) নাটকের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মনোজ মিত্রের নাটকেও লোকনাট্যের ধাঁচে সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে সংস্কৃত নাটকের মতো প্রস্তাবনা অংশে নটীর গান নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশ করে:

"মানুষ কত ভেড়া হয়, চেয়ে দ্যাখো না।
লোভে ভেড়া, ভয়ে ভেড়া, ভেড়া অভাবে
ঘরে সিংহ, বাইরে ভেড়া, ভেড়া স্বভাবে।"

'কিনু কাহারের থেটার' নাটকটি লোকনাট্যের আঙ্গিকে রচিত। এর শুরুতেই ভাঁড় গান গেয়ে দর্শকদের আহ্বান জানায়:

"গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং ঘ্যাং
জ্যান্ত মানুষের কাটবো গলা, এক কোপে ঘ্যাচাং!"

এই গানের ভাষা, ছন্দ ও ভাব লোকজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাটকের শেষে কিনু ও তার দল গান গেয়ে ইলিউশন ভাঙে, যা ব্রেখটীয় থিয়েটারের লক্ষণ। নৈশভোজ' নাটকের সূচনা ও সমাপ্তিতে গান নাটকের লজিকাল সংযোগ তৈরি করে। সূচনায় জোড়া শেয়ালের গান মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতার প্রতীক :

"খোঁজ খোঁজ ভোজ খোঁজ চাই প্রোটিন হেভি ডোজ।"

মনোজ মিত্রের নাটকে সংগীত শুধু বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং তা নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর নাটকে লোকসংগীত, জনপ্রিয় গানের পুনর্বিন্যাস ও নাট্যসংগীতের সম্মিলন ঘটেছে, যা বাংলা থিয়েটারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মনোজ মিত্রের নাটকে সংগীতের ব্যবহার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাঁর নাটকে সংগীত শুধু মাত্র আবহ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং সমাজ ও নাটকের মূল বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ তাঁর নাটকের সূচনা ও সমাপ্তি সংগীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'অপারেশন ভোমরাগড়'

নাটকের বাইরের খোলসটি রূপকথার হলেও এর ভেতরের বিষয়বস্তু গভীর অর্থবহ। নাটকের সূচনা সংগীতেই ভ্রমরচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে:

"ভোমবাগড়ের তোমবারাজা রাজার মত নয়
রাগরাগিণী নিয়ে সদা থাকেন মহাশয়।"

নাটকের শেষে রূপকথার ছোঁয়া বজায় রেখে রাজকন্যা-রাজপুত্রের মিলনের সম্ভাবনাময় গান ব্যবহার করা হয়েছে:

"ভেঁপুর বাঁশি জানে কি কেবল ঘুম পাড়াতে...
গাবে নাকি নীরব বনের মন রাঙাতে?"

লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে কথকের গান কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কথকের বন্দনায় দেবীর মহিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে:

"ও দেবী তোর কেমন পা, ধূলা লাগে না ধূলায় গড়া পুতলি, ধূলা ধরে না।"

'পুঁটি রামায়ণ' নাটকে বক্কেশ্বর ও টেপার গান সমাজের কলুষতা তুলে ধরেছে। তাদের গানের মধ্য দিয়ে নাট্যকার আধুনিক যুগের সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"সবচেয়ে যে লোকটা হীন নীচ জঘন্য বসেন তিনি উচ্চাসনে মহামান্য গণ্য!"

'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে নাট্যজগতের এক বিশেষ সময়কাল ও অভিনেত্রীদের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে। মনোরমার বিদায়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে গানে :

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।"

নাটকের শেষে, অভিনয় বন্ধ থাকেনি, বরং নতুন অভিনেত্রীরা এসেছে, সেই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করতে গান ব্যবহৃত হয়েছে:

"নির্মাইয়ে নাট্যালয় আরম্ভব অভিনয় পুনঃ যেন দেখা হয়।"

'রঙের হাট' নাটকের শুরুতে ও শেষে গান ব্যবহৃত হয়েছে বাজারসর্বস্ব সমাজের সংকট ও তার প্রতিরোধের বার্তা দিতে। সূচনার গানে ফুটে উঠেছে বাণিজ্যিক বিশ্বের রূপ:

"আয় হাঁস আয় আয় চৈ চৈ সন্ধেবেলা রঙের হাটে..." সমাপ্তির গানে সমাজের মানবিক দিককে তুলে ধরা হয়েছে:

"তারে নয় না বেচা যায় না কেনা যায় না গো যায় না..."

"চোখে-আঙুল দাদা' নাটকের গান নিয়তি ও কর্মফলের বিষয়টি প্রতিফলিত করেছে। "হিসাব দিতে হবে ভবে কী কর্ম করে এলে জবাব দিতে হবে।" নাটকের শেষে কর্মফলের ব্যঙ্গাত্মক দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে:

"কেমন মজা কেমন মজা পেলি তুই কেমন সাজা।"

'নিউ রয়্যাল কিস্সা' নাটকের সূচনায় রূপকথার ধাঁচে গান ব্যবহৃত হয়েছে:

"ছেলে চেনে, বাপে চেনে, চেনে ঠাকুরদাদা মুখে মুখে নিয়ে তাকে চলে কিস্সা ফাঁদা..."

শেষেও রূপকথার ধাঁচ বজায় রেখে গান ব্যবহৃত হয়েছে:

"ছেড়ে দে ছেড়ে মোর পাখি... যদি দেখা পাইগো আবার শেকল খুলে রাখব না তার।"

'শিবের অসাধ্যি' নাটকে শিবের গঞ্জিকাবিলাসী স্বভাবের মাধ্যমে সমাজের উদাসীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

"জাগো বাবা পূর্ণশশী গঞ্জিকাবিলাসী..."

সমাজের অলসতা ও নির্লিপ্ততা দূর করার আহ্বান হিসেবে গানটির ব্যবহার লক্ষণীয়। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে পুরনো গান ও লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া বজায় রেখেছেন। 'শিবের অসাধ্যি'তে ব্যবহৃত পুরনো গানের সুর নাটকের ভাবগত গুরুত্ব বহন করে। "মধু ধরো যাবো... মালা পরো গলে..." এছাড়াও, 'কিনু কাহারের থেটার' নাটকে পাঁচালী ধাঁচের গান ব্যবহৃত হয়েছে: "দাঁড়াও দাঁড়াও মণি বারেক ফিরে চাও।"

বাংলা নাটকের জগতে মনোজ মিত্র এক বিশিষ্ট নাম। নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে তিনি বাংলা থিয়েটারের পরিসরে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নাটকের মধ্যে গানের সার্থক ব্যবহার। গান শুধু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং নাটকের কাহিনি, চরিত্রচিত্রণ এবং নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য তিনি গানকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকে গান কখনো সংলাপের পরিপূরক, কখনো কাহিনির গতিময়তার অংশ, আবার কখনো ব্যঙ্গাত্মক বা কৌতুকপূর্ণ পরিবেশ তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাটকের প্রেক্ষাপট বা আবহ তৈরি করতে গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে বহুবার এই কৌশল প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে দেখা যায়, হেকিম কবরের পাশে ফকিরের গাওয়া 'মুশকিল আসান' গানটি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়া, 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে এক আদিবাসী বৃদ্ধ যখন তাঁর স্ত্রীর গলায় মালা পরিয়ে দেয়, তখন ব্রজবুলি ভাষায় গাওয়া গানটি নাটকের আবেগঘন মুহূর্তকে আরও গভীর করে তোলে। এই গানের মাধ্যমে একদিকে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝানো হয়েছে, অন্যদিকে নাটকের বিষাদময় পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে।

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে গানকে সংলাপের এক স্বতন্ত্র রূপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষত লোকসঙ্গীত ও বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ব্যবহার করে তিনি চরিত্রের ভাব প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'নাকছাবিটা' নাটকে নায়িকা জানকীর গান কেবল তার ব্যক্তিত্বই নয়, নাটকের মূল সুরকেও প্রতিফলিত করে। 'নরক গুলজার' নাটকের খগেন চরিত্রটি যখন নিজের দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রকে তুলে ধরছে, তখন সে গেয়ে ওঠে:

"আমি হলাম ঘুষের রাজা, ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না।"

এই গান শুধু চরিত্রটির নৈতিক অবস্থানই নয়, নাটকের সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রকাশ করে।

মনোজ মিত্র ব্যঙ্গ ও কৌতুক সৃষ্টির জন্য তাঁর নাটকে গান ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অসঙ্গতি ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপিত, এবং এই ব্যঙ্গকে আরও শক্তিশালী করতে গান ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিউ রয়্যাল কিস্সা' নাটকে এক ভণ্ড গুরু যখন নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তখন সে গেয়ে ওঠে:

"এই করোহে দয়াল গুরু, ভক্তবান্ধা কল্পতরু।"

এই গানের মাধ্যমে গুরু চরিত্রটির প্রতারণার দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একইভাবে, 'নরক গুলজার' নাটকে নারদের গাওয়া গানটি সমাজের শাসকদের নিষ্ক্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে:

"কথা বলো না, কেউ শব্দ করো না,
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।"

গান নাটকের দৃশ্যের মধ্যকার সংযোগ স্থাপন করতে এবং নাটকের গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। মনোজ মিত্রের নাটকে এমন উদাহরণ বহু পাওয়া যায়। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকের কথকের গান নাটকের কাহিনির অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়:

"রোষবশে ফোঁসে গৌরী, দেবী সর্পমস্তা,
কী যে তার ভাগ্যে লিখা, কেবা জানিস তা।"

এছাড়া, 'নাকছাবিটা' নাটকে জানকীর গাওয়া গান তার ভবিতব্যের এক পূর্বাভাস দেয়:

"সমাজ সংসার মিছে, সব মিছে এ জীবনের কলরব।"

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে অনেক সময় জনপ্রিয় গান পুনঃব্যবহার করেছেন, যা নাটকের চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে গিয়ে এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। যেমন, 'নাকছাবিটা' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে 'কবি' উপন্যাসের এক জনপ্রিয় গান:

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।"

এছাড়া, 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকের একটি দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে:

"আমি বন ফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে।"

এইসব গান শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয়নি, বরং চরিত্রের মনের ভাব ও নাটকের মেজাজ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে গানকে অত্যন্ত সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছেন। গান শুধুমাত্র নাটকের অলংকার নয়, বরং নাটকের কাঠামোর অপরিহার্য অংশ। সংলাপের বিকল্প, চরিত্রচিত্রণের মাধ্যম, নাটকের আবহ তৈরি, কৌতুক ও ব্যঙ্গ উপস্থাপন এবং নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণ—এই সবকিছুর জন্য তিনি গানকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর নাটকের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা নাটকের গভীরতা ও আকর্ষণীয়তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

সেই মুহূর্ত পর্যন্ত ইলার মনের আকাশ ছিল পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল—সেখানে সাদা মেঘের ভেলা ভাসছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু খুব শিগগিরই সেই আকাশ ঢেকে যাবে সন্দেহের বিষাক্ত মেঘে। নাটকের সূচনায় যে উচ্ছ্বাস, সেই আবেগের বিপরীতে শেষের সন্দেহমিশ্রিত বাক্য নাটকের নাটকীয়তাকে আরও গভীর করেছে। দ্বিতীয় গানটিও গেয়েছে ইলা "যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে" সেই মুহূর্তে ইলার মনে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করছিল। কিন্তু সন্দেহের কালো অন্ধকার যখন সেই জ্যোৎস্নাকে আড়াল করে দেয়, তখন গানটি পাঠক ও দর্শকের মনে নতুন করে প্রতিধ্বনিত হয়, আবেগের তীব্রতায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে গানকে শুধুমাত্র অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং তা নাটকের আবহ ও চরিত্রের অন্তর্গত অনুভূতির বাহক হয়ে উঠেছে। নিজের নাটকে গানের প্রয়োগ সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, এটি যোগাযোগের (communication) একটি নতুন কৌশল। তাঁর মতে

"অনেক কথা যা মুখে বলে চরিত্ররা দর্শকদের বোঝাতে পারছে না, কিংবা বহু নাটকে ব্যবহৃত হয়ে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে গেছে, তাদের ভঙ্গি এবং উচ্চারণ এত চেনা যে দর্শকরা সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান না। অথচ, যদি সেই কথাগুলো গানের মাধ্যমে বলা যায়, তাহলে দর্শকরা তা শুনেও আনন্দ পান এবং সুরের আবেদনেও সাড়া দেন।"[৪]

একজন নাট্যবিভাগের অধ্যাপক হিসেবে মনোজ মিত্র একদিকে যেমন পরিচিত সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে, তেমনি দেশীয় নানা আঙ্গিকের নাট্যশৈলীর সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি এই দুই ধারাকে মিলিয়ে এমন এক অভিনব উপস্থাপনা গড়ে তুলেছেন, যা নাটকের সার্বিক গঠনকে শক্তিশালী করেছে। তাঁর নাটকে গান কখনো এসেছে প্রস্তাবনা বা উপসংহারের অংশ হিসেবেও, আবার কখনো দেশীয় লোকনাট্যের কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে নাটকের প্রতিটি গান নাট্যতাত্ত্বিক গুরুত্ব পেয়েছে এমন নয়, কিন্তু কোনো গানই পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে অসঙ্গত হয়নি। বরং চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ফলে গানগুলো নাটকের আত্মার অংশ হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ যে গানকে কেন্দ্র করেই ঘটে, সেটি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশই গীতিনির্ভর। এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্যক সচেতন ছিলেন বলেই মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে গানের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও কার্যকরী প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছেন।

মনোজ মিত্রের নাটকে গানের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যবহৃত হয়েছে কৌতুককর আবহ তৈরি করতে। কখনো ভারতীয় নাট্যধারার অনুসরণে দেবতাদের নিয়ে বিদ্রূপাত্মক রস সৃষ্টি করা হয়েছে, কখনো সমাজ ও রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করা

হয়েছে, আবার কখনো মানবচরিত্রের নানা দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাস্যরস, মজা, কৌতুকের অন্তরালে এই গানে এপিক থিয়েটারের (Epic Theatre) ছাপ দেখা গেলেও, মনোজ মিত্রের নাট্যরীতি মূলত দেশজ ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি তাঁর নাটকে দেশীয় মাটির শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের আধুনিক নাট্যভাবনার সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। দৈনন্দিন পরিচিত সমাজ-বাস্তবতাকে মঞ্চে তুলে ধরার জন্য ব্রেখট যে ভিন্নমাত্রিক উপস্থাপনার কথা বলেছেন, মনোজ মিত্রের নাটকে সেই চমকের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। তাঁর নাটকের গানগুলো শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, এগুলো সমাজচেতনাকে উন্মোচিত করে, দর্শকের মনে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। সামাজিক সত্যকে তুলে ধরা, বিশ্লেষণ করা এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই গানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আকর গ্রন্থ ঃ

মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড থেকে পঞ্চম), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লি. কলকাতা-৭৩, কার্ত্তিক ১৪১০

তথ্যসূত্র :

১) ঘোষ, ড. অজিতকুমার, 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ' (নাটকে সঙ্গীত) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ.১৬৪-৬৫।

২) ভট্টাচার্য, সাধন কুমার, 'নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ' (নাটকে সঙ্গীত এবং তার সুর ও লয়) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭,প্রথম দে'জ সংস্ক, নভেম্বর ২০০২, পৃ.১৪৪।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য, 'বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার' গ্রন্থে উৎকলিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.২৮।

৪) চেতনা নাট্য উৎসব, মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬।

কেশবচন্দ্র সাহা
সত্যজিৎ সমীপে অভিনেতা মনোজ মিত্র

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বাংলা নাটকের ধারায় মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪) এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশের ধূলিহর গ্রামে। দেশভাগের অব্যবহিত পরে, সামাজিক দায়বদ্ধতায় আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে মনোজ মিত্রের পূর্ববঙ্গের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক। ১৯৪৭ সালে নয় বছর বয়সে তিনি 'রামের সুমতি' নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন অভিভাবকের অনুমতিতে। ১৯৪৯-এ বিজয়া উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রোগের চিকিৎসা' হাস্যকৌতুকে দুষ্টু ছেলে হারাধনের ভুমিকায় তাঁর প্রথম অভিনয়। ১৯৫০-এর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা সপরিবারে চলে আসেন ভারতবর্ষে, কলকাতার বেলেঘাটায়। মঞ্চে বাস্তব-সত্য অভিনয়ের ঝোঁক তাঁকে বরাবর টানত। ঠিক এই জায়গাতেই চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর মানস-সাম্যের ভূমি। বাস্তবতার সহযোগে অভিনয়ের সাধারণীকরণ। কৃত্রিমতাকে প্রকৃতির সন্নিকটে নিয়ে আসা। ১৯৫৮-১৯৫৯-এ নিজের লেখা 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি। স্বরচিত 'সাজানো বাগান' (রচনা-১৯৭৬, অভিনয়-১৯৭৭) নাটকের চলচ্চিত্রায়িত রূপ 'বাঞ্ছারামের বাগান'(১৯৮০)-এ অভিনয় তপন সিংহ-র পরিচালনায়। ছায়াচিত্রে নাট্যকার ও নট মনোজ মিত্রের প্রথম সাড়া জাগানো রূপদানে তৈরি হল এক নতুন অধ্যায়। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার বয়সের বিভেদ মঞ্চে আর পর্দায় প্রভাব ফেলতে পারল না, বরং মসৃণ রূপায়ণে বাঞ্ছারাম চরিত্রটিকে মনোজ মিত্র করে তুললেন পরম উপভোগ্য আর বিশ্বাসযোগ্য।

এক স্মৃতিচারণে মনোজ মিত্র আমাদের জানিয়েছেন,- "মানিকদার সঙ্গে আমার কাজের কথা শুরু হয়েছিল ভারি অদ্ভুতভাবে। আমার নাটক 'সাজানো বাগান' অবলম্বনে 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবি বানালেন তপন সিংহ। আমন্ত্রণ পেয়ে তার প্রেস-শো'তে আমি গেলাম। শিশির মঞ্চে ছিল সেই অনুষ্ঠান। ভেতরে ঢুকতেই আমাকে সামনের রো-তে বসতে বলা হল। আমি কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেলাম, সেখানে সত্যজিৎ রায় বসে আছেন। ওঁকে দেখেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে পেছনদিকে চলে এলাম। সেখানে কয়েকজন টেকনিশিয়ানের পাশে বসে পড়লাম।" 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে বাঞ্ছারাম চরিত্রে মনোজ মিত্রের সাবলীল অভিনয় মনে ধরেছিল সত্যজিৎ রায়ের। মনোজ মিত্র কুণ্ঠাবশত পিছনের সারিতে বসলেও জহুরি সত্যজিৎ কাছে ডেকে নিয়েছিলেন সকলের 'বাঞ্ছা'-কে। মনোজ মিত্রের কথায়,- "সত্যজিৎবাবু আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন,- 'আমার একটা ভুল হয়েছে জানো? তা হল, বয়স্ক লোককে দিয়েই বয়স্ক

লোকের অভিনয় করানো। তার ফলে, বয়সের কারণে বেশি পরিশ্রম করা স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হয়নি অভিনেতার। কিন্তু তপনবাবু তোমার মতো মাঝবয়সি অভিনেতাকে দিয়ে এ-ছবির গোটা অভিনয়টা করানোয় অজস্র কাজ করাতে পেরেছেন"। এই কথোপকথন প্রকৃতপক্ষে মুগ্ধ সত্যজিৎ রায়ের, শিল্পী অভিনেতা মনোজ মিত্রের প্রতি পরোক্ষ এক প্রতিপোষণ ভাষ্য। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অনেক ছবির কুশীলব তো থিয়েটার থেকেই আহৃত। মনোজ মিত্র সেই সারণিতে নবতম সংযোজন। আপ্লুত সত্যজিৎ(মনোজ মিত্রের কথায়) "তারপর বললেন, অনেকদিন ধরে ভাবছি একটা ছবি করব। তুমি করবে অভিনয় আমার ছবিতে? আমি বললাম হ্যাঁ করব। বললেন, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটা নিয়ে ছবি করার কথা ভাবছি।............. আমি তোমায় খবর দেব।"

'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে অভিনয় দেখার পর যোগ্য শিল্পীকে নিজের ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাবই তো একপ্রকারের স্বীকরণ। বিপরীত দিকের অভাবনীয় এই অনুরোধে, মনোজ মিত্রের তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান যেন সেই ভরসার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ। ১৯৮০-র শিশির মঞ্চের প্রাঙ্গণ সন্ধ্যার আলাপ বাস্তব চেহারায় ফিরে এল ১৯৮৩-তে, 'ঘরে-বাইরে' ছবির শুটিং স্পটে। ১৯৮৫ তে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ঘরে-বাইরে' হওয়ার কথা ছিল ১৯৪৮-এ। নানাবিধ কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' ছবি করার বাসনাটি সত্যজিতের সুপ্ত অবচেতনে ছিলই। বিলম্বের কারণ, অনেক সময় চিত্রনাট্য অনুযায়ী পরিচালকের মানসপটের উপযুক্ত চরিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীর অপ্রতুলতা। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় মনোজ মিত্র অভিনয় করেছেন, 'ঘরে-বাইরে' আর 'গণশত্রু' ছবিতে। 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে বৃদ্ধ মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু চরিত্রটির জন্য সত্যজিৎ মনোনীত করলেন মনোজ মিত্রকে।

থিয়েটার আর চলচ্চিত্র যেহেতু ভিন্ন গণমাধ্যম, তাই তার প্রকাশভঙ্গিমা স্বাভাবিক ভাবেই পৃথক। তাই চরিত্রাভিনয় আরোপিত না হয়ে, তা যেন হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত সেই দিকে পরিচালককে খেয়াল রাখতেই হয়। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একবার জানিয়েছিলেন,— "সিনেমায় রূপদানে মঞ্চাভিনেতা উৎপল দত্তের মধ্যে অনেক সময় থিয়েটারি অভিনয় প্রবণতা লক্ষণীয়।" মনোজ মিত্রের ভাবনায়,—"সিনেমায় অভিনেতার একটা বড় সুযোগ হল, হৃদয় থেকে তুলে এনে একটা কথাকে সবটুকু দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া। আমিও সে সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। ফিল্মের এই মাপটাকে যদি কোনো অভিনেতা আয়ত্ত করেন, তাহলে থিয়েটার ও ফিল্ম — দু-ক্ষেত্রেই তিনি ভালো কাজ করবেন। মানিকদার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মঞ্চের এই শিক্ষা খুবই কাজে লেগেছে।" ভিন্ন মাধ্যমে অভিনেতার অভিনয় ঘরানা যে পৃথক হবেই সেই সচেতনতা বোধ শিল্পীর থাকা উচিত বলেই মনোজ মিত্র মনে করেন।

১৯৮১-র মে মাসে সত্যজিৎ রায়, মারি সিটনকে লেখা এক চিঠিতে জানালেন, "আগামী নভেম্বরে তিনি 'ঘরে-বাইরে' ছবির শুটিং শুরু করবেন। এই চিঠি লেখার সময়কালে চলছে 'ঘরে-বাইরে' চিত্রনাট্য রচনার কাজ। ১৯৮১-র জুলাই মাসে শেষ হয় চিত্রনাট্য রচনার কাজ। ১৯৮২ সালের শেষদিকে শুরু হয় ছবির শুটিং। মাস্টারমশায়ের চরিত্রে মনোজ মিত্র। আমরা অনুমান করে নিতেই পারি, পরিচালকের মনের ছবির সঙ্গে মিলেছিল বলেই এই নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আমরা দেখতে পাই একটি বিশেষ ভূমিকায়। তিনি ছাত্র নিখিলেশের জীবনের সঙ্গে প্রায় ত্রিশটি বছর জড়িয়ে। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক অতিক্রম করে চন্দ্রনাথবাবু, জমিদার নিখিলেশের অভিভাবক তথা সুপরামর্শদাতা। উপন্যাসে নিখিলেশের বয়ানে আমরা শুনি,- "..........ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন — তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।...................তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।" রক্তের সম্পর্ক না থেকেও চন্দ্রনাথবাবু ও নিখিলেশের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে এক অদৃশ্য অন্তরতম সম্পর্ক।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সত্যজিৎ রচিত সমনামী সিনেমার আখ্যান। ভাব-সামঞ্জস্য আর কাহিনির গতি প্রদানের নিরিখে পরিচালক তাঁর নিজস্ব সৃজন স্বাধীনতায় ছায়াচিত্রে বজায় রেখেছেন চরিত্র আর ঘটনার সংযোজন-বিয়োজনের স্বাভাবিক নীতিকে। আমরা জানি 'পথের পাঁচালী' থেকেই এই বিষয়ে সমূহ বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র। আত্মকথনমূলক এই উপন্যাসে ত্রয়ী কেন্দ্রীয় চরিত্রের বহির্বৃত্তে অবস্থান করেছেন মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু। কিন্তু নিখিলেশের চরিত্র ও মানস গঠনে মাস্টারমশায় চরিত্রিটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপন্যাসে নিখিলেশ স্বকথনে জানিয়েছে,-"........ তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে,না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে।" দীর্ঘদিনের সাহচর্যে শিক্ষক প্রাপ্ত আত্তীকৃত গুণের বলিষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসের অন্তিমে নিখিলেশের মানুষকে বাঁচাতে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। 'ঘরে-বাইরে' চলচ্ছবিতে মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুর উপস্থিতি সেই গুরুত্বকে স্বীকার করেই। সিনেমায় উক্ত চরিত্রটি রূপায়নে মনোজ মিত্র পরিচালকের বিশ্বাসের মর্যাদা কতটা রক্ষা করতে পারলেন এখন সেটাই দেখার।

উপন্যাসে ছদ্ম দেশভক্তি বনাম প্রকৃত স্বদেশপ্রীতির একটা দ্বন্দ্ব সন্দীপ-নিখিলেশ চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'ঘরে-বাইরে' আখ্যানে মাস্টারমশায়ের অন্তর, সমষ্টির কল্যাণবোধের ভাবনায় বিশেষভাবে ভাবিত ও তাড়িত। এই আদর্শের উদ্বুদ্ধ প্রতিফলন আমরা খেয়াল করি নিখিলেশের সমাজ তথা মানবকল্যাণ চেতনায়। সন্দীপদের উদ্দেশ্য আন্দোলনকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গোছানোয়। চলচ্চিত্রেও সত্যজিৎ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সমভাবনার। ছায়াচিত্রে সন্দীপের প্রতি বিমর্ষ, মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুর

অন্তঃক্রুদ্ধ উক্তি,—"আপনারা সব লীডার হয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পেছনে ছুটেছেন — দেশের লোকের কথা ভাবছেন না। নিখিল নিজের কথা একবারও চিন্তা করেনি।............ কিন্তু ওর পথটাই ছিল ঠিক! আপনাদেরটা ভুল। শুধু ভুল নয় দেশের পক্ষে হানিকর, ডেঞ্জারাস!" সংলাপ উপস্থাপনে চরিত্রাভিনেতা মনোজ মিত্রের শরীরী অভিব্যক্তি আর কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামায় চরিত্রটি আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে উপভোগ্য আর প্রাণবন্ত। পরিচালকের স্বাধীনতা প্রদানে অভিনেতার অভিনয় সত্তার পরিস্ফুটন হয় স্বাভাবিক। মনোজ মিত্রের লোক জীবনের প্রতি টান ছিল আশৈশব। দায়িত্বশীল গৃহশিক্ষকের স্বরূপ তথা প্রভাব তার নিজের জীবনেও ছিল।

সিনেমায় স্বদেশি আন্দোলনের সংকট কালেও সন্তানসম ছাত্রের জন্য উদ্বিগ্ন মাস্টারমশায়ের সস্নেহ ভালোবাসার স্বর স্পর্শ করে আমাদের হৃদয়কে। ছবিতে এক রাত্রি দৃশ্যে চন্দ্রনাথবাবু, প্রিয় ছাত্র নিখিলেশের বাড়িতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স খুলে প্যাসিফ্লোরো ওষুধটি খুঁজছেন। স্বদেশি আলোড়নের প্রেক্ষাপটে নেতা সন্দীপের স্বার্থময় আগ্রাসী মনোভাবের পাশাপাশি, হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের বিষবাষ্প নিখিলেশের শুকসায়রের জমিদারিকেও একসময়, ক্রমশ গ্রাস করবে, এই দুর্ভাবনায় মাস্টারমশায়ের চোখের ঘুম অন্তর্হিত। তাই উক্ত ওষুধের অন্বেষণ। মনোজ মিত্রের স্মৃতিকথনে আমরা শুনি,- "ঘরে-বাইরে' ছবির একটি দৃশ্যে নিখিলেশের বাড়িতে মাস্টারমশায়ের হোমিওপ্যাথি চেম্বারের দৃশ্য। চকদিঘিতে হয়েছিল সেই শুটিং। সেখানে মানিকদা বললেন, 'ডাক্তারের চেম্বারের ওষুধের শিশিগুলো খালি কেন? ওগুলোতে জল-টল কিছু একটা দাও। না- হলে ওর ভেতরে ওষুধ আছে কীভাবে লোকে বুঝবে? অর্থাৎ মানিকদার চোখে একটা খালি শিশি আর একটা বস্তু-সহ শিশির ফারাকটা ধরা পড়ল। এর ফলে শটটা অনেক বাস্তবসম্মত হল। এতটাই খুঁতখুঁতে ছিলেন মানুষটা। আর এই ফিল্মের ছোটো ছোটো ডিটেলের কাজই কিন্তু সব, যা একজন অভিনেতা বা পরিচালককে বাস্তবসম্মত হতে সাহায্য করে"। সিনেমার একটি আখ্যানকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি দর্শকের প্রতি পরিচালকের দায়বদ্ধতার বিষয়টি আমাদের ভাবায়। অন্যদিকে পরিচালকও, অভিনেতার অভিনয় সত্তাটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন। আলোচ্য অংশে সৃজনকারের সজাগ দৃষ্টি আর স্রষ্টার প্রতি অভিনেতার আন্তরিক শ্রদ্ধা আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না।

স্বদেশি জাগরণের আগুনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি হয়েছে ভস্মীভূত। অন্যান্য জায়গার মতো নিখিলেশের জমিদারি শুকসায়রেও বিনষ্ট হয়েছে এই সামাজিক ভারসাম্য। বন্দুকের গুলির আওয়াজ পেয়েই উদ্বিগ্ন, উদভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু গভীর রাত্রিতে আলু-থালু পরিচ্ছদে উপস্থিত হয়েছেন জমিদার ছাত্র নিখিলেশের বাড়িতে। মনোজ মিত্রের এই ছবি সম্পর্কিত এক সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি,- "এ ছবিতে আর একটা শটে আমি নিখিলেশকে দূর থেকে ডাকতে ডাকতে ঢুকছিলাম। সেখানে

আমার কাঁধে একটা চাদর ছিল। মানিকদা দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, চাদরটা মাথায় চাষিদের মতো বেঁধে নিতে। কারণ, ছুটলে তো কাঁধ থেকে সেটা পড়ে যাওয়ার কথা! আমি নির্দেশ পালন করতেই, শর্টটা অনেক বাস্তবসম্মত হয়ে উঠল। এমনই চোখ ছিল মানিকদার!" এই পর্বে মনোজ মিত্রের অভিনয় দক্ষতার নৈপুণ্যকে আজীবন স্মৃতিপটে চিত্রিত করে রেখেছিলেন সত্যজিৎ। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি প্রথম শটে মাস্টারমশায়ের কাঁধের চাদর ছিল সুবিন্যস্ত। কিন্তু বিপদে চলমান অবস্থায় তা যথাস্থানে না থাকারই কথা। বরং তা দিয়ে মাথা ঢেকে নিলে আত্মগোপন প্রচেষ্টার পাশাপাশি, চরিত্রের ভয়ার্ত আবহটিও বজায় থাকে। আবারও অভিনেতা মনোজ মিত্র পরিচালকের এই তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনী শক্তিকে জানিয়েছেন কুর্ণিশ। এই ছবি সম্পর্কিত স্মৃতিচারণে মনোজ মিত্র আরও জানিয়েছেন, - "ঘরে-বাইরে' ছবির শুটিং-এর সময় আমরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসেই থাকতাম। সকালবেলা সেখান থেকে চলে যেতাম চকদিঘি। কাজটা করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম।" ছবিতে মাস্টারমশায় চরিত্রের অভিনেতা মনোজ মিত্রের উপস্থিতি মাত্র চারটি দৃশ্যে। তাও আবার দুটি দৃশ্যের উপস্থিতি ও সংলাপ যৎসামান্য। কেন্দ্রীয় ভূমিকাও তাঁর নয়। কিন্তু স্বল্প পরিসরের কাজ হলেও অভিনেতা মনোজ মিত্রের আনন্দের ভাগটি ছিল ষোলোআনা।

১৯৮৮-র ২৯ অক্টোবর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় প্রথম অবহিত করেন নরওয়ের প্রবাদপ্রতিম নাটককার হেনরিক ইবসেনের 'An Enemy of the People'(En Folkefiende,1882) নাটককে ভিত্তি করে সৃষ্টি হবে তাঁর পরবর্তী ছবি 'গণশত্রু'। 'ঘরে-বাইরে' করার পর ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে পাঁচ বছর ছবি করার কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল। ১৯৮৮-তে স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি লক্ষ করে ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেন যে আমি আবার ছবি করতে পারি, তবে বিনা শর্তে নয়। শর্তটি হল, ...পুরো ছবিটাই তুলতে হবে স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে। ....ডাক্তারের নির্দেশ মানতে হলে প্রথমেই স্থির করা দরকার ছবির বিষয়বস্তু কেমন হবে। সংলাপ বহুল ছবি হবে এটা একরকম ধরেই নিয়েছিলাম। এই ধরনের ছবিতে দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয়—নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আর জবরদস্ত অভিনয়।" (শারদীয়'এক্ষণ', ১-২ সংখ্যা,১৩৯৭ পরিচালকের কথা : সত্যজিৎ রায়) 'গণশত্রু' ছবির প্রস্তুতি পর্বের প্রাক-কথন প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের এই স্মৃতিচারণ। শারীরিক প্রতিকূলতায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে প্রিয় কাজের পরিধিকে করতে হয়েছে সীমাবদ্ধ। তাই ভাবতে হয়েছে নতুন করে। তারই ফলশ্রুতি ঝুঁকি নিয়ে আনকোরা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন। কারণ নবাগতদের, অভিনয় অনুশীলনের ধকল সহ্য করা তাঁর সাধ্যাতীত। ছবিতে পশ্চিমবঙ্গের কল্পিত গ্রাম চণ্ডীপুরের মুখপত্র 'জনবার্তা' সংবাদপত্রের মুদ্রক ও প্রকাশক অধীর মুখার্জি চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হলেন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা মনোজ মিত্র।

"ইবসেনের 'An Enemy of the People' আমি কলেজে থাকতে পড়েছিলাম এবং পড়ে ভালো লেগেছিল। সেটা আবার নতুন করে পড়ে, নতুন করে ভালো লাগল। শুধু তাই নয়; এটাও বুঝতে পারলাম যে ইবসেন আজ থেকে একশো বছর আগের নরওয়েতে দূষিত জলকে কেন্দ্র করে যে নাটকের সৃষ্টি করেছিলেন, সেটা আজকের দিনে আমাদের দেশেও ঘটতে পারে। 'গণশত্রু'-র সূত্রপাত এই উপলব্ধিতেই।" ('এক্ষণ',শারদীয়, ১-২ সংখ্যা,১৩৯৭,পরিচালকের কথা ঃ সত্যজিৎ রায়) এই প্রথম সত্যজিৎ ইউরোপীয় নাটক অবলম্বনে রূপ দিলেন স্বরচিত চিত্রনাট্যের। স্থান, কাল,মহাদেশ ও স্রষ্টার পরিবর্তনে যে মূল আখ্যানের ভিন্নতা দেখা দেবে তা স্বাভাবিক। ভাবান্তরের ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে সমসাময়িক নয়, সুদূরপ্রসারী প্রাসঙ্গিকতাকেই সত্যজিৎ অন্য আখ্যানে করেছেন বয়ন। "ঘটনাকাল এবং পটভূমিকা পরিবর্তনের ফলে নাটকে কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল, পরিসমাপ্তিতে একটা আশার আলোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় না যে 'গণশত্রু' ছবি দেখে বা এর চিত্রনাট্য পড়ে ইবসেনকে চিনতে অসুবিধা হবে।" ('এক্ষণ', শারদীয়,১-২ সংখ্যা,১৩৯৭,পরিচালকের কথা : সত্যজিৎ রায়)

একশ বছরের বেশি পুরোনো ও নরওয়ের বিখ্যাত ও বিতর্কিত কাহিনিকে সত্যজিৎ এনে ফেললেন পশ্চিমবঙ্গের কল্পিত গ্রাম চণ্ডীপুরে। ইবসেনের মূল নাটকে ছিল 'স্পা ওয়াটার্স' দূষণ, নতুন চিত্রনাট্যে তা ভুবনপল্লীর(নামটি ব্যঞ্জনাময়) ত্রিপুরেশ্বর মন্দিরের জল দূষণ তথা চরণামৃত দূষণের মতো গূঢ় প্রসঙ্গে রূপান্তরিত। ইবসেনের নাটকের আদর্শবাদী ডাক্তার স্টকমান এই সিনেমায় ডাক্তার অশোক গুপ্ত, মূল নাটকের সম্পাদক হোভসস্টাড এখানে হরিদাস বাগচি, আর মুদ্রক মিস্টার আসলাক্সেন আমাদের 'গণশত্রু' সিনেমায় মনোজ মিত্র অভিনীত অধীর মুখার্জি চরিত্রটি। মূল নাটকে শুধুই মুদ্রক হলেও এই ছবিতে,অধীর মুখার্জি চরিত্রটি মুদ্রক ও প্রকাশক - দ্বৈত ভূমিকায়। অতিরিক্ত ভূমিকা সংযোজনে চরিত্রটিতে দ্বান্দ্বিকতার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়। চরিত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে 'আমাদের কথা'-য় বিজয়া রায় জানিয়েছেন,—"প্রধান(ডাক্তার) চরিত্রের জন্য যথারীতি সৌমিত্রকে ঠিক করলেন। বললেন- "ও আমার ছবিতে অভিনয় করে করে এমন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, ওর পেছনে আমাকে খাটতে হবে না।" ....অন্যান্য ভূমিকায় দীপঙ্কর দে আর মনোজ মিত্রের কথাও আমাকে বললেন।"

বর্ধিষ্ণু মফস্বল শহর চন্ডীপুরের ত্রিপুরেশ্বর মন্দির ভুবনপল্লীতে স্থিত। এই মন্দিরের দেবতা খুব জাগ্রত, স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত হৃদয়ের আরাধ্য-মন্দিরে মহাদেব অধিষ্ঠিত। নিজেদের অজান্তেই মন্দিরের চরণামৃত পান করে ভক্তদের অনেকেই জলবাহিত রোগে আক্রান্ত। ডাক্তার অশোক গুপ্ত তা প্রমাণ পেয়েই 'জনবার্তা' কাগজে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন নিজস্ব দায়বদ্ধতা থেকেই। মুদ্রক ও প্রকাশক অধীরবাবু শৈব ভক্তজনের অন্ধ বিশ্বাসে আঘাতের কথা প্রথম জানিয়েছেন ডাক্তার গুপ্তকে। আবার সেই সঙ্গে তিনি যে

প্রভাবশালী, তাই ভয়ের কিছু নেই, বরং তাঁকে ভরসা করা যায় তাও ডাক্তার গুপ্তের বাড়িতে এসে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই কথাও দিয়েছেন,- স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ডাক্তার গুপ্তকে ভবিষ্যতে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হবে। মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব ছাড়াও 'জনবার্তা' কাগজের পেপার আর প্রিন্টিং সামগ্রী কেনার টাকাও তিনি ধার দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিপরীত দিকে আমরা খেয়াল করি, ভীতু এই মানুষটি নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন একটা সংকীর্ণ আবর্তের মধ্যে। সত্য, কিন্তু বিতর্কিত বিষয় ছেপে প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা আর সংশয় তাঁকে আগলে রাখে। জনস্বাস্থ্যের তুলনায় ব্যক্তি স্বার্থ তাঁর কাছে অনেক বড়ো।

বিজ্ঞান তার তথ্য-প্রমাণ আর যুক্তি নিয়ে স্বার্থান্বেষী ধর্ম ব্যবসায়ীদের সম্মুখে উপস্থিত হলে সংকট ঘনিয়ে আসে। ডাক্তার অশোক গুপ্তের সঙ্গে, চেয়ারম্যান ভাই আর মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ভার্গবের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটা দ্বন্দ্বের আবহ। জলদূষণে চন্ডীপুর বিপন্ন, এই সংবাদ প্রকাশ পেলে ব্যাবসা মার খাবে, ঘা লাগবে অনেকের স্বার্থে। স্বার্থপর মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা প্রচারেজনগণের প্রকৃত বন্ধু ডাক্তার অশোক গুপ্তকে সমাজের কাছে পরিণত করে দিয়েছে শত্রুতে। কাপুরুষের মতো সেই ভারী দলে যোগদান করেছেন প্রকাশক অধীর মুখার্জি; উদ্দেশ্য সমষ্টি নয় - ব্যক্তিস্বার্থে। এই অন্যায় অভিসন্ধিতে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ডাক্তার অপ্রতিরোধ্য। প্রয়োজনের এই মুহূর্তে অধীর মুখার্জি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সঙ্গ দিয়েছেন মন্দ পক্ষের। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই অবস্থানই বজায় থেকেছে। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন মানসিক অবস্থানে নিজেকে থিতু রেখেছেন অধীর মুখার্জি। অনুকূল পরিস্থিতিতে ভালো কাজের জন্য বাড়িতে এসে অভ্যর্থনা আর সমর্থন কিন্তু উপযুক্ত সময়ে প্রতিবাদী না হয়ে স্ব-স্বার্থে ক্ষমতার দিকে ঢলে পড়া। অধীর মুখার্জির মধ্যে এই প্রবণতা খেয়াল করা যায়। মনোজ মিত্র তাঁর সহজাত ও সপ্রতিভ অভিনয় শৈলীতে বিবর্তিত চরিত্রটির সার্থক রূপদান করেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। ১৯৭৫ সালে লন্ডনের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকার সঙ্গে আলাপচারিতায় সত্যজিৎ রায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন,—"কোনো চরিত্র যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, তখনই সেই চরিত্রের আসল সত্তা প্রকাশিত হয়। কারণ, চরিত্রটি একাধিক পথের সন্ধান করে অনিশ্চিত অবস্থার সমাধানের জন্য। এবং শেষ পর্যন্ত যে-পথটি বেছে নেয়, সেই পথই সেই চরিত্রের মানসিকতার আসল পরিচয়। মনোজ মিত্র অভিনীত চরিত্রটির শরীরী অভিব্যক্তিতে, কণ্ঠস্বরে সেই পরিচয় প্রকাশিত।"

এই ছবির স্মৃতি রোমন্থনে মনোজ মিত্র এক সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছেন,- 'গণশত্রু' ছবির শুটিং হয়েছিল কলকাতাতেই। দু-একটি দৃশ্য শুধু আমাদের রিহার্সালের থেকে আলাদা ভাবে তোলা হয়েছিল। একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। গঙ্গার জল শুদ্ধ না অশুদ্ধ — তা নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছিল। তো, গঙ্গার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমি কপালে হাত ছোঁয়ালাম। তাতে মানিকদা খুব খুশি হলেন।" অর্থাৎ আমরা অনুমান

করে নিতে পারি, মনোজ মিত্রের ম্যানারিজম তথা অভিনয় কৌশলে সন্তুষ্ট ছিলেন সত্যজিৎ। এই স্মরণিকার একটি বিশেষ কারণ আছে। এক ব্যক্তিগত আলাপে সত্যজিৎ, মনোজ মিত্রের কাছে আপন মত প্রকাশ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন,- থিয়েটারের শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে সত্যজিতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে অপারগ। কিন্তু মনোজ মিত্র অভিনীত চরিত্র দুটিতে সত্যজিৎ ছিলেন প্রসন্ন, তা আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে।

'ঘরে-বাইরে' আর 'গণশত্রু' ছবিতে মনোজ মিত্রের ভূমিকা একে অপরের থেকে পৃথক। প্রথম ছবিতে তিনি মাস্টারমশায়, মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর সফল ছাত্র নিখিলেশ চৌধুরী। বড়োলোক তথা জমিদার হয়েও তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভক্তি পিতৃতুল্য মাস্টারমশায়ের চরণে সদা সমর্পিত। মাস্টারমশায়ও প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে। মেকি স্বদেশি সন্দীপের চাতুরীতে তাঁর মেধাবী ছাত্র অমূল্য বেপথু হলে তাঁর কষ্ট হয়। আবার 'গণশত্রু' ছবিতে স্বার্থপর, ভীরু, ভগ্ন মানসিকতার প্রতিফলন অধীর মুখার্জি চরিত্রটি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী হওয়ার পরিবর্তে, তিনি আপস করেন প্রভাবশালীদের সঙ্গে। অর্থাৎ সাদা আর কালো দুটি ভিন্ন চরিত্রের অভিনয়েই তিনি সমান সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। সেই সঙ্গে পরিচালকের কৃতিত্বও সমানভাবে স্মরণীয়।

স্মৃতিমেদুর মনোজ মিত্র জানিয়েছেন,- "আসলে, মানিকদা ছিলেন আপনজন। অত বড় মাপের মানুষ, কিন্তু কখনোই জাহির করতেন না। একদিন ওঁর বাড়িতে গেছি। ওঁর সেই বিশাল দরজার সামনে দাঁড়ালাম। সে দরজা তো আমার চেয়ে অনেক উঁচু। আমাকে বসতে বলা হল তারপর। সেখানে ঢুকেই দেখতে পেলাম ওঁর সেই বিখ্যাত চেয়ার। .... সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। উনি চিঁড়েভাজা খেতে খেতে ঢুকলেন ঘরে। বললেন বড্ড সর্দি হয়েছে বুঝলে! তারপর আমাকেও দিতে চাইলেন চিঁড়ে। বললাম,- "আমার তো সর্দি হয়নি। বললেন, হবে'! তার আগেই খেয়ে নাও...........।" এমনই দিলখোলা মানুষ ছিলেন মানিকদা। .... সব খোঁজ রাখতেন। মানুষের মন খুব ভালো বুঝতেন। তাই সবাইকেই তার প্রাপ্য সম্মানটা দিতেন।" প্রখর রসবোধ আর ধ্যানী চিত্তের একাত্মতা - সত্যজিৎ রায়ের এই দ্বৈত গুণের একত্র সমাবেশ; অনেকের মতো মুগ্ধ করেছে মনোজ মিত্রকেও। সফলতা গগনচুম্বী হলেও পা-দুটো তাঁর মিশে থাকত মাটিতেই। মননের উচ্চতা আর নির্লোভি মানসিকতা জীবদ্দশাতেই তাঁকে পরিণত করেছিল কিংবদন্তিতে। আমরা তো জানি, জীবন ছোটো হলেও সৃজন সর্বদাই বড়ো। মানুষ সত্যজিৎ অনেকের মতোই বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল মনোজ মিত্রকেও। নির্মল আনন্দই ছিল সত্যজিতের সকল সফলতার উৎসমুখ। সেই অনন্ত আনন্দধারার স্পর্শে অভিভূত হয়েছেন মনোজ মিত্রও।

এই যে অভিনেতা মনোজমিত্র এবং চিত্র পরিচালক সত্যজিৎরায়ের সম্পর্ক, তার চিন্তারও বৈভব বাঙালির কাছে পাথেয়।

তথ্যসূত্র :

১. বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্তরঙ্গ সত্যজিৎ, কলকাতা : ভবিষ্যৎ, ২০২৪, পৃষ্ঠা — ৫৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৪
৪. তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৪
৫. সুগত রায় ও ঋদ্ধি গোস্বামী সম্পাদিত,সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ চিত্রনাট্য ও অন্যান্য, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০২৪, পৃষ্ঠা — ২১৪-২১৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ২১৪
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪১
৮. বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্তরঙ্গ সত্যজিৎ, কলকাতা : ভবিষ্যৎ, ২০২৪, পৃষ্ঠা — ৫৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৫
১০. তদেব, পৃষ্ঠা — ৫৫
১১. পার্থ বসু, সত্যজিৎ রায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃষ্ঠা -৩৪৯-৩৫০
১২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৯-৩৫০
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা -
১৪. বিজয়া রায়, আমাদের কথা, কলকাতা : আনন্দ, ২০২১, পৃষ্ঠা - ৫০৭
১৫. অনিরুদ্ধ ধর,উজ্জ্বল চক্রবর্তী,অতনু চক্রবর্তী,পাঁচালী থেকে অস্কার (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : প্রতিভাস, ২০২২ পৃষ্ঠা - ৪৩৭
১৬. বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্তরঙ্গ সত্যজিৎ, কলকাতা : ভবিষ্যৎ, ২০২৪, পৃষ্ঠা — ৫৫
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৫ -৫৬

জি নি য়া খা তু ন
চাকভাঙা মধু : মননে-বিশ্লেষণে

মনোজ মিত্র 'চাকভাঙা মধু' নাটকে সমাজ জীবনের এক নিষ্ঠুর কঠোর চিত্র মানব হৃদয়ের করুণ দর্শনকে মরমিয়া ভাবে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার তাঁর জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিজ্ঞতা এখানে এমনভাবে মেলে ধরেছেন যে পাঠক ও দর্শক কোন এক অজানা বেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে বিষ্ণু-বসু বলেছেন— "ইহ জীবনের জরুরী সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে এমন আর কেউ করেনি। উৎপীড়ন,অনাচার, অবিচার, ভন্ডামি চারপাশের মতো শয়তানের মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক। অক্লান্তভাবে,নির্মমভাবে এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ আক্রমণ।..."[১]

'চাকভাঙা মধু' বাংলা নাটক, বাঙালির নাটক : প্রতিবাদী মানুষের জীবনের মর্মবাণী। নাটক পড়তে পড়তে মন চলে যায় বেদে-বস্তি জীবনের অন্তরে অলিন্দে। হায়রে মানব জীবন! ক্ষুধা দারিদ্র্য, অনাহার, অর্ধাহার সেখানে যেন ভূত-প্রেতের মত জড়িয়ে আছে শত শতাব্দী ধরে। সুখের রাজপ্রাসাদে বসে থাকা মানুষজন শিউরে ওঠে, এত সম্পদ, ঐশ্বর্য কোথা থেকে এসেছে। একদিকে এক ক্ষুধাভরা পেট, অন্যদিকে সেই ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে জমিদার তথা ভূস্বামী, আড়ৎদার তথা মালিক শ্রেণীর উদর। মনোজ মিত্র মনে করতেন— "মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় মানুষ। মানুষের শেষ লড়াই করবে মানুষ নিজেই।" আর তিনি এই মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

বেদে মাতলার পরিবারের এক অসহায় জীবনের পরিচয় নাটকের শুরুতে পরিদৃশ্যমান। তার মেয়ে বাদামি, স্বামী পরিত্যক্তা, ঘটনাক্রমে জানা যায় বলরামপুরের হরিশ-এর সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু পেটে বাচ্চা অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেয় তার স্বামী। আজ সে বাপের অভাবের সংসারে আর একটা বিড়ম্বনা হিসেবে দিনযাপন করছে। তিনদিন তাদের পেটে ভাত নেই। সকালে মেয়ের সাথে কলহ করে মাতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাদামি বাবাকে পথে পথে অনেক খুঁজেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। বিকালে একটা কলসি সাথে নিয়ে এসে মেয়েকে ডাকাডাকি করে এবং ঘুমন্ত বাদামি কাপড় ঠিক করে উঠে পড়ে। বাপকে দেখে সে খুব খুশি হয় কারণ সারা পৃথিবীতে এই একটিমাত্র ঠাঁই আর তার সামনে টিকে আছে।

তিন দিন তাদের পেটে অন্ন ওঠেনি, তাই মেয়ে বাবাকে শোনালে মাতলা কলসের দিকে দেখতে বলে। কলসির মধ্যে নিশ্চয়ই তালের রস বা আখের গুড় জাতীয় কিছু খেয়ে তাদের পেট ভরবে—এই আনন্দে বাদামির মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। তার বাবা জানায় দুটি মৌমাছির চাক ভেঙে মধু এনেছে, কিন্তু গোখরোর ফোঁস শুনতে পায় কলসির ভিতর

থেকে। অভিমানে বাদামির মন বিষিয়ে যায়, তাই বাবার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে তার চুল টেনে ধরে। ক্ষুধার জ্বালার থেকে পৃথিবীতে আর কোন বড় জ্বালা নেই। এই দৃশ্যে বাপ-বেটির আচরণে তা দেখা মেলে। এদিকে মাতলার কাকা জটা তাদের সংসারের আরেকটি অতিরিক্ত সদস্য যে তিন ছেলে ও স্ত্রীকে হারিয়ে ভাইপোর সংসারে বোঝা হয়ে আজও বহাল তবিয়দে বিরাজ করছে। বাবা মেয়ের এই অশান্তির মধ্যে বুড়ো জটা শিবের কীর্তন শুরু করে। তাছাড়া নাত জামাই বাদামিকে ছেড়ে চলে গেছে তার বোঝা কেন বইবে তলা। তাই তার পেটের বাচ্চাকে নষ্ট করে দিয়ে পুনরায় তাকে বিয়ে দিতে বলে ভাইপো কে —"বটে! দেখ আমার লাতজামাই তো তার কাজ হাসিল করে সরে পড়েছে, তুই কেন বয়ে বেড়াবি? খালাস করার সময় কিছু না হোক এট্টাকুড়ি টাকা লাগবেন কুথায় পাবি? লয়তো দে, খসায়ে দে!....লস্ট করে দে। ওই লেতাই কওরার মারে সময় মতো এট্টা খবর দিলি এক্কে বেলায় কম্মো ফর্সা করে দে যাবে বিটি। ওস্তাদ! কত যে পোয়াতির গভ্য পাতন করেছে মাগি!"[২]

এতক্ষণে মাতলার হুশ হয়, জেগে ওঠে পিতৃসত্তার আসল রূপ। অভাব অভিযোগ অনাহার তার সংসারে জড়িয়ে আছে, কিন্তু পিতা হিসাবে তার কর্তব্য পালনে সে পিছুপা নয়। তার মেয়ের কোল আলো করে আর একটা মানুষ এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ গ্রহণের অপেক্ষায় আছে। আর কোন অধিকারে তাকে সে হত্যা করার পথ বেছে নেবে। কাকার এই ধরনের আচরণে মাতলা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তার সংসার থেকে অতিরিক্ত বোঝা যে কাকা তা বুঝিয়ে দেয়। জটাকে তাড়া করে মাতলা মেয়ের প্রকৃত আশ্রয়দাতা রূপে তার মহান কর্তব্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। বাবা মেয়ের চিরন্তন ভালোবাসা, স্নেহ, মান-অভিমান পাঠক দর্শকের মনকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দেয়। মাতলা যে কোনোভাবে, যে করে হোক এই পৃথিবীতে আর একটা প্রাণের প্রকৃত আশ্রয়ভূমি গড়ে তুলবে—এটাই তার নবজাতকের কাছে গভীর অঙ্গীকার। এজন্য প্রয়োজনে সে জমি অর্থাৎ ভিটা পর্যন্ত মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে পিছুপা হবে না। এই পৃথিবী মাতলাকে কিছুই দেয়নি, পরিণামে অবহেলা অনাহার সুদের বোঝা সহ জমিদার তাকে তার বুড়ো শুয়োরটাও জোর করে কেটে ভাগা দিয়েছে। তাই এক বিষাক্ত অভিমান অত্যাচার আজ তার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাগ করে দিয়েছে। সেজন্য তাকে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে বলতে শুনি—

"আরো এত্তোখানি তোলাবো নতারপর মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাব পৃথিবীর বুকে! যতো বজ্জাতে মিলে আমার যে সর্বনাশ করেছে।"[৩]

এই উক্তির মধ্যে এক নাট্যিক ব্যঞ্জনা আমাদের মনে কোন এক অজানা আশঙ্কাযুক্ত ভীতির জন্ম দেয়। এই সংসার তাকে কিছুই দেয়নি। তাই তার গোখরেকে সে আরো তেজী করে ফণা তুলতে শেখাবে। মরার কালে সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সেই সব হিংস্র মানুষের

পৃথিবীর মধ্যে। তার নাতি নাতনি জন্মাবে এই জন্য সে অনেক কিছু করতে চায়, তাই যারা এই পৃথিবীর ক্ষতি সাধন করে চলেছে, সেইসব মানুষের যন্ত্রণা, যাতে আর নতুন করে আগামী প্রজন্মকে গ্রাস না করে—এইখানে মাতলার শোষণযন্ত্রণা মুক্ত নতুন পৃথিবী গঠনের ডাক শুনতে পাই।

ইতিমধ্যে বুড়ো জটা বাইরে থেকে কোন্ এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। আর তার মুখ থেকে জমিদার অঘোর ঘোষের নাম শুনেই তাদের বাপ বেটির হাড় হিম হয়ে যায়। কোথায় পালাবে কিংবা কী খাবে এই চিন্তা তাদের অস্থির করে তোলে। সুদ না দিলে আজ তাদের প্রাণে বাঁচার কোন আশা নেই বলে মনে হয়। কিন্তু জটা তাদের থামিয়ে প্রকৃত খবর শোনায়। আর যখন জানতে পারে অঘোর ঘোষের সাপে কামড়েছে তখন মাতলা যেন প্রাণ ফিরে পায়। কাকা ও ভাইপো নাচতে শুরু করে। জটার কাছে জমিদার পাঁচ কুড়ি টাকা পেতো। তাই এই সংবাদ তার কাছে বেজায় আনন্দের আর মাতলা জীবনে যত ঋণ করেছে সেগুলি সব উতরে গেল।

"জটা।। মোরুক...মোরুক...মরলি বেঁচে যাই। আমার কাছে পাঁচ কুড়ি টাকা পেতোরে...

মাতলা।। কাকা! (ছুটে গিয়ে জটাকে বুকে জড়িয়ে) শালা তুমি এতোক্ষণে বলোনি কেনে?

জটা।। আরে আমি তো বলার আয়োজন করি, তো তোরা যে বাপ বিটিতে খ্যামটা শুরু করলি—

মাতলা।। (বগলের নিচে একটা কল্পিত ঢাকে কাঠি দিয়ে) ধাঁই কুড়কুড়- ধাঁই কুড়কুড়- ধাঁই কুড়কুড়"[৪]

এই মৃত্যুর আনন্দ উৎসবে হাজির, আর এক মুসলমান চাষা ফুকনা। তারা চোলাই খেয়ে উৎসবের আয়োজনের কথা বলে। কিন্তু জটা জানায় রাতে জমিয়ে উৎসব হবে।

শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও বাদামির মাতৃ হৃদয়ের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। সে যেমন তার পেটের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে চায় ঠিক তেমনি জমিদার অঘোর ঘোষেরও প্রাণনাশ সে চায়নি। সে চায় তার পিতা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তুলুক। কারণ এটাই ওঝাদের প্রকৃত দায়িত্ব। এছাড়া এই ওঝা বিদ্যার কেরামতিতে যদি তাদের সুদিন ফিরে আসে। তাহলে তাদের বাচ্চাটা একটা সুন্দর পৃথিবী দেখতে পাবে। আর এরজন্য ফুকনার সাথে সে ঝগড়া করতেও পিছুপা হয় নি।—

"বাদামি।। বাপ! (বাদামির গলার স্বরে সবাই মুহূর্তের জন্য থেমে গেল) এট্টা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচটি লেগেছ!

ফুকনা।। ইবার যে লেচে লেচে বেঁচে থাকবো রে! আহা মুশকিল আসান করে পীর গাজী গো...আহা মুশকিল আসান করে...

বাদামি।। চলো...কত্তা মশায়ের বাড়ি!

মাতলা।। কেনে?

বাদামি।। কেনে আবার কি! তারে ঝাড়তে হবে না?"[৫]

বাদামির এই কথায় তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়, এমনকি দৈববাণী শুনলে এমন আশ্চর্য হতো না। তারা বাদামিকে জানায় ভগবান যখন কাছে ডেকেছে তারা কেন সেই পথ আটকে অনাসৃষ্টি করবে।

এতক্ষণে নাট্যকার মনোজ মিত্র এক ভিলেনকে হাজির করেন, তিনি হলেন দাক্ষায়নী ঠাকুরণ। মধ্যম বয়সী যৌবন-উত্তীর্ণ। তার সাদা শাড়ির কালো পাড়খানা যেন বিষাক্ত সাপের অবয়ব ধারণ করেছে। অর্থাৎ এক হিংস্র মূর্তি যেন তার শরীরের মধ্যমণিতে কিলবিল করছে। কোন এক গোপন কেলেঙ্কারি তার মুখটাতে স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। এই মহিলাই অঘোর ঘোষের সব অপকর্মের পথপ্রদর্শক। সম্পর্কে তার তুতোবোন। দাদাকে বাঁচাতে সেই শংকরকে নিয়ে মাতলার বাড়িতে ছুটে আসে। এই চরম দুঃখের দিনেও তার সুচতুর বাক্যবাণ আমাদের অবাক করে দেয়—

"শুনতে পাচ্ছি দাদা নাকি গাঁ সুদ্ধ মানষের পাকা ধানে মই দিয়েছে!... আর যদি সে দিয়েও থাকে মই, তাই বলে এখন সে কথা মনে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে ধম্মো দেখতে হবে?....হাতি হাবড়ে পড়লে ব্যাঙেও এইরকম চাঁটি মারে! দিন আসবে না, দিন আসবে না আমাদের? ভেবেছিস কি"।[৬]

জটা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে তার ভাইপো মাতলা বাড়িতে নেই। কারণ এই জমিদার ও তার সাগরেদ দাক্ষায়নীর অবর্ণনীয় অত্যাচার তার জীবনকেও বিষিয়ে দিয়েছে। তাই মাতলা বাড়ির ভিতরে থাকলেও তা তাদের কাছে গোপন রাখতে চায়। এমনকি বাদামিকে সাবধান করে দেয়। জটার এক রহস্যময় উক্তি আমাদের মনকে বাতাস দেয়—"মাতলা রে, আছিস ঘরে? না থাকিস তো বলে দে!"

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শংকর টাকা পয়সা ও দক্ষিণার মূল্য জানতে চায়। সে একজন শিক্ষিত, অসাধু বাপের আড়ৎদার সন্তান। মানুষ ঠকাতে সে তার বাবা ও পিসির সার্থক উত্তরসূরী। মেয়ে মানুষকে কথার ছলে ভোলানোর জন্য বাদামিকে নানা ছলনার কথা শোনায়। তার ছেড়ে যাওয়া স্বামীর মিথ্যা গল্প বানায়। তখন বাদামি তাদের আশ্বাস দেয় এবং কর্তাবাবুকে নিয়ে আসতে বলে। মানবতা মিশ্রিত লোভের খাতিরে বাদামি জমিদারকে বাঁচাতে চায় আর দাক্ষায়নী ঠাকুরণ আভিজাত্যের মত্ততায় বলে ফেলে।

"শেষ পর্যন্ত তোদের দোরে এসেই দাঁড়াতে হল রে!"[৭]

ঠাকুরণ প্রলাপ বকছে, দাদার আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় হতবাক, কিন্তু অহংকার ও আভিজাত্যের বড়াই তখনো তার হৃদয়ের বিষবাক্য অনর্গল বর্ষণ করে চলেছে। আর

অন্যদিকে গ্রামের মানুষ এতদিনের অপমান ও শোষণ পীড়নের হিসাব নিতে চায়। অঘোর ঘোষ মরুক এইটা আপামর জনতার একমাত্র দাবি।

শয়তান অঘোর ঘোষ যমের সাথে লড়াই করতে করতে আজ সে মাতলার মতো নিচু বেদের উঠানে লাশ হয়ে পড়ে আছে। এক বীভৎস যন্ত্রণায় মাতলা জটা ফুকনা প্রতিশোধ নিতে চায়। অঘোর ঘোষ যদি বাঁচে তাহলে গ্রামের মানুষ মাতলাকে আর বাঁচতে দেবে না। বিষম এই সংকটে বাদামী তার বাবাকে নিজের মনুষ্যত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বলে—"বাপ, তোমার না মানুষ খুন করতি বাঁধে?

মাতলা।। হা!

বাদামি।। তো এখন কেন খুন করো?

মাতলা।। খুন করি!

বাদামি।। করো না! তোমার হাতের মুঠোয় তার পেরাণ, সে পেরাণ তুমি তারে দাওনা!...যার উঠানে মানুষ মরে, সে কিনা আবার ওঝা!"[৮]

অবস্থা বেগতিক দেখে শংকর বাদামিকে ব্যবহার করার কৌশল আঁটে। কত্তাবাবুকে বাঁচানো যে কতটা মহৎ হবে তাকে বুঝিয়ে বলে। কিন্তু তাকে বাঁচাতে বাদামিদের ভয় করে, পাছে আবার কত্তাবাবু ভয়ঙ্কর সর্পের মতো আচরণ করে। শংকরের ভন্ডামিপূর্ণ সংলাপ তখন শুনতে পাই—

"শংকর।। (ধমকের সুরে) বাদামি! বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নেই! আরে মরলে তো সব ফুরিয়ে গেল! অঘোর ঘোষের আর কী হলো, সে তো তার মতো মরে বেঁচে গেলো! এত সর্বনাশ করেছে তোদের সেটা লোকটাকে জানাবি না! বাঁচিয়ে তোল,...দাঁড় করিয়ে বল, এই দ্যাখো কত্তা, তোমারে মারতে পারতাম...না মেরে প্রাণ দিলাম! সেটা প্রতিশোধ হবে না!"[৯]

মেয়ের জেদ ও তার ওঝা বিদ্যার কেরামতি দেখানোর জন্য মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাই বাদামিকে সেইখান থেকে সরে যেতে বলে। কারণ অঘোর ঘোষের বিষ তার গর্ভে চলে যাবে। ছেলে মেয়ে যা হবে সে ওই বিষের অনুরূপ মূর্তি ধারণ করবে। সংক্রমিত হবে তার সন্তানের মধ্যে। পিতা হিসেবে তার সন্তানের জীবনে কোন বিষবাষ্প যেন উঁকি না মারতে পারে এটাই মাতলার একমাত্র কাম্য। সেই মুহূর্তের যে বর্ণনা নাট্যকার দিয়েছেন তা আমাদের ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তাকে শানিয়ে তোলে-

"হাত পা আছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদের মতো ডুলি থেকে মুখ বাড়াল অঘোর ঘোষ"।[১০]

সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে অঘোর ঘোষ তার রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। কেন তাকে বাঁচাতে এত দেরি হল, তার সুদ কখন পাবে সহ নানা অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্যবাণ শুরু করে এবং তার বেহারারা মাতলাকে বেদম মারধর করতে থাকে।

কোন দৈববাণী নয় বা আকাশের দিকে চোখ মেলে কান্নাও নয়: নাটকের শেষে দেবী দুর্গার অসুর নাশের চিত্র পরিবেশিত হয়। মা দুর্গার রূপ নিয়ে মাতলার চির দুঃখী মেয়ে বাদামি নিজ হাতে পৃথিবীর পাপ মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আজ দিনশেষে তার সড়কির আঘাতে অঘোর ঘোষ শেষ পরিণতিতে পৌঁছায়। 'চাকভাঙা মধু' নাটকের আবেদন আজও পৃথিবীর বুকে সমানভাবে গ্রহণীয়। আর এখানেই নাট্যকার মনোজ মিত্রের শৈল্পিক সাফল্য।

তথ্যসূত্র :

১। মনোজ মিত্রের নাট্য সংকলন। মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগত-বিষ্ণু বসু।
২। তিনটি জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন- মনোজ মিত্র। পৃষ্ঠা -১১
৩। তদেব পৃষ্ঠা -১২
৪। তদেব পৃষ্ঠা -১৪
৫। তদেব পৃষ্ঠা -১৫
৬। তদেব পৃষ্ঠা -১৬-১৭
৭। তদেব পৃষ্ঠা -৩০
৮। তদেব পৃষ্ঠা -৩৯-৪০
৯। তদেব পৃষ্ঠা -৪৬
১০। তদেব পৃষ্ঠা -৪৯

জয়ন্ত কুমার মণ্ডল

মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' : একটি পর্যালোচনা।

একটি নাটক তখনই শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে যখন নাট্যকার তাঁর বক্তব্য যথার্থ নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। নাটকে একটা বক্তব্য বা উদ্দেশ্য থাকেই, কিন্তু সে বক্তব্যের প্রকাশ যদি সরাসরি হয় তাহলে নাটক বড্ড বেশি সরলরৈখিক হয়ে ওঠে। যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠা মুশকিল হয়। অনেক বড় নাট্যকারের অনেক নাটকও সেজন্য শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও সেগুলো উৎকৃষ্ট অভিনেয় নাটক হতে পারে, কিন্তু নাট্যশিল্প হিসেবে সেগুলির মূল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আবার নাটকে উদ্দেশ্যকে যথাযথ পরিবেশনের মাধ্যমে হতে পারে নাট্যশিল্প। উদাহরণস্বরূপ উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' বা 'তিতুমীর' নাটকটির কথাই স্মরণ করা যাক। উৎপল দত্ত স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন তিনি প্রপাগণ্ডিস্ট। কিন্তু সেই প্রপাগণ্ডাকে নাটকে সার্থকভাবে সমন্বিত করতে পেরেছেন তিনি। তাই তাঁর উদ্দেশ্যমূলক নাটকগুলিও শিল্প হিসেবে কালজয়ী হয়েছে। গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', যোগেশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', মন্মথ রায়ের 'কারাগার', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রভৃতি একারণেই শ্রেষ্ঠ নাটক। মনোজ মিত্রও (১৯৩৮-২০২৪) এ ধারার নাট্যকার, অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান নাট্যকার।

মনোজ মিত্র তাঁর অনেক নাটকেই পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যবহার করেছেন। অনেকসময় অবশ্য পুরাণ-প্রসঙ্গ নয়, শুধু পৌরাণিক চরিত্রের নামই তিনি ব্যবহার করেছেন। কিছু নাটকে আবার বেশ সিরিয়াসভাবে পুরাণের কাহিনিকে নিয়েছেন, এবং সে কাহিনিকে নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'অশ্বত্থামা', 'তক্ষক', 'ভেলায় ভাসে সীতা' প্রভৃতি নাটকের নাম। আবার 'পুঁটি রামায়ণ', 'শিবের অসাধ্যি', 'চোখে-আঙুল দাদা', 'যা নেই ভারতে' প্রভৃতি নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের নামটিই শুধু নেওয়া হয়েছে, কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এই ধারারই একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাটক হলো 'নরক গুলজার' (১৯৭৪, পরিমার্জন ১৯৭৬)।

মনোজ মিত্র নিজে কোনোদিনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না, যুক্ত ছিলেন না কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও। তবে অবশ্যই তাঁর স্পষ্ট রাজনৈতিক মতামত ছিল। আর সবদিনই এই মত তাঁকে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের পাশে থাকতে প্রেরণা দিয়েছে। 'নরক গুলজার' নাটকটি লেখা হয়েছে ১৯৭৪ সালে (পরিমার্জন ১৯৭৬)। সময়টি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্তাল এক সময়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সরকার তখন। যে সরকারের বিরুদ্ধে নীতিহীনতার ভুরি ভুরি অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। প্রশাসন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে জোতদার-লুম্পেনদের দলদাসে যেন পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসন সর্বত্রই ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতার চরম রূপ। এই প্রতিকূল

পরিস্থিতির বদলের স্বপ্ন দেখেছিল একদল তরুণ, যাঁরা গণতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে বন্দুকের নল দিয়ে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছিল। সমাজে সেদিন তাঁরা একটা আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভিন্ন মতকে কেন্দ্র করে তিনটি বিভাগ বিভক্ত হয়ে গেল। এই অবস্থায় একজন সমাজ-সচেতন নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রও চুপ করে থাকতে পারলেন না। গর্জে উঠলেন মঞ্চে। আর গর্জনের সবথেকে কার্যকরী মাধ্যম যে নাটক সে বিষয়ে মনোজ মিত্র ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। ফলে 'নরক গুলজার' পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক নাটক। তবে এই নাটক থেকে সরাসরি রাজনীতির কথা খুঁজতে গেলে হবে না; রাজনীতিকে নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মনোজ মিত্র এক শ্রেণির নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের নাম ব্যবহার করে কাল্পনিক নাটক লিখেছেন। এজাতীয় নাটকগুলি সবই হাস্যরসাত্মক। পুরাণের চরিত্রকে নিয়ে হাস্যরসে মাতা বাঙালির অনেক দিনের অভ্যেস। শিব ও তাঁর কর্মকাণ্ড সেজন্য বিখ্যাত। মনোজ মিত্র অবশ্য শুধু শিবেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; ব্রহ্মা, যমরাজ, চিত্রগুপ্ত প্রমুখকেও যোগ করেছেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই দেবচরিত্রগুলিকে মনোজ মিত্র সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কখনোই দেবতাদেরকে শোষকের পক্ষে দাঁড় করাননি নাট্যকার। বরং দেবতাদেরকে বিপদ-তারকেই পরিণত করেছেন, যদিও সেটা হয়েছে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে।

গণনাট্য সংঘের নাটকে দেখা যেতো শোষক ও শোষিত পক্ষের দ্বন্দ্ব, এবং সে দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয় দেখানো হতো সংঘবদ্ধ শোষিত পক্ষের। মনোজ মিত্র গণনাট্যের নাট্যকার নন। কিন্তু গণনাট্যের প্রেরণা যে তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা 'নরক গুলজার'-এর কাহিনিতেও দেখা যায়। এই নাটকেরও দুটি পক্ষ-মানিক-ফুল্লরার শোষিত পক্ষ অন্যদিকে বামনদাস ঘোড়ুই, বাঁটুল বিশ্বাস- খচো-নেংটিদেরকে নিয়ে শোষক পক্ষ। নাটকের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় হাতিবাঁধা গ্রামের জোতদার বামনদাস ঘোড়ুই 'মানকে মানকে' ডাক দিতে দিতে মঞ্চে প্রবেশ করছে। মানকে নাকি তার পুকুরের মাছ, বাঁশঝাড়ের বাঁশ চুরি করে বাবুয়ানা করে বেড়াচ্ছে।

"আর শালা এই একটা চোরেই গাঁখানা তচনচ করে দিল রে! একপুকুর মাছ, এক রাতেই কাবার সকালে উঠে দ্যাখো চুনোপুঁটিটাও পড়ে নেই! একঝাড় বাঁশ, সকালে উঠে দ্যাখো ঝাড়াপোঁছা আর হাঁসমুরগির তো কথাই নেই নজরে পড়েছে কি!"[১]

মানিকের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে জানা যায় ঘোড়ুই এভাবেই গ্রামের সকলের জমি-জায়গা দখল করে নেয়, তাদের নিঃস্ব করে দেয়। পলায়নোদ্যত মানিকের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে ঘোড়ুই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

এরপরই নাটকে দেখা যায় স্বর্গের দৃশ্য। দৃশ্যটির শুরুই হয়েছে একটি অসাধারণ মজার গানের মধ্য দিয়ে। গানটি গেয়েছে নারদ—

"কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলযোগ সইতে পারেন না।"[২]

এই গানের মাধ্যমেই স্বর্গের দেবতাদের আয়েশি জীবনের কৌতুককর ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কিন্তু সেই কৌতুকে নেই কোনো ব্যঙ্গের জ্বালা। কৌতুকের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে নাটকের কাহিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ফলে এই কৌতুক অপ্রাসঙ্গিকও নয়। এই দৃশ্যেই প্রবেশ করছে স্ব-ঘোষিত ধর্মগুরু গুঁইবাবা ও তার পার্ষদ পান্নালাল। তার পুণ্যের জোরে সে আশ্রয় পেয়েছে স্বর্গে। গুঁইবাবার বুজরুকি দেখে স্বয়ং ব্রহ্মাও বিস্মিত হয়ে যান। গুঁইবাবার চোখ দিয়ে যে ভাব-অশ্রু নির্গত হচ্ছে তা স্বাদে যেন অমৃত। বিস্মিত ব্রহ্মা বলেন- 'কিমাশ্চর্যম। খলু অমৃতম।' ব্রহ্মা খুশি হয়ে তাঁর কল্পতরু থলিটা গুঁইবাবাকে দান করেন। ব্রহ্মা চলে গেলেই গুঁইবাবার আসল রূপ উন্মোচিত হয়।—

"যখন মর্ত্যে ছিনু কতো মেয়েছেলে সধবা, বিধবা, কলেজের ছাত্রী আর কতো অফিসার প্রফেসর ডক্টরেট এডভোকেটের এডুকেটেড ওয়াইফিরা আমার ডাইনে বাঁইয়ে, কোলেপিঠে ঝুলে আমায় ওডিকোলন মাখাতো। স্বর্গে এসে একটাও পেনু না। একটা অপ্সরাই যদি না পেনু কেন সাধন করিনু কেন স্বর্গে এনু পানু?[৩]

চোখের অমৃতও সে দারুণ কৌশলে তৈরি করে—

"লোকে যেমন কাজল পরে, দেখেছিস তো, আমিও তেমনি করে মধু পরতাম! তার ওপর মোম দিয়ে দিয়ে প্লেন নিপিস করে চামড়ার রঙ ধরাতাম..."[৪]

আজকের দিনে সারা দেশেই এই স্ব-ঘোষিত ধর্মগুরুদের লাম্পট্য আমরা প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি। এদের শ্রেণিচরিত্রকে অত্যন্ত সার্থকভাবে গুঁইবাবা চরিত্রের মাধ্যমে তুল ধরেছেন।

এরপরের দৃশ্যে অবধারিতভাবে এসেছে নরকের পটভূমি। নরকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সেল হচ্ছে সবথেকে 'ডেঞ্জারাস'। এখানের ভূতেরাই যমের কাশ্মীরি বউটিকে অপহরণ করেছে। এই সেলে জড়ো হয়েছে যতো সব সমাজ-বিরোধীরা। যমরাজের বউকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে পুনর্জন্মের দাবি জানাচ্ছে। এই সেলে রয়েছে নেংটির মতো বাহুবলী মাস্তান, খগেন চক্কোত্তির মতো ঘুসখোর পুলিশ, বামনদাসের মতো অর্থগৃধ্নু জোতদার, বাঁটুল বিশ্বাসের মতো ভণ্ড দেশনেতা। এরা বেঁচে থাকাকালীন মানিক-ফুল্লরার মতো গরীব মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর মৃত্যুর পর নরকে গিয়েও এদের দৌরাত্ম্যের শেষ নেই। এমনকি মৃত্যুর পরও এরা পুনর্জন্ম নিয়ে মর্ত্যে এসে তাদের শোষণ-ব্যবসা চালিয়ে যেতে চায়। বাঁটুল বিশ্বাস মহান দেশনেতা, তাই তারই নেতৃত্বে এখানেও সংঘবদ্ধ হয়েছে সব সমাজ-বিরোধীরা। আসলে আজকের নেতা তো এইসব সমাজ-বিরোধীদের নিয়েই হয়ে

ওঠে। মাস্তান নেংটির কাজ ছিল ওয়াগন ভেঙে চুরি করা। তার নেতৃত্বেই চলে ক্লাবের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ। তাই তার পুনর্জন্ম খুবই দরকার :

"তিরিশ হাজার বছর নরকে বসে থাকব, ওদিকে দমদম দিয়ে ঝমাঝম ওয়াগনগুলো গড়িয়ে যাবে! এক একখানা কামরা ঝাঁপব, বিশ হাত কালীর খরচা উঠে আসবে!"[৫]

ঘোড়ুই এমনই কঠিন জোতদার যে পরপারে গিয়েও তার সুদের কারবার বন্ধ করে না, চক্রবৃদ্ধি হারের হিসেব তার চলতেই থাকে—

"এই যে লেখা রয়েছে হাঁস, বাঁশ, মাছ, তেঁতুলমরার সময় ছিল নশো চোদ্দ টাকা ছ পয়সা। অ্যাদ্দিনে সেটা চোদ্দশ' হবে না, অ্যা?"[৬]

এই জোতদারির কাজ অবশ্যই প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। নাটকে দুর্নীতিগ্রস্ত সেই প্রশাসনের প্রতিনিধি হলো পুলিশ খগেন চক্কোত্তি। ঘুস ছাড়া খগেন কোনো কাজ করে না। —

"আমি হলাম ঘুসের রাজা ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না...
কড়ি যদি নাই পড়ে চোরকে আমি ধরি না!
লেকটাউনে বাড়ি ছিল বারাসাতে বাগানবাড়ি
আমার প্রিয়ার কণ্ঠে ছিল চন্দ্রমুখী সপ্তনরী!"[৭]

চতুর্থ দৃশ্যে কাহিনি আবার মর্ত্যে ফিরে এসেছে। এই দৃশ্যে আছে ফুল্লরা-মানিকের কঠিন জীবন-সংগ্রাম। শহরের এক নোংরা গলি-ঘুঁজিতে, জলের এক পরিত্যক্ত বড়ো পাইপের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাদের। রুগ্ন সন্তানের মুখে একটু খাবার তুলে দেওয়ার সাধ্যও তাদের নেই। মানিক সারাদিন রিক্সা চালিয়ে যেটুকু রোজগার করে তার সবটাই কেড়ে নেয় বাঁটুল বিশ্বাসের ভাড়া করা নায়েবেরা। কারণ এই রিক্সাও মানিকের নিজের নয়, এটাও বাঁটুল বিশ্বাসের এক ব্যবসা। কোন এক কস্মিনকালে মানিক রিক্সার এক্সিডেন্ট করেছিল বলে প্রতিদিনই সেই এক্সিডেন্টের খরচ কেটে নিচ্ছে বাঁটুলের নায়েব। ফলে একপ্রকার বেগার খাটতে হচ্ছে মানিককে। এই অসহ্য দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে মানিক আত্মহত্যা করে; আর সন্তানের মুখে দুটো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য ফুল্লরাকে নিজের দেহকেই পসার করতে হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার সঙ্গে 'নরক গুলজার'-এর ফুল্লরা কোথায় যেন একাকার হয়ে যায়। আত্মহত্যার পাপে মৃত্যুর পর মানিকের স্থান হয় নরকে। একসময় দেহবিক্রিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য ফুল্লরাকে খুন হতে হয়। তাঁরও আশ্রয় সেই নরক। পরপারে আবার মানিক-ফুল্লরার দেখা হয়। ব্রহ্মা এবার এই মানিককে দিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সেলের ভূতেদের জব্দ করার পরিকল্পনা করে। সকলকেই পুনর্জন্ম দিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা তো অর্ডারবুকে সই আগেই করে দিয়েছিলেন। এবার আসল খেলা শুরু করে

নারদ। সেই অর্ডারবুকে স্বর্গে বসে বসে বাবুয়ানি করা দেবতাদের থেকে শুরু করে নরকের পশ্চিমবঙ্গ সেলের পিশাচ সকলেরই নাম বসানো হয়। দেবতারা যখন দেবসুলভ কাজ থেকে সরে আসেন তখন তাদের আর দেবত্বে অধিষ্ঠিত থাকার কোনো অধিকার থাকে না। তাই শাস্তি তাদেরও প্রাপ্য। পুনর্জন্ম দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু মানুষের জন্ম দিয়ে নয়, গরুর জন্ম দিয়ে। আর মানিক-ফুল্লরাকেই শুধু মানুষের জন্ম দিয়ে এই গরুগুলিকে শাসন করার জন্য পাঠানো হয়। হাম্বা হাম্বা করতে করতে সকলের মর্ত্যে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে নাটকের মধুর সমাপ্তি সম্পন্ন হয়েছে। যে অ-মানুষেরা এতদিন গরিবদের শোষণ করেছে এবার তাদেরই শোষিত হওয়ার পালা। নারদ বলেছে—

"হ্যাঁ হ্যাসবাই গাই, বলদ, ষাঁড় হয়ে তোমাদের সেবা করবে। এতকাল যারা তোমাদের শোষণ করেছে, এবার তাদেরই দোহন করে অমৃত পান করবে তোমরা।"[৮]

ব্রহ্মা মর্ত্যে যেতে যেতেও বলে গেছে-

"প্রভো একটা রিকোয়েস্ট গোরুর মধ্যেও আমাদের একটু স্পেশাল ট্রিট্রমেন্ট করো। কেননা বয়মখলু অবতার গরুম ভগবান এবার গো-অবতারে মর্ত্যে যাচ্ছেন!"[৯]

এই কাহিনি থেকে এটা স্পষ্ট যে মনোজ মিত্র রঙ্গরসের মধ্য দিয়েই এক গুরুতর সামাজিক সমস্যার উপস্থাপন করেছেন। আর শুধু যে গত শতকের সাতের দশকের সমাজের ছবিই বলে এ নাটক তা নয়; বরং সর্বকালের সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার কথাই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার। এজন্যই শিল্পীদের বলা হয় ভবিষ্যত-দর্শী দার্শনিক। পাঠক-দর্শক তাঁর নিজের কালেরও একেবারে জীবন্ত চরিত্রকে খুঁজে পান এই নাটকের মধ্যে। আমাদের দেশ আজও একইরকমভাবে নরকে পরিণত হয়ে আছে, এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আজও এদেশ গুলজারময়।

নাটকটির গঠনশৈলিতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা চার ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য ছয়। প্রথম দৃশ্য শুরু হচ্ছে মর্ত্যের হাঁতিবাঁধা গ্রাম দিয়ে। গ্রামের মানুষ জোতদারদের দ্বারা কীভাবে শোষিত হচ্ছে তা এই দৃশ্য থেকে ফুটে উঠেছে। এই দৃশ্যেই ঘোড়ুইয়ের মৃত্যু ঘটছে। কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এর পরের দৃশ্য তাহলে হতেই হয় স্বর্গের দৃশ্য। যেখানে দেবতাদের আয়েসি জীবন প্রকাশিত হবে। একইসঙ্গে এই দৃশ্যেই জানা যাবে নরকের ভূতেদের বিদ্রোহের কথাও। এরপরের দৃশ্য তাহলে অবধারিতভাবেই হওয়া উচিত নরকের দৃশ্য। এরপরের দৃশ্য আবার মর্ত্যের, যেখানে মানিক-ফুল্লরার সংগ্রামের জীবনের ছবি পাওয়া যায়। এখানেই শেষ হবে নাটকের প্রথম অঙ্কের। দ্বিতীয় অঙ্ক একইরকমভাবে স্বর্গ-নরক-মর্ত্য-নরক-স্বর্গ-নরক হয়ে কাহিনি পরিণতিতে পৌঁছায়। নাটকের কাহিনিও অত্যন্ত গতিময়, ফলে পাঠক-দর্শকের মনোযোগ একবারের জন্যও নাটক থেকে সরে যায়না। উৎকৃষ্ট নাটকের এ এক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

নাটকটির সাফল্যের আরও এক কারণ হলো এর অসাধারণ সুন্দর ও চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ নির্মাণ। দেবচরিত্রগুলিকে নিয়ে রঙ্গ করার জন্যই তাদের ভাষা হয়েছে সাধারণ মানুষেরই মতো। তবে যেহেতু দেবতা তাই কখনও কখনও কথার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ এসেছে। যেমন

"প্রাপ্তেষু আঘাতে হিপে, নাতি মিত্রবদাচরেৎ। বলো, বলো, কারা কারা এই দুষ্কর্ম করেছে নাম বলো দেখি!"[১০]

অথবা

"(যমকে) তুই তোর কাজে যাবি কি না! গচ্ছঝটিতি গচ্ছমমাদেশ"[১১]

এই ভাষা ব্যবহারকে লক্ষ করে তো যমরাজ বলেছে-

"দেবভাষাকা শ্রাদ্ধ করতা হ্যায়"[১২]

একইরকমভাবে মস্তান নেংটি, স্ব-ঘোষিত ধর্মগুরু গুঁইবাবা, ঘুসখোর পুলিশ খচো বা জোতদার ঘোড়ুই প্রত্যেকের ভাষাতেই তাদের শ্রেণির যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে। অভিনেয় গুণেও সমৃদ্ধ এ নাটক। ফলে দর্শকদের আকর্ষণ আগাগোড়া সমানভাবে বজায় থাকে। এসব গুণাগুণ নিয়েই এই নাটক মনোজ মিত্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১। নাটক সমগ্র, মনোজ মিত্র, ৩-য় খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ, কল-৭৩, পৃ. ৫৯।
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।
১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

নি ত্যা ন ন্দ ম ণ্ড ল
আখ্যানের আলেখ্য : তেঁতুল গাছ

নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্র ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার ধুলিহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র একাধিক নাটক রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'চাকভাঙা মধু', 'কেনারাম বেচারাম', 'মেষ ও রাক্ষস', 'শোভাযাত্রা', 'নরক গুলজার', 'দম্পতি', 'আত্মগোপন', 'তেঁতুল গাছ' উল্লেখযোগ্য। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার 'আনন্দ পুরস্কার'২০২৪, সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটি স্বর্ণপদক পুরস্কার। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ১২ই নভেম্বর ২০২৪ সালে কোলকাতায় তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর একটি অসাধারণ কমেডি নাটক 'তেঁতুল গাছ'। নাট্যকার তেঁতুল গাছের নিরিখে মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দুটি মাত্র চরিত্র ক্ষীরোদ ও ভবতোষ। শালা ভগ্নিপতির সম্পর্ক দুজনের মধ্যে। ক্ষীরোদের শালা ভবতোষ। সেই ভবতোষ তার জামাইবাবু ক্ষীরোদকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেছে। শাল ও সেগুন কাঠ কিনে আনবে বলে। আড়াই মাস তার কোনো দেখা নেই।

।।২।।

নাটকের শুরুতে দেখি, নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ক্ষীরোদ। তার একটি ফার্নিচারের দোকান আছে। সকালবেলা দোকান খোলার সময় গণেশ ঠাকুরকে পূজা দেওয়ার জন্য ধূপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরাধনা করছে। সেই সাথে তার শালা ভবতোষকে গালাগালি দিচ্ছে। হা রা ম জা দা- হনুমান -উল্লু কা আওলাদ। চিটিংবাজ। নাট্যকারের কথায় 'নিজের বৌয়ের মায়ের পেটের খোদ শালা-কী ডোবান ডুবিয়ে গেল'।

ক্ষীরোদের শালা ভবতোষ। সে তার জামাইবাবুর কাছ থেকে চার হাজার টাকা নিয়ে গেছে। গাছের গুড়ি কেনার জন্য। সেগুন কাঠ কিনে আনবে। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে। প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল টাকা নিয়ে চলে গেছে। তার কোনো দেখা নেই। এদিকে বিয়ের মরসুম চলে যাচ্ছে। প্রতি দিন প্রায় চল্লিশ খানা করে বিয়ে হচ্ছে। ক্ষীরোদের কথায় চল্লিশটা বিয়ে মানে চল্লিশটা খাট, চল্লিশটা আলমারি, চল্লিশটা ড্রেসিং টেবিল। অথচ ক্ষীরোদ একটাও ফার্নিচার বিক্রি করতে পারলো না। তার আফসোস সামনের আষাঢ় শ্রাবণ দুটোই মল মাস। ভাদ্র- আশ্বিন- কার্তিক মাসে কুকুরের ছাড়া অন্য জীবের বিয়ে হয় না। সুতরাং এ বছর তার শালা তাকে ডুবিয়ে গেল।

ক্ষীরোদ যখন গণেশ ঠাকুরকে ধূপ দিচ্ছে ঠিক সেই সময় ভবতোষ এসে হাজির। নতুন জামা,নতুন প্যান্ট, নতুন জুতো। মস্ত বড়ো একটা টর্চ লাইট গলায় ঝোলানো। এক গাল

পান চিবোতে চিবোতে ঢুকলো। কেমন আছো জামাইবাবু, বলেই শুনিয়ে দিলো যে তার স্পন্ডেলাইটিস হয়ে গেছে গাছ খুঁজতে খুঁজতে।

কথা প্রসঙ্গে ভবতোষ বলে সে তিনশো টাকা দিয়ে একটা তিনশো বছরের তেঁতুল গাছ কিনেছে। একদম নির্দিষ্ট করে ঠিকানা বলে দিয়েছে। সাউথ চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা অচিন দ্বীপ। সেই দ্বীপেই তিনশো বছরের একটি তেঁতুল গাছ তিনশো টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। সেই গাছ কাটতে যাওয়ার জন্য রাতের ট্রেন ধরতে হবে। একটা মাত্র কুঠার নিয়ে তারা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

ভবতোষের কথায় সুন্দরবনের চারিধারে 'গাছ গাছ- শুধু গাছ! লম্বা গাছ বেটে গাছ-খাড়া গাছ বাঁকা গাছ-হেলা গাছ দোলা গাছ-মেলাই গাছ জামাইবাবু-গাছের মেলা-'

ভবতোষের কথা বিশ্বাস করে ক্ষীরোদ। শুরু হয় নাটকের মূল বক্তব্য বিষয়। ভবতোষ জানায় সুন্দরবনের ইন্টেরিয়রে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করে সে। নদী পার হয়ে একটা অজানা অচেনা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। সেখানে সে একটা তেঁতুল গাছ খুঁজে পায়। তেঁতুল গাছের কথা শুনে ক্ষীরোদ রেগে যায়। সে বলে তেঁতুল গাছ দিয়ে কি আর ফার্নিচার হয়। তাছাড়া বিয়ের মরশুমে নতুন বর ক'নেকে কেউ তেঁতুল গাছের ফার্নিচার দেয় না। ভবতোষ রেগে যায়। বলে এই গাছের কাছে কোনো সাল সেগুন গাছ টেক খাবে না। কম করে তিনশো বছর বয়স গাছটার। লোকে বলে ঐ তেঁতুল গাছের বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। তেঁতুল গাছটা ভবতোষ কিনে নিয়েছে। সে জানায় এভরিথিং ইজ কমপ্লিট। এখন শুধু রাতের ট্রেনে কুঠার নিয়ে গিয়ে তেঁতুল গাছ কেটে আনলে কেল্লাফতে।

ভবতোষের কথায় তিনশো বছরের গাছ শুধু পালিশ করে দিলেই কারো চেনার ক্ষমতা থাকবে না। যে এটি তেঁতুল গাছ। শুধু খাট বানিয়ে বাসর ঘরে সাজিয়ে দাও। বর কনে এই জিনিস ছেড়ে উঠতে চাইবে না।

ভবতোষ আরো বলে শুধুমাত্র গুঁড়িটাই হবে ক্ষীরোদের মত চারটে লাশ। আর ডালপালা শিয়ালদার অর্ধেক প্ল্যাটফর্ম ঢেকে যাবে। সেটা শুধু তেঁতুল গাছ নয়। একটা মস্ত কেল্লা। কিন্তু ক্ষীরোদের কথায় 'তেঁতুল ইজ তেঁতুল নট শাল সেগুন। নট ইভেন জাম অথবা জামরুল।'

নিরুপায় হয়ে ভবতোষ কানাইয়ের দোকানে বিক্রি করার কথা বলে। তখন ক্ষীরোদ নরম হয়। সে গাছটি নেওয়ার জন্য সম্মতি জানায়। এভাবে নাটকের কাহিনি ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌঁছে যায়।

ক্ষীরোদ ভাবতে থাকে ঐ তেঁতুল গাছ শহরে নিয়ে গিয়ে বাবুদের ঘর সাজানোর ফার্নিচার বানাবো। ভবতোষ জানায় তেঁতুল গাছের মালিক নীলাম্বর গায়েন। নীলাম্বরের ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তস্য ঠাকুরদা এই গাছ রেখে গেছে। নীলাম্বরের বংশের যত বয়স গাছের ও বয়স ততো। সে আরো জানায় এই গাছে যে হাত দেবে তার মুন্ডু পড়ে যাবে।

ভবতোষ তখন তার আসল 'ক্যাপাকাইটি' দেখায়। সে নীলাম্বরকে একটা ভাটিখানা নিয়ে যায়। মদ্য খাইয়ে বেহুশ করে দেয়। মালের টানে যখন নীলাম্বর টলমল করতে করতে যখন সে পড়ে যায়। ঠিক তখনই ভবতোষ নীলাম্বরের হাতখানা তুলে নেয় এবং বুড়ো আঙুলটায় কালি মাখিয়ে সাদা কাগজের উপর টিপ ছাপ দিয়ে নেয়। প্রমাণ স্বরূপ সেই চুক্তিপত্র দেখায়। ক্ষীরোদ বিশ্বাস করে।

দুজন তেঁতুল গাছ আনার জন্য ট্রেনে একটা মাছের বগিতে উঠে পড়ে। কামরা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। নাট্যকারের কথায় এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে যে টিকিট না কাটলেও চলে যাওয়া যায়। আর তিনশো বছরের গাছ তিনশো টাকায় কেনার জন্য শালার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে।

ট্রেনে ভবতোষ ঘুমিয়ে পড়ে। ক্ষীরোদের বুকের উপরে পা তুলে দেয়। সুন্দর ভাষা প্রয়োগে ক্ষীরোদ বলে—'আমার বৌ আর তুই এক পেটে জন্মেছিস! ভাবা যায়, তুই আমার কতো আপন। আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে স্পনডেলাইটিস বাঁধিয়েছিস! এই জন্যে বলে, শশুরের মেয়ে তবু ঠকায়, কিন্তু শ্বশুরের ছেলে! নৈব নৈব চ। নেভার! হ্যাক থু!'

ক্ষীরোদ অপেক্ষা করতে থাকে কখন দ্বীপে পৌছাবে। সেই সাথে ভাবে দ্বীপে পৌঁছে চল্লিশটা কুড়ুল ভাড়া করবে। একেবারে আলিবাবা চল্লিশ চোর। ভবতোষ ট্রেনে ঘুমের ঘোরে ক্ষীরোদের মুখে লাথি মারে। ক্ষীরোদ বলে টিপ দেখেছো 'হারামজাদা সত্যি ঘুমুচ্ছে, নাকি মটকা মেরে কিক ঝাড়ছে।'

আবার ভাবে ব্যাটাছেলে হয়তো গল্প ফেঁদে বসেছে। টাকা মেরে দেওয়ার জন্য। তবু ক্ষীরোদ বিশ্বাস করে। ট্রেনে যেতে যেতে তিনশো টাকা কিভাবে চার হাজার টাকা হয়ে যায় সে গল্পোও ভবতোষ ক্ষীরোদকে শোনায়।

ক্ষীরোদকে শসা কিনতে বলে ভবতোষ। ক্ষীরোদ তখন জানায় যে ভবতোষের কাছে এখনো সাঁইত্রিশশো টাকা আছে। তখন ভবতোষ বলে তিনশো বলেছি বুঝি ওটা ছয়শো হবে। নীলাম্বরের জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছোট মেয়ে বেস্পতি সেও ছশো টাকা নিয়ে গেছে। ওই তেঁতুল ফলের দাম হিসেবে। গাছ তলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি চোখের জল ফেলছে। ফল বেচা টাকায় নাকি তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। গাছটা কাটা হয়ে গেলে তো বিয়ে হবে না। গাছ নীলাম্বরদের হলেও ফলের অংশ বেস্পতির। আইবুড়ো মেয়ের কান্না সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই সে ছশো টাকা দিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে নেমে তারা বাসে ওঠে। বাসের ছাদে উঠে বসে। তারা দেখে গাদা গাদা মানুষ বাসে করে যাচ্ছে। সেই অচেনা দ্বীপের দিকে। ছাগল, মুরগি, মেয়েছেলে, গুড়ের নাগরিক, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি কুমড়ো ওর মধ্যে সবাই যাচ্ছে। বাস আবার এক রাস্তা দিয়ে চলে না। কারণ কোনদিন মাঠ ভেঙে যায়। কোনদিন পথে বাঘ পড়লে খানা খন্দ টপকে বাসকে যেতে হয়। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে কথা।

বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে সকলে যাচ্ছে। ভবতোষ বলে—'ধরো ঐ যে লোকটা ঝুলছে...হয়তো একজন কোবরেজ...হয়তো ঐ গাছের শেকড়-বাকল আনতে যাচ্ছে। ঐ যে ধনুক-হাতে লোকটা...হয়তো ব্যাধ-ঐ গাছের পাখি মেরে খায়! ঐ যে রোগা শুঁটকো লোকটা... সাতদিন খায় নি...চারটে তেঁতুল ছিঁড়ে বেচে চাল কিনে খাবে - হতে পারে না জামাইবাবু? ' নাট্যকার এভাবেই বুঝিয়ে দেয় খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা।

নীলাম্বরের খুড়ো পীতাম্বরকে দিতে হয়েছে ছয়শো টাকা। কারণ মগডাল কেটে পীতাম্বরকে পড়ানো হবে। সে এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তাই পীতম্বর ক্লেম করে বসেছে। তাকে ফেরানো যায় না।

এভাবে আমরা কাহিনীর মধ্যে একটা হাসির খোরাক পাই বটে। কিন্তু এর মধ্যে আছে জীবন যন্ত্রণার কথা। যা নাট্যকার সমভাবে তুলে ধরেছেন।

নীলাম্বরের পিসি নাকি ওই নিচের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তাই পিসির ছেলেরাও তার স্মৃতি হিসেবে সেই ডাল রাখতে চায়। সেজন্য তারাও আটশো টাকা দাবি করেছে। শুধু পিসির ছেলেরা নয় নীলাম্বরদের সাত গোষ্ঠীর মুখ চাপা দিতে ভবতোষের সব টাকা কাবার হয়ে গেছে।

ক্ষীরোদ অনেকটা পথ চলে এসেছে। সে আর ফিরতে পারে না। তাই যত টাকা লাগুক না কেনো সে দেবে। তিনশো বছরের তেঁতুল গাছ তার চাই। কারণ ক্ষীরোদের কথায়-' কোটরে কাঠবেড়ালি...নিচের ডালে গলায় দড়ি...ফল বেচে মেয়েরা যায় শশুরবাড়ি... মগ ডালে পুড়ে বুড়োরা যায় যমের বাড়ি-'

শুধু তাই নয় গাছের সারা গায়ে ডেলা বাঁধা আছে। যাদের ছেলে ছেলেপিলে হয় না তারাও ডেলা বাঁধে। যাদের ছেলেপিলে ঘন ঘন হয় তারাও আমানত করে ডেলা বাঁধে। আশ্চর্য গাছ এটি। গ্রামের লোকের কাছে এটি ভগবান হয়ে উঠেছে। ক্ষীরোদ ভাবে এই ভগবানকে কেটে ফেলা ফেলা করে শহরের বাড়ির ফার্নিচার করবো। শহরকে সাজাবো। এমন সময় তারা দেখতে পায় কালবৈশাখী নেমে আসছে। প্রথমে কালবৈশাখীর মেঘ ভেবে ভুল করেছিল। ভবতোষ বলে না ওটা হচ্ছে তেঁতুল গাছের মাথা। তখন ক্ষীরোদ স্বস্তি পায়। গাছের কাছে এসে গেছে ভেবে। কিন্তু ভবতোষ জানায় এখনো পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে। তারা ছুটতে থাকে। দূরে শুনতে পায় জনতার কোলাহল। ভবতোষ জানায় জনতা হয়তো এই গাছকে কেটে নিয়ে যেতে দেবে না। কারণ ঐ গাছ তাদের কাছে ভগবান।

জনতার গর্জন শুনে ভবতোষ বলে ফিরে চলে জামাইবাবু। কিন্তু তারা ফিরতে পারে না। তাদের পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়। তারা জলে ঝাঁপ দেয়।

যারা গাছ কাটতে আসবে তাদের বুকে বর্ষা বসিয়ে দেবে। দুজন উল্টো দিকে ছুটতে থাকে। পালাও ওরা ছুটে আসছে, বলে ভবতোষ। দুজন উর্ধশ্বাসে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটতে থাকে। নাটকের যবনিকা পতন ঘটে।

।। ৩।।

তেঁতুল গাছের নিরিখে নাট্যকার মনোজ মিত্র দৈনন্দিন খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৮৫ সালে 'কৃষ্টি' পত্রিকার একটি নিবন্ধে নাট্যকার বলেছিলেন, 'আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হলো দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্য্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।'

নাট্যকার এই নাটকে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে শ্রেণী চেতনার কথা তুলে ধরেছেন। যে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তার প্রকাশ দেখি এ নাটকের মধ্যে। সাধারণ জনগণের প্রতিবাদের কাছে বারে বারে পরাজিত হয়েছে পুঁজিবাদী মানুষেরা। যা নাট্যকারের মূল বক্তব্য বিষয়। এই নাটকে কমেডির আশ্রয়ে নাট্যকার ব্যঙ্গরস রসিকতায় উপস্থাপন পরিস্ফুটিত করেছেন পরাজিত। আর এখানেই নাট্যকারের শিল্প সফলতা।

তথ্যসূত্র :

১) তেঁতুল গাছ, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩। পৃষ্ঠা নম্বর ৪৩৯ থেকে ৪৫৪।

২) সোনারপুর 'কৃষ্টি' সংসদের মুখপত্র, সম্পাদক সচ্চিদানন্দ চৌধুরী, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৩) নাট্যকার মনোজ মিত্র - পবিত্র সরকার, মনোজ মিত্র নাটক, জানুয়ারি ১৯৯৪।

শ র্মি লা ঘো ষ

অলকানন্দার পুত্রকন্যা : এক চিরায়ত মায়ের কথা।

উনিশ শতকের শেষার্ধে একাধারে নট নাটককার নাট্য পরিচালক রূপে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যে যে ধারার সূচনা করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে সেই ধারার দুই উত্তরসূরী উৎপল দত্ত এবং মনোজ মিত্র।

আমাদের এই আলোচনা উৎপল দত্তকে নিয়ে নয় অসামান্য এই নাট্যব্যক্তির সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলে নেওয়া যেতে পারে গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে উৎপল দত্তের লেখা নাটক 'ছায়ানট' (১৯৫৮) অভিনীত হয়। তার পরবর্তী ষাট সত্তর আশির দশক জুড়ে আমরা দেখলাম নট নাট্যকার নাট্য পরিচালক উৎপল দত্তের অসামান্য সব প্রযোজনা।

বিশ শতকের পাঁচের দশকের শেষে ১৯৫৯ সালে সুন্দরমের প্রযোজনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরিচালনায় অভিনীত হলো মনোজ মিত্রের নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। সে নাটকে প্রধান চরিত্র বৃদ্ধ বঙ্কিমের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করলেন মনোজ। ছয়ের দশকেও মনোজ মিত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটক লিখছেন। অভিনয় করছেন।

সাতের দশকের প্রথম পর্ব থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাটক লিখলেন মনোজ মিত্র। লেখা হল 'চাকভাঙা মধু,' 'বাবাবদল' এবং 'পরবাস'। এই দশকেরই মাঝামাঝি সময় মনোজ মিত্র লিখলেন 'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার' এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'সাজানো বাগান'। এই নাটকে প্রোটাগনিস্ট বাঞ্ছারামের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করলেন মনোজ এবং দেখা গেল তিনি ক্রমশ সুন্দরম এর প্রধান পরিচালক হয়ে উঠছেন।

এই সময় থেকেই নট নাটককার-নাট্য পরিচালক মনোজ মিত্র ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছেন বাংলা নাটকের বিস্তৃত পরিসরে।

আটের দশকে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রকাশ পেল রাজনীতির নানা জটিল অনুষঙ্গ। লিখলেন 'মেষ ও রাক্ষস', 'রাজদর্শন', 'নৈশভোজ', 'কিনু কাহারের থেটার'। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রযোজনায় নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এক একটি মাইলস্টোন।

কিন্তু আটের দশকের একেবারে শেষে ১৯৮৮—৮৯ সালে পালাবদল ঘটালেন নাটককার। লেখা হলো এক অসামান্য নাটক 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা।' ১৯৮৯ সালে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯০। আমরা এই লেখায় 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকটিকে আর একবার পড়ে দেখার চেষ্টা করব।

নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এক অপরাজিতা অলকানন্দাকে নিয়ে। তিনি যেন একটি গাছের মতোই দাঁড়িয়ে আছেন এ নাটকে। ডালপালা বিস্তার করা এক গাছের মতোই শীতল

ছায়া দেন তিনি, দেন আশ্রয়। যদিও সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই তাঁর। কোনও দিন মা হতে না পারার তীব্র যন্ত্রণাকে বুকের মধ্যে রেখে দুই অনাথ শিশু শুভ আর মানসীর ভার নেন তিনি। মাতৃত্বের স্বাদ পেতে অন্যের পুত্র-কন্যাকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অলকানন্দা এবং তার স্বামী রজনীনাথ। তখন অবশ্য অলকানন্দার জীবনে ঐশ্বর্য ছিল, ছিল প্রাচুর্য। স্বামী রজনীনাথের একটি বড় প্রেস ছিল। কলেজস্ট্রিটে ছিল বড় বইয়ের দোকান। বালিগঞ্জে বিশাল বাড়ি। শুভর কথা থেকে জানা যায় স্কুলে যাতায়াতের জন্য রজনীনাথ তাকে ফিয়াট গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। হঠাৎ এই সংসারের বুকে নেমে আসে অন্ধকার। বিজয়া দশমীর রাতে গঙ্গায় নৌকায় বেড়াবার সময় মানসী পড়ে গেলে তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন রজনীনাথ। সাঁতার জানা মানসী জল থেকে সহজে উঠে এলেও মাথায় চোট লেগেছিল রজনীনাথের। বহু চিকিৎসা করিয়েও এমনকি বিদেশে পাঠিয়েও তাকে ভালো করা যায়নি। বরং চলে গিয়েছিল সংসারের সমস্ত স্বচ্ছলতা। বিক্রি হয়েছিল প্রেস-দোকান-বাড়ি-গাড়ি সবকিছু। চিকিৎসার খরচ চালাতে পরিবারটি প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। সামান্য অবশিষ্ট অর্থ খরচ হয় মানসীর বিয়েতে। শেষ পর্যন্ত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষিকা অলকানন্দার সামান্য উপার্জনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সংসারটি।

অলকানন্দার ভাই বাদল মেনে নিতে পারেন না এই পরিণতি। নানাভাবে নিজের রাগ প্রকাশ করেন। রজনীনাথের শারীরিক পঙ্গুতা এবং সংসারের দারিদ্র্যের জন্য তিনি দায়ী করেন বোন ভগ্নীপতিকেই। পাখি বা কুকুরছানা পোষার মানসিকতাতেই তার বড়লোক বোন ভগ্নিপতি দুটি মানব শিশুকে নিয়ে এসেছিল এমন অভিযোগ করেন বাদল। শুভ এবং মানসীকে দত্তক নেবার জন্য দায়ী করেন তাদের। কিন্তু বাদল মনে মনে জানেন একথা সত্যি নয়। তাঁর এই রাগ একান্তই অমূলক। তিনি জানেন রজনীনাথ আর অলকানন্দা সত্যি সত্যিই শুভ আর মানসীর পিতা-মাতা। সর্ব অর্থেই।

কিন্তু শুধু কি রজনীনাথের অসুখ? তার পঙ্গু হয়ে যাওয়া? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়া শুভ কলেজে ভয়ংকর র‍্যাগিং-এর শিকার হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে অ্যাসাইলামে নিয়ে যেতে হয়। ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ায় হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় তার। এক মেধাবী ছাত্রের এই পরিণতি আজকের বাস্তবতাকে ইঙ্গিত করে। সাম্প্রতিক এবং অতীতের বিভিন্ন ঘটনায় জানি আমরা র‍্যাগিং নামক এই সামাজিক ব্যাধি কি ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিনিয়র 'দাদা' জয়দীপ, শুভ-র এই পরিণতির কারণ। কলেজ-ইউনিভার্সিটি'র এই তথাকথিত সিনিয়র দাদারা খুব অপরিচিত নয় আমাদের।

কিন্তু অন্যদিকে শেষ সঞ্চয়টুকু খরচ করে কন্যা মানসীর বিয়ে দিয়েছিলেন অলকানন্দা, তার পরিণতিও সুখের হয় না। স্বামী মৃগেনের হাতে অত্যাচারিতা মানসী। যদিও মানসী এর থেকে প্রতিকারের উপায় নিজেই খুঁজে নিয়েছে। অলকানন্দার ভাই বাদলের পুত্র, তরুণ অধ্যাপক পার্থ ধানবাদে গিয়ে আবিষ্কার করেছে মানসী নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শিখে

গেছে। মৃগেন তাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। পার্থও বুঝিয়েছিল এ অত্যাচার সহ্য না করে চলে আসতে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মানসী জানিয়েছে—

"নিজের অধিকার ছেড়ে আমি নড়বো না। যে আমাকে মারছে তাকে পাল্টা মার না দিয়ে।......." (অলকানন্দার পুত্রকন্যা)

এ কথা শুনে পার্থর মনে হয়েছে মানসী জিতবে। মৃগেনকে জব্দ করতে মানসী থানায় ডায়েরি করেছে, মৃগেনের অফিসে সব জানিয়েছে, এস.ডি.ও-ম্যাজিস্ট্রেট—লোকাল লিডার—কাগজের অফিস প্রত্যেকটা জায়গায় জানিয়ে দিয়েছে মৃগেনের হাতে তার প্রাণ সংশয়ের কথা। শুধু তাই নয় সেই ভীরু বোকা মানসী এমন ব্যবস্থাও করেছে যাতে মৃগেন তাদের সম্পত্তির এক আনাও বিক্রি করতে না পারে। মানসী বলেছে সে আর কারো সাহায্য চায় না। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। অনাথ আশ্রম থেকে তাকে নিয়ে এসেছিলেন অলকানন্দা। কিন্তু মানসী আর অনাথ হতে চায় না। বরং এই অনাথ নামটাই ছিঁড়ে ফেলতে চায় সে। আশির দশকের শেষে লেখা এই নাটকে নাট্যকার কি কোন বার্তা দেন আমাদের? মেয়েদের নিজেদেরই তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে এমন কিছুই যেন বলেন তিনি। সেদিনের মতোই আজকের এই ২০২৫ এর বাস্তবতাতেও কি ভয়ংকর প্রাসঙ্গিক এই ভাবনা।

এই নাটকে আরও রয়েছে দেবাহুতির মত চরিত্র। "শব্দদূষণ এড়াতে সে সবসময় কানে ওয়াকম্যান ব্যবহার করে অথচ নিজেই মানসিক দূষণের শিকার হয়ে পড়ে।" ভাঙা সংসার ও একমাত্র দুধের শিশুসহ দেবাহুতি কিন্তু অপরিচিত নয় আমাদের। এখনকার অনেক দেবাহুতিই এমন শিকড়হীন জীবন কাটায়। বিবাহবিচ্ছিন্না দেবাহুতি শিশু পুত্রকে চাবি দিয়ে ঘরে রেখে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলে যায় নতুন নতুন উত্তেজনার সন্ধানে। অনেক রাতে পার্টি থেকে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরে বাড়িওলার বিরক্তির কারণ হয় আর ক্রমশ তার সন্তানকে দেখার দায়িত্ব নিতে হয় অলকানন্দাকে। মৌখিক আপত্তি জানালেও অলকানন্দা সম্ভবত অখুশি নন এই নতুন দায়িত্বে। শেষ পর্যন্ত দেবাহুতি নিজের শিশুকে ছেড়ে চলে যায় নতুন জীবনের আশায়। যদিও আমাদের মনে হয় অলকানন্দার মতো একজন ছিলেন বলেই সম্ভবত দেবাহুতি পেরেছিল নিজের শিশু পুত্রকে ছেড়ে চলে যেতে। অলকানন্দার মতো এমন বিশ্ব জননী কেউ না থাকলে দেবাহুতির পক্ষেও বোধহয় সম্ভব হতো না এত অনায়াসে তার সন্তানকে ছেড়ে চলে যাওয়া।

এ নাটকে পুরনো ধরণের মাতৃত্ব নিয়ে আছেন এক প্রৌঢ়া নারী আর বাকি দুজন চলে যাচ্ছে আধুনিকতার দুই প্রান্তে। একজন নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবিধানের দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে এবং ক্ষমাহীন ভাবে স্বামীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আর একজন আধুনিকতার মানে বুঝছে শুধু নিজের ভালো থাকা, নিজের উপভোগ। এবং সে

কারণে নিজের সন্তানকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রবৃত্তির টানে। আর এই দুই আধুনিকতার মাঝে চিরায়ত নারী অলকানন্দা।

নাটকের পরিণতিতে সর্ব অর্থে হেরে যাওয়া অলকানন্দা দেবাহুতির শিশুটিকে নিজের কাছে টেনে নেন। সকলে চমকে ওঠে অলকানন্দার এই সিদ্ধান্তে। প্রতিবাদ করেন বাদল। উত্তরে অলকানন্দ বলেন, "কারুর জন্য কিছু করতে না পারলে আমি কি নিয়ে থাকবো! ফাঁকা হয়ে শূন্য হয়ে বাঁচবো কি করে ভাই?" (অলকানন্দার পুত্রকন্যা)।

সত্যিই অলকানন্দা যেন আরও একবার অনিকেতী এক শিশুর মা হয়ে ওঠেন। নাটকের শেষে অলকানন্দা তার পশ্চিমে হেলা বয়েসকে অস্বীকার করে শিশুটিকে দোলনায় দোলাতে থাকেন আর তার পঙ্গু স্বামী রজনীনাথ সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে ওঠেন—

"খেলাটায় জিতে গেলে তুমি। নো টাইম ইজ দা লাস্ট টাইম।"(অলকানন্দার পুত্রকন্যা)।

দেবাহূতির শিশু পুত্রটিকে দোলনায় দোলাচ্ছেন অলকানন্দা আর রজনীনাথ বাদল পার্থ সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে-এভাবেই শেষ হয় এই নাটক। আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যেও কোথাও মানবিকতাকে বড় করে দেন নাট্যকার। নাটকের নানা সমস্যার সমাধান হয়তো শেষ পর্যন্ত হয় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এক আশ্চর্য পরিণত জীবনবোধ।

মনোজ মিত্র একবার বলেছিলেন যে, বাংলা নাটকের নাট্যকাররা হয়ে পড়ছেন বক্তব্যকৈবল্যবাদী। "মানুষকে নিয়ে সাহিত্য সেই মানুষই নাটক থেকে হারিয়ে গেছে। আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তরলোকের মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে। এই বক্তব্য সর্বস্বতা অহর্নিশি দায়িত্ব পালন বাংলা নাটককে ক্রমে ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন ও অস্বাভাবিক করে তুলেছে।" (অলীক সুনাট্য রঙ্গে)

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য মনোজ মিত্রের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। "মানুষের সঙ্গে সংলগ্নতা খোঁজা, তার সেন্স অফ বিলংগিং-কে নতুনভাবে আবিষ্কার করার ইচ্ছে থেকেই যেন গড়ে উঠেছিল অলকানন্দার পুত্রকন্যার পৃথিবী। শিকড়হীনতা ও শিকড় খোঁজার ব্যাকুলতা থেকেই যেন তার জন্ম।" (ভূমিকা, বিষ্ণু বসু, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড)।

এই নাটকে নানা স্তরে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখানো হয়েছে। জয়দীপ অথবা শুভর মধ্যে, মৃগেনের বিবাহ পরবর্তী অত্যাচারে, দেবাহুতির যাপনে এবং তার সন্তানকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে মূল্যবোধ আঘাত পেয়েছে বারবার। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অমানবিক দিকগুলি মনোজ খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু "শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা ও সমবেদনার মানবিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে চান আমাদের।" আর সেকারণেই বোধহয় এতকিছুর পরেও অলকানন্দা আবার দেবাহুতির পরিত্যক্ত শিশুটিকে আশ্রয় দেন। এক মা তার নবজাতক শিশুকে ছেড়ে গেলে আর এক মা তাকে বুকে আগলে

ধরেন। তবে অলকানন্দা জানেন বয়স হয়েছে তাঁর। আগের মতো তেমন জোর আর নেই। তাই বাদল আর পার্থকে অনুরোধ করেছেন যদি তারা একটু সাহায্য করে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি তরুণ অধ্যাপক পার্থ পিসির এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। পাশে থেকেছে। আর আমাদের বিস্মিত করে রজনীনাথও আন্তরিক সমর্থন করেছেন স্ত্রীকে। সাঁতার না জেনেও, দত্তক কন্যার জন্য একদিন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন যিনি, সেই রজনী নাথ।

আমাদের এই পাঠ একান্তভাবেই লিখিত নাটকটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মনোজ মিত্রের অসামান্য নির্দেশনায়, এমন এক মায়াময় প্রযোজনা হয়ে উঠতে পেরেছিল 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', যে তার উল্লেখটুকু না করলে বোধকরি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই লেখা। ১৯৮৯ সালের ৩রা নভেম্বর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন শ্রী খালেদ চৌধুরী, আবহ দেবাশিস দাশগুপ্ত, আলোক পরিকল্পনায় জয় সেন, মঞ্চ নির্মাণ মনু দত্ত, এবং নির্দেশনায় শ্রী মনোজ মিত্র। নক্ষত্র সমাবেশ সন্দেহ নেই। এই নাটকে মনোজ মিত্র বাদল চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন। রজনীনাথ হয়েছিলেন রঞ্জন রায়। শুভ চরিত্রে সুব্রত চৌধুরী, পার্থ/ সত্যব্রত দাস / প্রিয়জিত বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাহুতি—শর্মিলা মৈত্র/রীতা দত্তচক্রবর্তী এবং অলকানন্দার চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন চিত্রা সেন। পরবর্তীকালে ঊর্মিমালা বসু এই চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটককার মনোজ মিত্রের মতোই নাট্যনির্দেশক মনোজ মিত্রের এক অসামান্য সৃষ্টি 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'। নিশ্চিতভাবেই মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনাগুলির অন্যতম।

বাস্তবিক মনোজ মিত্র এই নাটকের শেষে এক বিশ্বাসের ভূমিতে পৌঁছে দেন আমাদের। সমস্ত অমানবিকতা পেরিয়ে গভীর এক মানবতাবোধে উপনীত হই আমরা। খুঁজে পাই এক চিরায়ত মায়ের নিবিড় আশ্রয়।

আকর গ্রন্থ।।

মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম খণ্ড। (মিত্র ও ঘোষ)
ভূমিকা, পবিত্র সরকার, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র ১ম খণ্ড।
ভূমিকা, বিষ্ণু বসু, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র ২য় খণ্ড।
কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক বাসবী রায়
বিশেষ কৃতজ্ঞতা- অধ্যাপক সৌমিত্র বসু।

রি জ ও য়া না না সি রা
কিনুকাহারের থেটার : সাধারণ মানুষের জীবনায়ন

বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে যে সমস্ত বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাট্যজগতকে আলোকিত করে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মনোজ মিত্র। তিনি একাধারে নট, নাট্যকার, প্রযোজক এবং সিনেমা জগতেরও প্রখ্যাত অভিনেতা। পেশাদার ও অপেশাদার, গ্রুপ থিয়েটার, ক্লাব, অফিস, সমিতি বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর নাটকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তবের রূঢ়-গভীর চিত্র এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কমিক-হিউমারের হিল্লোলে পূর্ণ। তাঁর নাটকে রূপকের আড়ালে ও গভীর ব্যঞ্জনায় আছে সমকালীন যুগচেতনা, যুগভাবনা, সমস্যা-সংকট এবং তা থেকে পরিত্রাণের ইঙ্গিতও। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক মিলে তাঁর নাটক শতাধিক। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষাত্মক নাটক রচনায় তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি। একটা গোটা অখণ্ড মানুষকে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে তাঁর নাটকে।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের দৃষ্টি ছিল নিত্য নব বিষয়সন্ধানী, মন বিচিত্র রসে মশগুল। তাঁর নাটকে একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি নেই বললেই চলে, তাঁর মেজাজ বাস্তবের প্রতিহিংসা ও বীভৎসতার মধ্যে কখন কখন জ্বালাময় রূপ ধারণ করে, কিন্তু স্বাভাবিক মেজাজ প্রকাশ পায় প্রসন্ন জীবনের উপলব্ধিতে এবং স্নিগ্ধ-কৌতুকরসের আস্বাদনায়। তাঁর নাটকের মধ্যে নিত্য নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ঘটলেও বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে যে তিনি পুরোপুরি বয়কট করতে চাননি এবং পারেননি, তারও প্রমাণ মেলে 'কিনু কাহারের থেটার', 'গল্প হেকিম সাহেব' ইত্যাদি নাটকে।

সামন্তশ্রেণির শোষণ-পীড়ন এবং শোষিত-পীড়িত নিম্নশ্রেণির মানুষের অসহায় যন্ত্রণা ও সচেতন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাঁর 'কিনুকাহারের থেটার' (১৯৮৮) নাটকে। তাঁর লেখা এই শ্রেণির আরও উল্লেখযোগ্য নাটক-'চাকভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭), 'শোভাযাত্রা'(১৯৯০), 'অলকনন্দার পুত্রকন্যা'(১৯৮৮), 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৮২-৯৩), 'নরকগুলজার' (১৯৭৪), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫) ইত্যাদি।

'কিনুকাহারের থেটার' (১৯৮৮) নাটকটির অভিনয়রীতি ও উপস্থাপন কৌশল অভিনব। এর কাহিনি দুটি অর্ধে এবং অর্ধগুলি আবার নাট্যাংশ শীর্ষক দৃশ্যে সন্নিবেশিত। গ্রাম-বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্য আধুনিক সভ্য সমাজের প্রত্যাঘাতে কীভাবে বিনষ্টির পথে এগোয় সেই কাহিনি এখানে পরিবেশিত হয়েছে। জাতিতে কাহার কিনু চরিত্রের দুই রূপ এ নাটকে। দিনের বেলায় সে শুয়োর চরায়, মাছ ধরে এবং পুতুলও গড়ে; কিন্তু রাত্রে সে নাট্যশিল্পী — নিরক্ষর কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে থিয়েটার করে। তথাকথিত নিম্নবর্গের তথা প্রান্তিক মানুষ কাহার-ডোম-বাগদি-কৈবর্ত, রজক, চর্মকার, ধাঙ্গড় ইত্যাদি সম্প্রদায়ের

সাধারণ মানুষের দ্বারা অভিনীত লোকমনোরঞ্জক এই লোকনাট্য বাংলার ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের করুণচিত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের খোঁচায় উন্মোচিত হয়েছে। দেশের সকলের অপরাধের বোঝা একা ঘণ্টাকর্ণ তথা কিনু কাহার মাথায় নিয়ে কি নিদারুণ মর্মন্তুদ অবস্থায় পড়েছিল তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে প্রকাশিত। আর এরই রূপকে পরাধীন ভারতে ইংরেজ লাটসাহেবের স্বেচ্ছাচার ও দেশজ রাজার অন্যায়-অত্যাচার, স্বার্থলিপ্সু, ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগসর্বস্ব মানুষের রূপ উন্মোচিত।

'কিনুকাহারের থেটার' নিয়ে মনোজ মিত্র একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন (দ্রঃ অলীক সুনাট্য রঙ্গে; প্রথম প্রকাশ - ১৩৯২)। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে 'কিনু কাহারের থেটার' আমাদের বাংলার প্রাচীনকালের দেশজ থিয়েটার। সাধারণত অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ গ্রামে-গঞ্জে নাট্যরচনা ও প্রযোজনা করে তাদের রসবোধ চরিতার্থ করে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। এই নাটকেও গ্রাম-বাংলার মাটি থেকে উদ্ভুত এক ধরণের যাত্রাপালার সরস ও অকৃত্রিম চিত্র তুলে উপস্থাপিত এবং তাই আধুনিক থিয়েটারের জগতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এভাবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা রয়েছে আলোচ্য নাটকে।

আধুনিক কালের থিয়েটারের মতো 'কিনুকাহারের থেটারে' উন্নত মানের মঞ্চব্যবস্থার পারিপাট্য, মঞ্চসজ্জার উপকরণ, আলোকসজ্জা, অভিনয়রীতি প্রভৃতি ছিল না। অনেকটা যেন সঙই সাজতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। নাট্যকার লিখেছেন- 'চুনকালি ছাইভস্ম মেখে —পাটের আঁশের চুলদাড়ি চাপিয়ে ওরা সাজতো রাজারাণী মন্ত্রী উজির দেব-দেবী। মশালের শিখা ফিঙেপাখির পুচ্ছের মতো দুলতো ওদের শরীরে। রাজাকে মনে হতো ভিখারি ... ভিখারিকে মনে হতো দানব।'[১]

কীভাবে এই দেশজ থিয়েটার আধুনিক থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারে তার পরিচয় দিতে এই কাহিনির বিস্তার। নিম্নবর্গের চরিত্ররা কিনুর থিয়েটারে তাদের সর্বস্ব নিয়ে উপস্থিত। ভাবনার এই অভিনবত্ব অবশ্যই আধুনিক।

কিনু কাহার ও তার স্ত্রী জগদম্বা, শ্যালিকা উদাসিনী, মৌনীবাবা, বাজনাদাররা অতি সাধারণ মানুষ। এরা দিনেরবেলা সাধারণ বৃত্তি করে এবং রাত্রে অভিনয় করে মানুষকে মাতিয়ে রাখে এবং সামান্য কিছু টাকা পয়সা দর্শকদের কাছ থেকে আহরণ করে ন্যূনতম খরচ চালানোর জন্য। এই দুঃস্থ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এমন দুরবস্থা যে, অভিনয় করার জন্যে দারোগাবাবুর ছাগল চুরি করে। মৌনীবাবা সেই ছাগল নিয়ে অভিনয় করে এবং অভিনয়ের মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে ছাগলটিকে মেরে ফেলে অভিনয় শেষে সবাই মিলে খাওয়ার জন্য। এর ফলে তাদের ভয়ানকভাবে অপদস্তও হতে হয়েছে। এদের জীবনের উপলব্ধিই ও জীবনের কাহিনিই নাটক হয়ে দেখা দেয়। প্রসঙ্গত কিনু- জগদম্বা প্রসঙ্গে ভদ্রলোকের উক্তি—

"থিয়েটারের পুঁতির সাজসজ্জার মধ্যে আমাদের জগদম্বার নিজের আসলটি রয়ে গেছে! আর সেটাকে ধরেই ওরা নাটক থেকে বেরিয়ে এসেছে জীবনে। ... ঠিক এই ভাবে নাটক থেকে জীবনে, আর জীবন থেকে নাটকে কিনু কাহার হামেশাই যাতায়াত করতো। বোঝা যেত না, জীবন আর নাটক কখন কোনফাঁকে একাকার হয়ে যাচ্ছে।"[২]

আধুনিক কালের থিয়েটারে অভিনয়কালে অভিনেতারা অভিনয়ই করে --- ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা লোভ চরিতার্থতার উলঙ্গ প্রকাশ সেখানে দেখা যায় না। কিন্তু আগেকার থিয়েটারে অভিনেতাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটিও প্রকাশ পেত। আলোচ্য নাটকে-এ দেখা যায় উজির চরিত্রে অভিনয়কারী বদ্যিনাথ উদাসিনীর সঙ্গে অসভ্যতা করেছে। বদ্যিনাথ উদাসিনীকে অসভ্যের মতো বুকে টেনে ধরেছে। অভিনয় ছেড়ে উদাসিনীও এর বিচার চাওয়ায় নট-নাট্যকার ও প্রযোজক কিনু কাহার বদ্যিনাথকে ভর্ৎসনার সুরে বলেছে -

"শালা ছিঁচকে চোর। রাত বিরেতে গেরস্তর কলা মুলো চুরি করে খেয়ে বেড়াচ্ছিলি! ... সেই পাপের জীবন থেকে তুলে এনে তোরে আমি থেটারে ঢোকালুম ...(কান ধরে ওঠবোস করাতে করাতে) হ্যাঁরা ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে!"[৩] ইত্যাদি।

আশ্চর্যের বিষয় এরকম এক বাস্তবোদ্ভূত সংকট, বদ্যিনাথের লাম্পট্য, উদাসিনীকে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য তার দিদি অর্থাৎ কিনুর স্ত্রী জগদম্বার ঝগড়া, বৃদ্ধ স্বামী কিনুকে নিয়ে সংসার জীবনে যুবতী জগদম্বার খেদোক্তি, উদাসিনীর কান্নাকাটি ইত্যাদিও অভিনয়ের কৌশল-নৈপুণ্যে নাটকের বিষয়ীভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত ঝগড়ার আসরে কিনু রাজা, উজির, লাটসাহেব, উদাসিনী ও সান্ত্রীকে রেখে বাকি অভিনেতাদের তাড়িয়ে দিলে লাটসাহেবের যে সংলাপ তা নাটকের স্বাভাবিকতা ও মঞ্চবাস্তবতা রক্ষা করেছে —

'রাজা, এই লেডির ইজ্জট পাংচারড হইয়াছে ... লেডি কাঁডিটেছে! এখনো টুমি হেঁচকি টুলিবে! সভাসদগণ ...'[৪]

লাটসাহেবের চাপে রাজার বিচার বসলে উজির ও রাজার গোপন কুকীর্তি পরস্পরের মাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু উজিরের সব অপরাধ টাকার বিনিময়ে নিজের কাঁধে নিতে বাধ্য হয় কিনু কাহার। স্ত্রীর কথায় নিষ্কর্মা কিনু 'সাজাখেকো' অফিসারের চাকরি নিয়ে সকলের অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে শাস্তি ভোগ করে। এইভাবে কাহিনি বয়ন হয়ে নাটক অন্য মাত্রা নেয়।

তথাকথিত নিম্নবর্গের এইসব চরিত্রগুলি তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে নাটকে উপস্থিত হলেও সকল চরিত্রকে এমনকি সকল ঘটনাকে ম্লান করে একটি চরিত্র তার অত্যাচারে জর্জরিত মহিমার আলোকে অনন্য হয়ে উঠেছে—সে ঘন্টাকর্ণ। লাটসাহেব, রাজা-উজির, জগদম্বা-উদাসিনী সকলের অপরাধের বোঝা সে বহন করেছে। তারা সকলেই নীচ-স্বার্থপর, লোভী, নিষ্ঠুর, আর তাদের ঘৃণিত ঘণ্টাকর্ণই সকলের সেরা সর্বকালের সেরা মানুষ।

নাটকের এমন ঘটনা সংস্থাপন, অভিনয়রীতি এমনকি নিম্নবর্গের মানুষকে আলোতে নিয়ে আসার ভাবনা আধুনিক যুগের নাট্যভাবনা ও অভিনয়ে নতুন মাত্রা দেয়।

গ্রাম্য থিয়েটারের নাটক হলেও কিনুর থিয়েটারের রূপ যেন বর্তমানের ওপেন এয়ার থিয়েটার। ব্রেশটের থিয়েটারের মতো কিনুর থিয়েটারে কোনো মঞ্চ ছিল না, একটামাত্র পর্দা থাকত। সেই পর্দায় কিনু অশিক্ষিত পটুত্বে ছবি এঁকে দিত এবং এক এক সাজে আসরে অভিনয় করে পরক্ষণে আবার পোশাক পাল্টে অন্য চরিত্রেও অভিনয় করত। ব্রেশটের থিয়েটারে একে বলা হয় অ্যালিনিয়েশন। 'কিনুকাহারের থেটারে' নাট্যকার এভাবে পাঠককে এই তত্ত্ব জানাতে আমাদের দেশজ নাটকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। নাট্যকার সচেতনভাবেই এই যে লোকনাট্যের ঐতিহ্য আর ব্রেনাটের নাট্যতত্ত্ব—দুই-কে মেলহলন? নাকি হয়তো দেখাতে চেয়েছেন এ তত্ত্ব বা উপস্থাপন রীতি কালো লোনাট্যের ঐতিহ্য। এখানেই ঘটেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন।

নাটকে একটি ছাগলের কথা আছে। মৌনীবাবার সঙ্গে সর্বদা ছাগলটি থাকে। মৌনীবাবার কথায় বাবা বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে স্বপ্নে পাওয়া এই 'স্বপ্নাদ্য' কাম-ছাগলের এক ফোঁটা দুধ খেলে যেকোনো রোগ সেরে যাবে। জনসাধারণের মনে এই ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতীতি অবশ্যই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকেই স্মরণ করায়। মৌনীবাবা মৌনব্রত নেওয়ায় কথা বলবে না। তাই সে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে কিনু কাহারের নির্দেশে খুব সুন্দরভাবে অভিনয়ের ভঙ্গিতে অভিনয়ের সঙ্গে জীবনের চাহিদা ও কামনাকে একাকার করে দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে —

'কে কে দুধ খাবে, চলে এসো ভাইসব, এক ফোঁটা দুধ --- একটা ডবল পয়সা। পেটব্যথা নাকে সর্দি বদহজম পায়ে হাজা খোস প্যাঁচড়া চক্ষুপীড়া সব উপশম হয়ে যাবে! কী হলো এসো ... কিনু কাওয়ার সঙ দেখতে টিকিট তো লাগেনি ... দুধ খেয়ে একটু ব্যয়ট্যায় করো। না হলে চলবে কি করে?... থেটার করায় খরচা নেই? এই এতোগুলো ছেলেমেয়ে যদি এই সময়টায় ইটভাঁটায় মজুর খাটতো ... কিছু না হোক এক বেলার খোরাকি ... অ্যা?'[৫]

এই উক্তি আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাপালা, গাজন এমনকি গ্রাম্য সঙ-এর ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য আজও বাংলার গ্রাম গঞ্জে বৈশাখী উৎসবের মেলায় এই সঙ্ যাত্রাপালা চলে। অবশ্য ক্রমক্ষীয়মান। তখন অভিনয়প্রেমী মানুষরা বিনা টিকিটে অভিনয় করে দেখাত এবং তা দেখে মানুষ খুশী হয়ে সামান্য কিছু সাহায্যস্বরূপ পারিশ্রমিক দিলে তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত - এ দিকটা এখানে স্পষ্ট।

মৌনীবাবার এমন পয়সা কালেকশানে ভাঁড়ের অবিশ্বাস এবং ঘণ্টাকর্ণ ওরফে কিনু কাহারের প্রতি সংলাপে মানবমনের আধুনিক মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

'ভাঁড়।। দ্যাখো কিনুদা, এইসব গরিব গুরবো মুখ্যু মানুষের ট্যাঁক ফাঁক করার জন্যে

কতো রকম ভাঁওতা মারতে লেগেছে! স্বপ্নাদ্য ছাগল ... জগন্নাথ দর্শন .... আচ্ছা বলো ঘণ্টা বা কিনু।। তা যাবে।

ভাঁড়।। ডাক্তার বদ্যি ছেড়ে এরা যদি জগন্নাথে ভরসা করে ... ম্যালেরিয়া কলেরিয়ায় পগার পার হবে না?

ঘণ্টা বা কিনু।। তাও হবে।'[৬]

- রোগে-শোকে মানুষ দিশাহারা হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণে দৈববিশ্বাসী না হয়ে যে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী --- সেকথা এখানে পরিস্কার হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আগমনে বাংলার সাহিত্য ও সমাজে আধুনিকতা আসে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য যে একেবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল তা কিন্তু নয়। ইংরেজ আগমনের পূর্বে এমনকি ইংরেজ শাসনকালেও অনেক উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের এমনকি রাজরাজড়াদের মধ্যেও প্রাচীন ঐতিহ্য-ধারণা ও বিশ্বাসকে মান্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি ইংরেজদের মধ্যে দেখা গেছে বিরূপ মানসিকতা, ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে পুতনার রাজা ও লাটসাহেবের কথোপকথনে সেই ঐতিহ্যের মান্যতা ও আধুনিকতার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে —

'রাজা।। এক্ষেত্রে আমি ঘন্টাকর্ণের কথা মেনে নেবো ... ওই স্বপ্নে এটা পেয়েছে। বিশ্ববাসীর রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য বাবা জগন্নাথ ছাগল সুদ্ধ দড়িটা ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে গেছেন! ...

'লাটসাহেব।। ভাঁওটা। সব ভাঁওটা! ছাগলের ডুড়ে অসুখ সাড়ে উজিড়?'[৭]

এই যে পুরাতনের সঙ্গে নব্যচেতনার দ্বন্দ্ব কাহার সমাজকে প্রভাবিত করেছে, যার নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দিক, এ তো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের কথা স্মরণ করায়।

মঞ্চোপরি দেখা যায় উজির চোখের রোগ সারাতে, লাটসাহেব দাদের চুলকানি সারাতে, রাজা হেঁচকি সারাতে, বুড়ো বাজনাদার পেটের রোগ সারাতে ছাগলের দুধ খেতে হট্টগোল লাগিয়ে দেয়। অবশেষে দেখা যায় রাজা তার ক্ষমতাবলে আগে ছাগলের দুধ পান করে এবং প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগে নিরীহ ছাগলের মৃত্যু ঘটে। পরে জানা যায় ছাগলটি স্বপ্নাদ্য ছাগল নয়, দারোগাবাবুর ছাগল চুরি করে আনা! গরীব মানুষদের রঙ-তামাশা দেখানোর জন্য ছাগল কেনার পয়সা নেই বলেই চুরি করে আনা। পুলিশের হানায় কিনু ভাঁড় অভিনয়ে থাকা নজরুলকে ছাগলটিকে দিতে বললে দেখা যায় ছাগলটি মৃত। আসলে ছাগলটি মরেনি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে অভিনয়ের শেষে মাংস খাওয়ার জন্য। কিনু কাহারের স্বীকারোক্তি —

'আজ্ঞে থেটারের পরে দলের ছেলেরা খাবে, তাই থেটারের মধ্যেই মেরে ফেললাম!'[৮]

চুরির অপরাধে দলের সর্দার কিনু কাহারকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়; কিনু কাহারের আসরও লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়—একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এইভাবে আগেকার কালে রঙ-তামাসা, যাত্রা-পালা- নাটক চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যেত কোন এক আচমকা কারণে।

আলোচ্য নাটকে রঙ-তামাসার মধ্য দিয়েই বাস্তব-কাল্পনিক, আজগুবি ঘটনা ও চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লাটসাহেব, রাজা, উজির, সান্ত্রী, পুলিশ, মৌনীবাবা, দারোগা, ছাগল—সবকিছু স্থান-কাল-পাত্রের নিয়ম ভেঙে এক জায়গায় এসে মিলেছে। প্রতি কথায় কৌতুকের ছোঁয়া কিন্তু সেই কৌতুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচা এবং সেজন্য কৌতুকের ফুলকিগুলি অবশ্যই কান্নায় ভেজা।

আজকের যুগে থিয়েটারের অনেক উন্নতি হয়েছে। উন্নত মানের মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করছেন। অভিনয়ের আগে যথেষ্ট রিহার্সালও চলছে। টিকিটের মূল্যও কম নয়। দর্শক অভিনয়ের মর্যাদা দেন; এমনকি নির্দেশমতো চলভাষগুলিকেও নীরব রাখেন। মঞ্চের নিয়ম না মানলে দর্শকেরও প্রবেশাধিকার থাকে না। মঞ্চোপরে সঠিক ও যথাযথ ভাবে নাট্যাভিনয় ছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোন ব্যক্তিগত কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা থাকে না। এমনকি নাট্যাভিনয়ে কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ত্রুটি বা অসঙ্গতি নিয়েও মঞ্চে কেউ মন্তব্য করে না; বরং অতি সচেতন ও সতর্কভাবে অভিনয়ে ও সংলাপে সামাল দিয়ে গ্রীনরুমে দর্শকচক্ষুর আড়ালে ভুল সংশোধন করিয়ে অভিনয়কে সুচারু ও দর্শক মনোরঞ্জক করে তোলেন।

কিন্তু সেকালে কোন উন্নতমানের মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটাদি ছিল না, প্রেক্ষাগৃহও ছিল না। ফাঁকা মাঠে খোলা মঞ্চে অভিনয় হত, যথেষ্ট রিহার্সালেরও সুযোগ ছিল না। ফলে অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেক বিষয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ত। অনেকে সংলাপ ভুলে যেত, অনেক সময় নির্দিষ্ট সংলাপের বদলে ব্যক্তিগত কথাবার্তা, এমনকি বাকবিতণ্ডাও চলত। চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জায়ও ত্রুটি বা ভুল থাকত এবং তা দেখে-শুনে মঞ্চোপরি অন্যান্য চরিত্র এবং দর্শকরাও হাসি-ঠাট্টা করত। এ বিষয়ে একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। লাটসাহেব চরিত্রে অভিনয়কারী পঞ্চার কোমরে চামড়ার বেল্টের পরিবর্তে পাটের দড়ি ঝুলতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ে এবং অভিনয় ছেড়ে সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

উজির।। পঞ্চা তোর কোমরে ওটা পাটের দড়ি!

লাটসাহেব।। কি হইয়াছে?

উজির।। তোর তো একটা চামড়ার বেলটু ছিলো। লাটসাহেবের পাটে পাটের দড়ি পরলি পঞ্চা?

লাটসাহেব।। ঢুসশালা!

উজির।। আচ্ছা যা আছে ঠিক আছে! তুই থেটারের মধ্যে ফিরে আয়...

লাটসাহেব।। কট্টোবার ভেটরে বাইরে যাটায়াট করবো রে! ঢুসশালা!'[৯]

সেকালে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বারবার পোশাক না পাল্টে একই পোশাকে বিভিন্ন অভিনয় সেরে নিত, সেই দিকটিও এখানে উন্মোচিত। তারা যে কত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের জীবন ও রঙ্গমঞ্চকে একাকার করে নিয়েছিল, এ উদ্ধৃতি তাঁরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বিশেষত তখনকার কালে খোলা মঞ্চে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিনয় করত একই পরিবারভুক্ত লোকজন—স্বামী, স্ত্রী, শ্যালিকা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন প্রমুখ। তাই অভিনয়কালেও প্রায়শ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ—ক্ষোভ-বিক্ষোভ, স্বার্থ- লোভ প্রভৃতি প্রকাশ পেত। 'কিনুকাহারের থেটারে'ও কিনু কাহার, তার স্ত্রী জগদম্বা ও শ্যালিকা উদাসিনীকে নিয়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নাট্যাভিনয় চলাকালীন সময়ে উঠে এসেছে। সাম্প্রতিককালের নাট্যকার মনোজ মিত্র অতি সন্তর্পণে এইসব অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের ব্যক্তিগত ঝগড়া-বিবাদ-আক্রোশকে অভিনীত নাটকের বিষয়ীভূত করে তুলেছেন। কিনু কাহারদের এমন সুদক্ষ অভিনয় কৌশল অবশ্যই আধুনিক অভিনয়-কৌশলকে স্মরণ করায়।

কিনু কাহারের থিয়েটারের দলেরা উচ্চবিত্ত বা অভিজাত পরিবারের নয়। তাদের অনেকে চোর-ডাকাতও। কিনু অভিনয়ের মাধ্যমে তাদেরকে সৎপথে আনার ও সামাজিক মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তার এই নিরলস অক্লান্ত চেষ্টা আমাদের গিরিশচন্দ্র ঘোষকে স্মরণে আনে। গিরিশ ঘোষ একদা নায়িকা বা অভিনেত্রীর সন্ধানে বারবনিতালয় থেকে নারী সংগ্রহ করে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবন দিয়েছিলেন। কিনু কাহারের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব ও মূল্য বিচারে তারই সমতুল্য বলা যায়।

এখনকার মতো টিকিট কেটে তখন দর্শক অভিনয় দেখত না। তবে অভিনয় দেখে খুশি হয়ে কিংবা কোন চরিত্রের বিপন্নতায় সাহায্য করতে, কিংবা দৈবযোগে প্রাপ্ত কোনকিছু প্রাপ্তির আশায় পয়সা দিত। অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়ে সেখান থেকে পয়সা উপার্জনের কোন নির্দিষ্ট কৌশল তখন অনুসৃত হয়নি। মনোজ মিত্রের 'কিনু কাহারের থেটার' নাটকেও সেকালের থিয়েটারের সেই সকরুণ দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার চিত্রোদ্ঘাটন হয়েছে। সাধারণের দ্বারা অভিনীত এই থিয়েটার কখন রাজরোষ, কখন গ্রামের জমিদারের শাসন, কখন ধর্মগুরুর রক্তচক্ষু কোন না কোন আক্রমণে একসময় ছত্রখান হয়ে যেত।

কিন্তু ঐতিহ্যের বিনাশ নেই। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে স্বয়ং নাট্যকার যেন এর আধুনিক বাস্তবোপযোগী দিকটি উন্মোচন করেছেন। নাটকটির যবনিকা পতনে দলবল সহ কিনু কাহারের গানে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে থিয়েটারের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার প্রত্যাশা ব্যঞ্জিত হয়েছে—

'রইলো গো রইলো গো
রইলো গো এই ভুবনখানি তোমার তরে
আপন করে নিয়ো তারে যতন ভরে।
রইলো গো এই বিষয় আশয়
ওগো ও মহাশয়
এই যে যতো খেলনাপাতি
এই আমাদের জীবন সাথী
আপন করে নিয়ো তারে যতন ভরে। ...'[১০]

—ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনের এমন অপূর্ব ও অনুপম আকৃতির দৃষ্টান্ত তুলনারহিত। আধুনিককালের নাট্যকার মনোজ মিত্রের আলোচ্য নাটকে প্রাচীন থিয়েটারের হতশ্রী দৈন্যদশার ঐতিহ্য যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি সেই দেশজ থিয়েটার আধুনিক থিয়েটারের যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সেই দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে। নাট্যকার যে আশ্চর্য কৌশলে থিয়েটারের প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আধুনিকের কাছে সার্থকতার প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

সূত্রনির্দেশ :

১। কিনুকাহারের থেটার, মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স, ১৪১৬, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২৩০, ৩য় খণ্ড।
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
৯। পূর্বোক্ত পৃ. ২৫৯-২৬০
১০। পূর্বোক্ত পৃ. ২৭৫

সহায়ক গ্রন্থ :

ক। অজিত কুমার ঘোষ- 'বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০১
ii বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫
খ। আজহার ইসলাম- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ঢাকা, ২০০১ (৩য় সংস্করণ)
গ। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য- বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
ঘ। বৈদ্যনাথ শীল- বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

ম হঃ কু তু বু দ্দি ন মো ল্লা

মনোজ মিত্রের : 'গল্প হেকিম সাহেব' - ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

বাংলা নাট্যসাহিত্যে এবং অভিনয় জগতে কিংবদন্তী মনোজ মিত্র জন্মেছেন ১৯৩৮ খুলনা জেলার(বর্তমান পূর্ববঙ্গ) সাতক্ষীরা মহকুমার একটি গ্রামে। স্বাধীনতার নামে বঙ্গবিচ্ছেদের সময় তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। কলেজের বন্ধুদের নিয়ে গঠিত 'সুন্দরম' (১৯৫৭) নাট্যগোষ্ঠীতে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু। এরই পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছেন 'গন্ধর্ব' নাট্যগোষ্ঠীতে; যুক্ত ছিলেন রানিগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গেও। পরে কলেজের চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসে গড়ে তোলেন 'ঋতায়ণ' নাট্যগোষ্ঠী। এরপর শুরু হয় তাঁর নাট্যরচনা। তাঁর প্রথম নাট্যরচনা 'নীলকণ্ঠের বিষ' (১৯৬০)। তারপর তিনি একে একে উপহার দিয়ে চলেছেন প্রচুর নাট্যকুসুম।

মনোজ মিত্রের পাঁচ খণ্ডের নাট্যসমগ্রতে আমরা পেয়েছি ২৭টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ২টি ছোটোদের নাটক এবং ২৭টি একাঙ্ক নাটক। এছাড়া 'রামায়ণী-মহাভারতী'-তে পাওয়া যায় আরও একটি নাটক—'ভেলায় ভাসে সীতা'। তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকর্ম ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও। মৌলিক চিন্তার প্রকাশে তাঁর নাটক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাঁর নাটকের বিষয় বিন্যাস, চরিত্র-রূপায়ণ, সংলাপ, সঙ্গীত মৌলিক ভাবনায় ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাঁর নাট্যরচনায় কমেডির প্রাধান্য থাকলেও সমাজবাস্তবতাকে অনেক বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের লোভ-লালসা, রিরংসা, ক্ষুধা, স্বার্থচেতনা প্রভৃতি সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ মানুষ ফুটে উঠেছে তাঁর নাটকে। তাঁর চারপাশের প্রত্যক্ষদৃষ্ট মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষকে তুলে ধরেছেন নাটকে। শ্রদ্ধেয় ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন: "তাঁহার দৃষ্টি নিত্য নব বিষয়সন্ধানী এবং তাঁহার মন বিচিত্র রসে মশগুল। সেইজন্য একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি তাঁহার নাটকে নাই এবং কোন সংকীর্ণ তাত্ত্বিকতার সীমানার মধ্যে তিনি আবদ্ধ নহেন।...."[১]

যুগ-সংকট ও যুগচিত্রও ধরা পড়েছে তাঁর নাটকে। তাঁর নাটকে বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যা-সংকট থাকলেও সেগুলোকে রাজনৈতিক নাটক বলা যায় না, বরং সেগুলোকে বলা যায় সামাজিক নাটক।

তিনি লিখেছেন বিভিন্ন ধরনের নাটক। তাঁর নাট্যকীর্তিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখতে পারি। যথা :

(ক) ব্যক্তি-মানুষের সন্ধান : (১) মৃত্যুর চোখে জল, (২) পরবাস (১৯৭০), (৩) বৃষ্টির ছায়াছবি, (৪) আমি মদন বলছি (১৯৭৪), (৫) সন্ধ্যাতারা (১৯৭৯), (৬) প্রভাত ফিরে এসো, (৭) কাক চরিত্র (১৯৮২), (৮) দম্পতি (১৯৮৭) ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক নাটক — সামন্তশ্রেণির শাসন-শোষণ-পীড়ন ও শোষিত-পীড়িত নিম্নশ্রেণির মানুষের সচেতন প্রতিক্রিয়া : (১) পাখি (১৯৬০), (২) চাকভাঙা মধু (১৯৭১), (৩) নরক গুলজার (১৯৭৪), (৪) সাজানো বাগান (১৯৭৭), (৫) বাবুদের ডালকুকুরে (১৯৮১), (৬) অলকানন্দার পুত্রকন্যা (১৯৮৮), (৭) শোভাযাত্রা (১৯৯০), (৮) গল্প হেকিম সাহেব (১৯৯৪), (৯) দেবী সর্পমস্তা (১৯৯৫), (১০) পালিয়ে বেড়ায় (১৯৯৯) প্রভৃতি।

(গ) পুরোনো দিনের থিয়েটার : (১) কিনু কাহারের থেটার (১৯৮৮), (২) দর্পণে শরৎ-শশী (১৯৯২) প্রভৃতি।

(ঘ) নব্যপৌরাণিক নাটক — পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের নবমূল্যায়ণ : (১) অশ্বত্থামা (১৯৬৩), (২) তক্ষক (১৯৬৭), (৩) যা নেই ভারতে (২০০৫), (৪) ভেলায় ভাসে সীতা (২০০৮) ইত্যাদি।

(ঙ) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রহসনধর্মী নাটক : (১) রাজদর্শন, (২) কাল বিহঙ্গ (১৯৬৮), (৩) টাপুর টুপুর (১৯৭২) (৪) নরক গুলজার (১৯৭৪), (৫) শিবের অসাধ্যি (১৯৭৫), (৬) চোখে আঙুল দাদা (১৯৭৬), (৭) তেঁতুল গাছ (১৯৮১), (৮) সত্যি ভূতের গল্প(১৯৮১), (৯) পুঁটি রামায়ণ (১৯৮৯-৯০), (১০) মুন্নি ও সাত চৌকিদার (২০০১), ইত্যাদি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নতুন ভাবনা ও নতুন আমেজ আনার ক্ষেত্রে যেসব নাট্যকারের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে তাঁদের মধ্যে মনোজ মিত্র অগ্রগণ্য। তবে আধুনিক করে নাটক গড়তে গিয়ে ঐতিহ্যকে তিনি একেবারে ভুলে যেতে পারেননি। তাই প্রাচীন ঐতিহ্যকে বারে বারে নাটকের মধ্যে তুলে এনে আধুনিক কালে তাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এরকম নাটক হল 'কিনু কাহারের থেটার,' 'গল্প হেকিম সাহেব' প্রভৃতি। নাটকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটক(১৯৯৪)।

'গল্প হেকিম সাহেব' দুই অঙ্কের নাটক। অঙ্কগুলিও ১০ (৫ + ৫) টি দৃশ্যে সন্নিবেশিত। হেকিমি চিকিৎসাবিদ্যার এক গ্রাম্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে এখানে। নাটকটিতে চিকিৎসাবিদ্যার আড়ালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা উন্মোচিত হয়েছে। ক্ষমতার দাম্ভিকতার সঙ্গে নীতিবোধের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত নীতিবোধই জয়ী হয়েছে এখানে। এক ফকিরের মাধ্যমে নাট্যকাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। হেকিম সাহেবের কবরের কাছে এক ফকির প্রদীপ জ্বালিয়ে দশ পাক প্রদক্ষিণ করতে করতে দেড় শত বছরের আগেকার কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

হেকিম সাহেব খুব দয়ালু ও মানবদরদি-পরোপকারী মানুষ। তিনি বিনামূল্যে ইউনানি

পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষ অভাবের তাড়নায় ও কর্মব্যস্ততার কারণে হেকিমের কাছে আসতে না পারলেও হেকিম সাহেব নিজেই গিয়ে দুঃস্থ লোকেদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। এক দরবেশের কাছ থেকে পাওয়া তালপাতার পুঁথি দেখে তিনি এক নতুন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। মানুষের সেবায় মানুষের ভালোবাসায় তিনি বেশি জনসমর্থন পাচ্ছেন দেখে ক্ষমতালোভী ঈর্ষাকাতর দরিয়াগঞ্জের তালুকদার ওয়ালী খাঁ তাঁকে অমানুষিক শাস্তি দেন। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাত ভণ্ডুলকে দিয়ে পার্শ্ববর্তী পলাশপুরের তালুকের ডাকাতি ও অত্যাচার করিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করেন। ঠ্যাঙাড়ে ভণ্ডুলের অত্যাচারে ও মিথ্যাচারে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী গঙ্গামণি তাকে খুন করে এবং অবশেষে হেকিম সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্বালা জুড়ায়। নাটকে দেখা যায় দুই তালুকদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলি হতে হয়েছে অনেককেই।

আগেকার যুগে গ্রাম-বাংলায় রোগের চিকিৎসা করত হেকিম-বদ্যি-কবিরাজ। আগে গ্রাম-গঞ্জ ছিল রোগে ভরা। শিক্ষা ও সচেনতার অভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, পিলেজ্বর, খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি লেগেই থাকত। নোংরা ও জীবানু ভরা কাপড়-চোপড় সরবরাহ করা পুকুরে, এমনকি পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা পুকুরে ধোয়াধুয়ির ফলে মুহূর্তের মধ্যে রোগজীবাণু গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত এবং মহামারি মুহূর্তে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিত। ময়লা ও পায়খানা নিকাশের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না তখন। সেকালে দেশের রাজা ইংরেজ, ইংরেজের চেলা জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক তালুকদার-তহশীলদার-পত্তনিদারসহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানান মধ্যস্বত্ত্বভোগী শুধু খাজনা বুঝত। আকালে-রোগে-শোকে লোকে মরলেও তার প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা তারা করত না — খাজনা আদায় ছিল মূল ও মুখ্য লক্ষ্য। কোনো কোনো জমিদার-তালুকদার আবার খাজনা পাওয়ার জন্য প্রজাদের বাঁচিয়ে রাখতে ও চাষের সময়ে সুস্থ শরীরে চাষ করাতে হেকিম-কবিরাজ রাখত। আবার নিজের স্বার্থ ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম দেখলে সেই হেকিম-কবিরাজকে মানসিক ও শারীরিক পীড়নও করত। 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে সেই কাহিনিই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগে পাশ করা (এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি) ডাক্তারের গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হয়। হেকিম-বদ্যি-কবিরাজ আমাদের গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের অসম্মান এবং প্রয়োজনে গুরুত্ব প্রদান এই নাটকে চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এখন আমরা রোগের জন্য ডাক্তারের কাছে যাই; কিন্তু দরিয়াগঞ্জের হেকিম সাহেব নিজেই গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে রোগী খুঁজে বেড়াতেন। নাট্যকার ফকিরের সংলাপে একাল আর সেকালের তুলনা দেখিয়ে হেকিম সাহেবের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলেছেন —

"একালে মোরা বুঝি রোগীরাই ডাক্তার খুঁজে বেড়াবে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে। হেকিম সাহেব খুঁজে বেড়াতেন রোগী। গেরস্তর দোরে দোরে দিনভর টহল....ভালো আছো গো.....ভালো আছো...."[২]

—সেকালে কবিরাজের এমন আচরণ ও কার্যধারায় শুধু চিকিৎসা নয়, সাধারণ মানুষের প্রতি মানবিকতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিক ভালোবাসার পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রসঙ্গ প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে এখানে। এখনকার পাস করা ডাক্তারদের চাহিদা অনেক; কিন্তু হেকিম চিকিৎসাই বোঝেন। রোগী ঔষধ খেতে না চাইলেও জোর করে ঔষধ খাওয়ান, চাষের ফসল কাঁচকলা, মুলো, বেগুন, কুমড়ো ইত্যাদি যে যা দেয় তিনি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হন।

হেকিম সাহেব শুধু চিকিৎসা নয়, নতুন নতুন ইউনানি ঔষধ তৈরি ও আবিষ্কারে আন্তরিকভাবে উৎসুক ছিলেন। তিনি চড়াই পাখির মগজ নিয়ে তৈরি করতে চেয়েছেন 'হাববে জালিনুস'। এই 'হাববে জালিনুস' খেলে শরীরের শিরাগুলি স্বাভাবিক হবে, রক্তচলাচলও স্বাভাবিক হবে এবং শরীরে শক্তি আসবে। তিনি এক দরবেশের কাছ থেকে পাওয়া তালপাতার পুঁথি দেখে একটি নতুন ঔষধ 'শরবতে হুম্মা' তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যা খেলে একটা নতুন ছোঁয়াচে রোগ সেরে যায়। বাসকপাতা, শশার বীচি, ঝাউপাতা, থানকুনির ফুল এবং বিশটি রক্তগুলাবের পাপড়ি সাড়ে সাত ঘটি জলে ডুবিয়ে এবং স্নান করে মেয়েদের ভিজে চুল শুকাতে যে সময় লাগে সেই সময় যাবৎ গরম করে 'শরবতে হুম্মা' তৈরি করতে হয়। কিন্তু দরিয়াগঞ্জের তালুকদার ওয়ালী খাঁ আমোদ-ফূর্তির জন্য বাঈজী মোহরবাঈকে নৌকা থেকে ছিনিয়ে নিজের কাছে আনেন এবং বাগিচার সমস্ত গুলাব মোহরবাঈ-এর দখলে থাকায় হেকিম এই ঔষধটি তৈরি করতে পারেননি। এর ফলে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ও হৃদয়াকূতি অবশ্যই তাঁর আধুনিক আবিষ্কারমনস্ক ও মানবতাবাদী মানসিকতাকে দ্যোতিত করে।

হেকিমি চিকিৎসা আমাদের বাংলার ঐতিহ্য। হেকিম সাহেব সৎ ও আদর্শবাদী। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর কোনো ফাঁকি নেই। তালুকদার ওয়ালী খাঁ পার্শ্ববর্তী পলাশপুরের তালুকদার পশুপতি বাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৃদ্ধ বয়সেও সুন্দরী যুবতী বাঈজি মোহরবাঈকে এনেছেন, মোহরবাঈয়ের সন্তুষ্টির জন্য নিজের একমাত্র গোলাপবাগিচাকে দিয়েছেন, হেকিম সাহেবের নতুন ঔষধ আবিষ্কারে গোলাপ না দিয়ে গোলাপ-ছাড়া গোলাপপানি দিয়ে ঔষধ তৈরির কথা বলেছেন। কিন্তু হেকিম সাহেব তাতে রাজি হননি। তাঁর এই সততা ও আদর্শবাদী মানসিকতা আজও প্রশংসনীয়।

হেকিম সাহেব গ্রামের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের চিকিৎসা করেন। কিন্তু তালুকদার

ওয়ালী খাঁ শহরের পীরজাদা ডাক্তারের ঔষধ খান। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার হাওয়া যে গ্রামেও প্রবাহিত এ তারই ইঙ্গিত। তালুকদার নিজের ইচ্ছায় গ্রামে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখেন সাধারণ মানুষের রোগ-শোক বহাল রাখার জন্য। সুস্থ পরিবেশ যে রোগমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তোলে সেই আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে ওয়ালী খাঁর প্রতি মৌলবি সাহেবের উক্তিতে —

"রাস্তাঘাটের ময়লা সাফা, নিয়মিত গরু ছাগলের খোঁয়াড় সাফা, মশামাছি মারা, মানুষের জন্যে দুবেলা পেটটি ভরে খাওয়া। আর খাবার পানির পৃথক ব্যবস্থা.....এই করলেই অর্ধেক রোগ সাবাড়!"[৩]

হেকিম সাহেব যথার্থ চিকিৎসক। চিকিৎসার জন্য যেমন তিনি নিজেই রোগীর কাছে যান, তালুকদারের আদেশ-অনুরোধ পালন করেন, আবার নতুন আবিষ্কারের জন্য কোনো আপোসও করেন না, প্রয়োজনে তাঁর তালুকদারের প্রতিযোগী তালুকদার পলাশপুরের পশুপতির কাছেও যেতে চান। নতুন ঔষধের নতুন রোগীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন মোহরবাঈয়ের মধ্যে। তাই মোহরবাঈকে পলাশপুরে তাড়িয়ে দিলে তিনিও পলাশপুরে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মোহরবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন স্মরণীয়—

"মোহর।। কেন এসেছ তুমি এখানে?

হেকিম।। বাঈসাহেবা, আপনের দাওয়াইটি। আমি পেরেছি, বাঈসাহেবা, আবিষ্কারটি করতে পেরেছি। ...

মোহর।। ....আমি পলাশপুরের চর।

হেকিম।। আপনে যেই হন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমি পলাশপুরে আপনের জন্য আসি নাই, এসেছি একটি রোগের খোঁজে। আমার দাওয়াইটি পরখের জন্যই।"[৪]

—প্রকৃত ডাক্তারের কোনো জাত-ধর্ম-ঘৃণা-লজ্জা থাকে না। নতুন কিছু আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের জন্য সে জীবনকেও উৎসর্গ করে। হাকিম সাহেবের মধ্যে সেই আধুনিক মানসিকতারও প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

পলাশপুরের তালুকদার হেকিম সাহেবকে পেয়ে অনেক আকূতি-মিনতি করে নিজের তালুকে রেখে দিয়েছিলেন। পলাশপুরের গরীব সাধারণ মানুষকে সেবা-শুশ্রূষা তথা চিকিৎসায় ব্যস্ত থেকে হেকিম দরিয়াগঞ্জে আর ফিরতে পারেননি। রোগমুক্ত পলাশপুর গড়তে তিনি পানীয় জলের জন্য দীঘি খননের কথা বলেছিলেন। হেকিম সাহেবের এই পরিকল্পনা, প্রতিকার ও প্রয়োজনে প্রতিবাদ অবশ্যই আধুনিক মনস্কতার পরিচায়ক। পলাশপুরের এই আধুনিকীকরণে স্বার্থে ঘা লাগে তালুকদার পশুপতির। তাই তিনি হেকিম সাহেবকে তাড়াতে হেকিমি বিদ্যার অসারতা ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার গুণগান করে বলেছেন —

"নতুন ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। ফালতু কেন আর সেই কোন আমলের হেকিমি ধরে রাখা? পেছনে লাথি মেরে....."[৫]

কিন্তু আমাদের বাংলার ঐতিহ্য হেকিমি ইউনানি চিকিৎসা যে 'ফালতু' নয়, আধুনিক যুগেও এর মূল্য আছে, তা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উর্ধ্বেও উঠতে পারে কখনো কখনো, অজানা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ওয়ালী খাঁর আকৃতিতে তা প্রকাশিত —

"....যা যা — ব্যাটা আমারে বাঁচালে নারে।"[৬]

শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণির প্রেরণায় হেকিম সাহেব তালুকদার ওয়ালী খাঁকে আবিষ্কৃত ঔষধটি দেননি। অত্যাচার-জুলুম-স্বার্থপরতা ইত্যাদি খল-প্রবৃত্তির যোগ্য মৌন প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তিনি। হেকিম সাহেবের এ প্রতিবাদ অবশ্যই আধুনিকতাকে স্বাগত জানায়। এইভাবে দেখা যায় 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য হেকিমি ইউনানি চিকিৎসক হেকিম সাহেবের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, তালুকদারদের অত্যাচার-অনাচার, অন্যায়-জুলুম, ক্ষমতার দম্ভে সাধারণ মানুষকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান প্রভৃতি সুপরিস্ফুট হয়েছে এবং পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসক ও চিকিৎসাব্যবস্থার পদধ্বনি, দুই-এর তুলনা, মাননা-অবমাননা এবং ভৎর্সনা ও সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক যুগের নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটকে এমন প্রাচীন ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতার প্রকাশ সত্যিই প্রশংসনীয়।

হেকিমি চিকিৎসা আজ আর বিশেষ দেখা যায় না। এই ধরনের চিকিৎসার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান খুবই কম আছে। এই চিকিৎসার ধারা কিছুটা আছে পাড়া-গাঁয়ে কোনো বয়স্ক বা বয়স্কাদের মধ্যে; আর আছে বড় রাস্তার ধারে বা প্লাটফর্মে। এরা বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, ফল-মূল, মৃত প্রাণীর নির্যাস বা অস্থি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ সেদিকে ফিরেও তাকায় না। বয়স্ক বা প্রবীণদের কাছে ছাড়া এই চিকিৎসার কোনো মূল্য বা গুরুত্ব বা বিশ্বাসও নেই। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। এই চিকিৎসা এখন আমাদের কাছে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যমাত্র হয়ে আছে। এখন প্রায় সব লোকে ডাক্তারের কাছে, বিশেষত পাশ করা ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে থাকে। হেকিমি চিকিৎসায় রোগ সারে একটু দেরিতে, ধীর গতিতে। মানুষের সেই ধৈর্য, আস্থা ও বিশ্বাস নেই এখন। মানুষ এখন পাশ করা ডাক্তারের কাছে যাবে, ঔষধ খেয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলেও ডাক্তারকে ছাড়বে না। তারা একের পর এক ডাক্তার পাল্টাবে, অথচ হেকিম বা কবিরাজের কাছে যাবে না। নিঃশেষিত হেকিম-কবিরাজরা আজ রাস্তার ধারে বা প্লাটফর্মে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে অমানুষিক কষ্ট পেয়ে থাকে। একে তো আয়-রোজগার নেই, উপরন্তু মানসিক কষ্ট — সব মিলিয়ে তাদের শোচনীয় অবস্থা। অথচ এরাই এক সময় গ্রাম-বাংলাকে বাঁচিয়েছে, রক্ষা করেছে দেশ। ডাক্তারের আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির আবির্ভাবে এই প্রাচীন ঐতিহ্য হেকিম-কবিরাজের

শোচনীয় পরিণতি যে কি নিদারুণ ও মর্মন্তদ তা সহমর্মিতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে।

হেকিম-কবিরাজ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হলেও আধুনিক কালেও এর ভূমিকা আছে —নাট্যকার তা দেখিয়েছেন এই নাটকে। এখনো দেখা যায় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ডাক্তার সারাতে পারেন না; সেই সমস্ত রোগ হেকিমি বা কবিরাজি চিকিৎসায় অনায়াসে অনেকটা নির্মূল হয়। এই নাটকে দেখা যায় হেকিম সাহেব গুলাব দিয়ে যে ঔষধ 'শরবতে হুমমা' তৈরি করেছেন, সেই ঔষধেই এক অজানা ব্যাধি নির্মূল হয়; শহরের ডাক্তারের ঔষধে তা হয় না। হেকিমি-ইউনানি চিকিৎসার সেই সম্মান ও গুরুত্ব প্রদর্শিত হয়েছে, যা আধুনিক কালেও স্মরণীয় ও উপাদেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এই নাটকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সুন্দর প্রকাশ নাট্যকারের মননঋদ্ধতার পরিচায়ক।

হেকিমি চিকিৎসার লোককথা নিয়ে রচিত 'গল্প হেকিম সাহেব'-এর কাহিনি দুটি অঙ্কে দুটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হেকিম সাহেবের চিকিৎসা ও তাঁর কর্মনিষ্ঠা, অবিরাম-অবিশ্রান্ত সমাজসেবার আদর্শ এবং দ্বিতীয় ভাগে তাঁর করুণ-মর্মন্তদ পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে, দেখানো হয়েছে হেকিমি চিকিৎসার সেকাল ও একাল — ঐতিহ্য ও আধুনিকতা। তবে এরই অন্তরালে নাট্যকার এক গভীর মর্মসত্য ব্যঞ্জিত করেছেন। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন আগে চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে শুধু চিকিৎসা নয়, গভীর মানবিক যোগ ছিল, ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে হৃদ্যতা ও সযত্ন সেবা। দেখাতে চেয়েছেন হেকিমি-চিকিৎসার সেই দুর্লভ দরদি মানসিকতা ও হার্দিক-মানবিক দিকটি আধুনিক বিত্তকামী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে ক্রমশঃ লোপ পেতে চলেছে। আগে হেকিম সাহেব ছুটতেন রোগ-মারণ ও মানব-সেবার লক্ষ্যে। এখন আধুনিক ডাক্তাররা ছোটেন অর্থ-সম্পদ, যশ-খ্যাতির লক্ষ্যে। অনেক সময় মানবসেবা নয়, মানব-শোষণই অনেকের কাছে লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। রূপকধর্মী এই নাটকের নাট্যকাহিনির রূপক-উন্মোচনে সেকাল ও একালের চিকিৎসা ব্যবস্থার নীতিবোধের এই দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব মিলিয়ে হেকিম সাহেব চরিত্রটির একটা সম্পূর্ণাঙ্গ দিক প্রকাশে একটা গোটা মানুষের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। তবে প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত থাকা সত্ত্বেও হেকিম সাহেব চরিত্রটি জটিল বা round হয়ে ওঠেনি, সরল বা simple বা flat চরিত্রই থেকেছে। নাটকটি নাট্যকারের সার্থক সৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,২০০৫, পৃষ্ঠা- ৪৩২
২. 'গল্প হেকিম সাহেব', মনোজ মিত্র, 'মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র', তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স, ১৪১৬ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা- ১১২
৩. তদেব, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা- ১২৫
৪. তদেব, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা- ১৫৪
৫. তদেব, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা- ১৫৬
৬. তদেব, দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, পৃষ্ঠা- ১৬১

গ্রন্থঋণ :

১. Alan Reynolds Thompson éŸŸŸéòThe Anatomy of Drama– California– 1946
২. David Bain Drama Technique - Actors & Audience– Oxford University press– 1977
৩. J. A cuddonA Dictionary of Literary Terms and Theory– Basil Black well Ltd. Oxford– 1991-3rd Edition.
৪. অজিতকুমার ঘোষ —'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১
৫. আজহার ইসলাম —'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)', ঢাকা, ২০০১(তৃতীয় সংস্করণ)
৬. চিত্তরঞ্জন লাহা —'বাংলা নাটকের টেকনিক', কলকাতা, ১৯৭৪
৭. ড. জগন্নাথ ঘোষ—'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৯
৮. দেবব্রত বিশ্বাস(সম্পা)—'বাংলা নাট্যচর্চা : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা; বাংলার মুখ, মধ্যমগ্রাম,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪
৯. বৈদ্যনাথ শীল —'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা', কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
১০. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান —'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা,১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

জয়ন্ত মিস্ত্রি

নাটকে লোক শিক্ষা : মনোজ মিত্রের 'যা নেই ভারতে'

লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম নাটক। লোকশিক্ষা কী? 'লোক' কারা? মানুষ হয়ে ওঠার সাধনায় কেউ কেউ প্রতিভাবান, আর কেউ কেউ মানুষের প্রতিনিধি থেকে যান। এই প্রতিনিধি মানুষকে 'লোকসাধারণ' বা 'জনগণ' বলা যায়। লোকশিক্ষা এঁদের জন্য। এই জনগণ বা লোকসাধারণ পারিবারিক সীমার বাইরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কৌতূহলহীন ও অসচেতন। এঁদের নিয়েই সমাজ। এঁরা ব্যবহৃত হচ্ছেন, শোষিত হচ্ছেন। আবার যুগে যুগে শোষণমুক্ত জীবন তাঁদের উপহার দিতে জীবন উৎসর্গ করছেন বিপ্লবীরা—চিন্তানায়কেরা। রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবে বা পরিবর্তনে 'লোকসাধারণ'- এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা আজও গৌণ। আবার যে-কোনো প্রতিবাদী শক্তিকে 'লোকসাধারণ' তথা জনগণের সহায়তায় সাফল্য লাভ করতে হয়। সব দেশে সব কালে প্রতিভাবান নাট্যকাররা যুগ প্রয়োজনে এই সংকটমোচন নিষ্ক্রিয় জনগণকে জাগানোর উদ্দেশ্যে নাটক লিখেছেন। মাস থিয়েটার অভিনীত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'হারানের নাতজামাই' জাগ্রত জনগণকে তুলে ধরেছে। তাদের নেতাকে পিতা সম রক্ষা করেছে ময়না, এক সাধারণ নারী। অনেক শক্তি অনেক বাহিনী নিয়ে দারোগা মন্মথ শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়েছে:'মানুষের সমুদ্র ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।' (হারানের নাতজামাই, পৃষ্ঠা ১৪৭)

রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা নীতি, এমনকি ধর্ম কর্মও বৃহত্তর জনসাধারণকে বাদ দিলে ব্যর্থ হতে বাধ্য।। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারের মাধ্যমে লোক শিক্ষার কথা বলেছেন। নটী বিনোদিনী তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছেন। প্রেরণা মূলক এ জাতীয় নাটকের ভিত্তি অনেক সময় ঐতিহাসিক কখনো বা পৌরাণিক। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে যেমন সমকালের অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে করা হয়ে থাকে, পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সওদাগর' (১৯২৭), 'কারাগার' (১৯৩০), সাবিত্রী (১৯৩১) কিংবা মনোজ মিত্রের 'যা নেই ভারতে' (১৪১৩) এ জাতীয় নাটক। নাটকটি বুঝতে হলে জেনে নিতে হবে শিল্পীর অভিপ্রায়কে তাঁর সমকাল ও সমস্যা।

রাজশক্তির আনুকূল্য ছাড়া কোনো সাফল্য সহজে লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিরাগ ভাজন হলে প্রশাসকের ভ্রুকুটিতে সর্বস্বান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, অনেক রাষ্ট্রীয় দুঃসময়ে তা নৈমিত্তিক ঘটনা। কী হয়—রাজশক্তি যখন শোষক কিংবা অত্যাচারীর ভূমিকা নেয়? রাজরোষে পড়ে মূল্যবান জীবন নষ্ট করা ছাড়া প্রতিবাদের তখন কোনো অর্থ থাকে না। তখন রাজশক্তির অহিতকর অধঃপতনের প্রতিবাদে জনমত গড়ে তোলা নাট্যকারদের অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাতেও কি রক্ষা আছে? আমাদের দেশে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন—

সে কি ভুলে যাওয়ার? সুধী প্রধান বলেছেন:... "শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গণনাট্য সংঘে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।" শিল্পীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কত নৃশংস হওয়া যায় তা জানার জন্য ইতিহাস তো আছেই, চোখের সামনে আছে উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' (৯ই অগাস্ট, ১৯৩২)। এ নাটকে 'সমাজ' নামক নাটক লেখার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে বিবেকের ভূমিকায় কবি ও গায়ক মুকুন্দ দাসকে। সরাসরি সমাজের কথা, যা ইতিহাস—তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে সব নাটক তাদের নাট্যকারদের অত্যাচারী শাসকের হাতে কম হেনস্থা হতে হয়নি। সে সব নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব জনমানসে অনেকখানি। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জনগণকে বোঝাতে প্রত্যক্ষত সমকাল সাহায্য করেছে। সুদূর অতীত কিম্বা ভিন্ন দেশের ইতিহাস, অসচেতন সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে কম, তাই মহাকাব্যের আধারে যুগপ্রয়োজনকে তুলে ধরার কৌশলগত দিক বেছে নিলেন কোনো কোনো নাট্যকার। মন্মথ রায় কিম্বা মনোজ মিত্রের নাটক মহাকাব্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় সর্বসাধারণের চর্চিত ক্ষেত্রকে আশ্রয় করতে পেরেছে। মহাভারতের চরিত্র সাধারণ মানুষের অজানা নয়। কাহিনী পরিণতি ও অনুসৃত আদর্শ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই অচ্ছেদ্য সত্তা রূপে বর্তমান। রামায়ণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী চিরকালের জন্য সত্য—

'যাবৎ স্থাস্যতি গিরয় সরিৎশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণী কথা লোকেসু প্রচারিস্যতি।।'

শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ' (পঞ্চম বৈদিক)একই উদ্দেশ্যে রচিত।

আমরা তো জেনেই গেছি জনসাধারণের মর্মে মর্মে ধর্মের প্রভাব। মর্মকে আকর্ষণ করতে হলে ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে। বর্তমানে রাজনীতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজনীতির সওদাগররা নিরুপায়, কেননা ধর্মকে আশ্রয় না করলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাদের প্রতিযোগিতা লোক সাধারণকে ঠকিয়ে নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া, যথার্থ শিল্পীরা সে গোত্রে পড়েন না।

শৈল্পিক বিচারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। এই উদ্দেশ্য মূলতা ঢাকা পড়ে সংলাপ ও কাহিনী পরিকল্পনার সার্থক পটভূমি রচনা করতে পারলে। মনোজ মিত্র এ বিচারে সফল। কোনো ভাবে মনে হয় না কষ্টকল্পিত কোন পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রগুলির সংলাপ, প্রেক্ষিত ও পরিবেশ পৌরাণিক পরিমণ্ডলের কাম্য আবহে গড়ে উঠেছে। তাদের মানসিকতা ও কথোপকথনে সেকালের স্বাভাবিক ধর্ম বজায় রয়েছে। এরপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো স্বকালের সমস্যাকে পৌরাণিক পরিবেশে লাগসই করে চরিত্র ও কাহিনীকে স্বভাব ধর্মের প্রেষণায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনোজ মিত্র এ নাটকে কীভাবে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন আমরা তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুন্নাম' গল্পে দেখিয়েছেন নিজের বিদ্বেষপরায়ণ হিংসুক ছেলের আরোগ্যে খুশি হতে পারেননি বাবা। তাঁর আশ্চর্য লেগেছে যে চেঞ্জে এসে সহিষ্ণু ভালো ছেলেটি আরো অসুস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেলো আর কলহপরায়ণ নিজের ছেলে বেঁচে উঠলো। বাবার কথায় মা চমকে উঠলেন, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করতে পারলেন না। এরা তো বাঁচবেই, নইলে পৃথিবীকে হিংসায়, কলহে পূর্ণ করবে কারা?

এ গল্পে ব্যতিক্রমী ভাবনা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সকলেই নিজের রক্তের জন্য পরিশ্রম করে, এমনকি অন্যায় করেও অর্থ সঞ্চয় করে, শক্তি সঞ্চয় করে, সৎপাত্রে সে অর্থ পড়ল কি-না কে তার বিচার করে? বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর নিজের সন্তান বঞ্চিত হয়েছিল সমাজ মঙ্গলের উপযুক্ত করে নিজেকে সে তৈরি করতে পারেনি—এই ছিল পিতা বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস!

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজা হওয়ার দিন শেষ। জনসাধারণের কপালে রাজা ভাগ্য তাই দূর অস্ত। যে-কোনো রাজনৈতিক দল স্বজন পোষণে ব্যস্ত। পরিবার তন্ত্রে বিশ্বাসী! এই ভাবে রাজ বংশের উত্তরাধিকার ভাবনাই যুগোপযোগী পরিবর্তন নিয়ে এখনো লোক সাধারণকে যোগ্য শাসক পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। ভারতবর্ষের একদা বৃহত্তর দল কংগ্রেস পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে বাংলার রাজনীতি। কোনো কোনো বিশিষ্ট বিশ্লেষক এমনকি বিরোধী ও স্বদলীয় এম. এল. এ. এম. পি. রা উপলব্ধি করছেন বর্ণহিন্দুর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ছাড়া বাংলা চলতে পারেনা--বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ নয়।

রাজনৈতিক জগতের মত যাঁরা কুরুচিকর আক্রমণ শাণাতে পছন্দ করেন না অথচ সত্যকে প্রকাশ করতে চান সেই সমস্ত শিল্পীদের হাতে পরোক্ষ উপস্থাপনা মহাভারতের ভীষ্ম কিম্বা গুরু দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্যের শস্ত্র শিক্ষাদানের মাপকাঠি: 'রাজকুলে জন্ম নহে যার, অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার' আর ভীষ্ম? স্বয়ং বিবাহ না করলেও হস্তিনার রাজবংশের উত্তরাধিকারীর জন্য তথা পাণ্ডুর আরোগ্য কামনায় প্রভাস তীর্থে দেবতাদের খুশি করার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত! পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আগেই জেনে গেছেন এত কাণ্ড করে যাদের বংশীয় পরিচয় দিয়ে রাজা বানাবার পরিকল্পনা করা হলো তারা প্রকৃতিতে আদৌ রাজোচিতগুণ সম্পন্ন নয়।

ছোটবেলা থেকেই ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু যে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন তা তো সকলেরই জানা! কুরু প্রধান হিসেবে তাঁর অবিদিত কিছুই নেই।

বিদুর।। 'কী বলো ভাই পাণ্ডু! সিংহাসনে জ্যেষ্ঠেরই অধিকার। ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠ। সিংহাসন রক্ষার্থেই তার জন্ম...

পাণ্ডু।। 'আমারো তাই। তাই যদি না হবে সেদিন ব্যাসদেবকে কেন দ্বিতীয়বার আহবান করা হলো মাতা অম্বালিকার শয্যায়?'

(কঞ্চুকী এসে দাঁড়ালো অদূরে।)

ও যদি ভেবে থাকে ও সিংহাসনে বসবে—আর আমি ওর দেহরক্ষী হয়ে ধনুর্বান কাঁধে নিয়ে দাঁড়াবো... মহা ভুল করবে! (যা নেই ভারতে,২০ পৃষ্ঠা)

এইতো সিংহাসনের দখল নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষপরায়ণতা আর এই রাজসিংহাসন রক্ষার জন্য ভীষ্ম বলি প্রদত্ত!

বর্তমান বিশ্ব তথা ভারতের প্রধানতম সমস্যা দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের অভাব; অযোগ্য মানুষের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহার। মাতা অম্বিকা হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পাণ্ডুর অভিষেক হবে শুনে বলেছিলেন:

'চপল চটুল পাণ্ডুর কোনো গভীরতা আছে কি, কিংবা হৃদয়ের সেই প্রসারতা? মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হবে পাণ্ডু! হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে কি অযোগ্যরাই বসবে চিরকাল!'(যা নেই ভারতে,পৃষ্ঠা ২২)

অনুশোচনা কথাটির অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যা আগে থেকে কল্পনা করা যায় না, ঘটে যাওয়ার পর তা স্পষ্ট হয়ে যায় তখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তা কাজে না আসলেও যথার্থ। তাই কাজের পরে অনুশোচনা হয়। নিজের কাজের ভুল বুঝতে পারা যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে পাণ্ডুকে রাজা করা অম্বিকা সমর্থন করেননি, তখন মহামতি ভীষ্ম বলেছিলেন: 'বুঝতে পারছি, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা সপত্নীপুত্রের সৌভাগ্যে তুমি হিংসাপরায়ণা। নইলে পাণ্ডুর বীরত্বে কে না গর্ব করে?' (যা নেই ভারতে,পৃষ্ঠা ২২)

অসুস্থ পাণ্ডু চলে গেলেন, বামপ্রস্থের সঙ্গী হলেন কুন্তী ও মাদ্রী। হস্তিনাপুরের সিংহাসন শূন্য পড়ে রইল। মগধের রাজা অশ্বমেধের ঘোড়া দিলেন আটকে। হস্তিনাপুরের একচ্ছত্র সম্রাট আজ বানপ্রস্থে। এখনই দরকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নইলে রাজা বিহীন যজ্ঞ হয় না। অগত্যা রাজা করা গেল ধৃতরাষ্ট্রকে। উদ্দেশ্য ধৃতরাষ্ট্রকে রাজাবানিয়ে নিজেই যাবেন মগধ রাজকে উচিত শিক্ষা দিতে। এদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পররাজ্য আক্রমণ নিষিদ্ধ করে দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ।। '... আমি কোনো বর্ণ দেখতে পাই না... লাল নীল সাদা কালো ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্র কোনো বর্ণই না। কাজেই আমি যদি রাজা হই, আমার রাজ্যও আমার মতই চলবে। অশ্বমেধের কোনো প্রয়োজন নেই জেঠামশাই।' (যা নেই ভারতে,৩৪ পৃষ্ঠা।)

মহাবীর ভীষ্ম এই অপমান হজম করতে পারছেন না যে মগধের রাজা যজ্ঞাশ্ব আটকে দিয়েছে অথচ হস্তিনাপুর নরেশের নির্দেশ অমান্য করার উপায় নেই। তখন তার মনে হল সেদিনের সেই কথা যখন অম্বিকা তাকে বংশ রক্ষার জন্য সন্তান দান করতে বলেছিলেন, আর মহামতি ভীষ্ম তাঁকে তিরস্কার করতে ছাড়েননি। সব কথাই মনে পড়ছে বহুদিন বাদে। মহামতি ভীষ্ম নিরুপায়ের মতো তখন অনুশোচনায় বিদ্ধ হলেন :

ভীষ্ম।। 'সেদিন তোমাকে দুঃখ দিয়েই কি এমনটা হল! নাহভুল করেছি অম্বিকা,

মহাভুল! তুমি ঠিকই বুঝেছিলে, আমার প্রতিজ্ঞাই দেশটাকে বারংবার সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। (যা নেই ভারতে, ৩৪ পৃষ্ঠা)

অম্বিকা বলেছে, 'জীবনের থেকে প্রতিজ্ঞা বড় নয়। জীবন এগিয়ে যায়, প্রতিজ্ঞা স্থির থাকে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কে পিছনে টেনে ধরে।

ভীষ্ম ।। 'সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে কারো মঙ্গল হয়নি অম্বিকা!' (আঁচলে চোখ ঢেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল অম্বিকা।) ৩৪ পৃষ্ঠা

এই পালিয়ে যাওয়া থেকে সেদিনের সেই আত্মদানে উন্মুখ মহিলার লজ্জা নত মুখটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—নাট্যকারের সার্থকতা এখানেই। এই নারী যখন মহামতি ভীষ্মকে স্পষ্ট করে বংশ উদ্ধারের জন্য সন্তান দানের আকুতি জানান তখন ভীষ্ম বলেছিলেন: 'স্তম্ভিত... তোমার স্পর্ধায় আমি স্তম্ভিত ! পতনের পথ দেখায় নারী ! সত্য রক্ষার পথ থেকে বিচ্যুত করে অপযশের অনন্ত পঙ্কে নিক্ষেপ করতে চায়?'

সত্যকার প্রেম-বঞ্চিত নারী যেমন প্রতিবাদ করে তেমনি প্রতিবাদী ছিলেন সেদিনের অম্বিকাও : '(আহত সর্পিনীর মতো)' ও, তবে বংশ রক্ষা দেশ রক্ষার ঊর্ধ্বে আপনার সত্য রক্ষা প্রতিজ্ঞা পালন!"

যা অস্বাভাবিক তাকে জোর করে বাস্তবায়িত করার মধ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা আছে আলোচ্য নাটকে—মনোজ মিত্র তা দেখিয়ে দিলেন। শ্রী রামচন্দ্র মাতা কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে জীবনে একজনের বেশি কোনো নারীকে তিনি বিবাহ করবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দশরথের সহস্র সহধর্মিনী ছিলেন। প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, কৈকয়ী ও সুমিত্রা। বোঝা যাচ্ছে নারী ব্যতীত পুরুষের জীবন কাটানো অসম্ভবের মতই কঠিন। স্বাভাবিক কথাকে কেউ প্রতিজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করে না। রামায়ণে রামচন্দ্র, মহাভারতে মহামতি ভীষ্ম তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য জগৎবিখ্যাত।

ভীষ্ম কাশি রাজকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লুণ্ঠন করে এনেছিল তার ভাইয়ের জন্য, সেই প্রসঙ্গে কঞ্চুকী বলেছে "রীতিমত যুদ্ধ করে স্বয়ংবর সভা থেকে তুলে আনলো।" (ভীষ্মকে দেখিয়ে) মেয়েরা তখনই তো ওর গলায় মালা পরিয়ে দিতে যায় কিন্তু ভীষ্ম? (মাথা নেড়ে) না! না! সেই রাতেই ধরিয়ে দিল আদরের ছোট ভাইটির হাতে।"

ভীষ্মর মহানুভবতার কথা পুরোহিত আরও দীর্ঘায়িত করেছে: "পারবে... ভূ-ভারতে একটি লোকও পারবে লুণ্ঠিত রাজকন্যে নিজে না ভোগ করে অন্যকে দিয়ে দিতে ! মহারথী ভীষ্ম সেদিন যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—"

কঞ্চুকী তার রেশ ধরে বলে, 'সাধে কি জগতের লোকে ভীষ্মের নামে ধন্য—ধন্য করে গো!'

মহামতি ভীষ্ম এই প্রশংসায় হয়তো সংকোচবশত বলেন: (হাসতে হাসতে) ওহো কঞ্চুকী মশাই শ্বাসযন্ত্রটিকে একটু বিশ্রাম দিন। যান, বাইরে অপেক্ষা করুন —এসো অম্বিকা—

লক্ষ্যণীয় যে নাটকের মধ্যে গতি অত্যন্ত প্রবল। হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত ঘটনা এগিয়ে চলেছে সিরিয়াস বিষয়ের দিকে। রসের বদল যেমন হল তেমনি নাটকীয়তার গাম্ভীর্য কমলো না।

নাটকের শুরুতেই কঞ্চুকী বলেছে: 'এক ছিল নাবালক রাজা।....(হেসে) বেচারী খোকারাজা একটাও বাচ্চাকাচ্চা রেখে যেতে পারেনি গো! সিংহাসনে বসে কে, বংশই বা রক্ষা করে কে? পুরীসুদ্ধ মানুষ আকুল চেয়ে আছে একজনের দিকে...'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কঞ্চুকী চরিত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে—১৮৮২ সালে 'রামের বনবাস' নাটকে নাট্যকার প্রথম হাস্য রসাত্মক কঞ্চুকী চরিত্র সৃষ্টি করেন।

হস্তিনাপুরের রাজবংশে অযোগ্য সন্তানের হাতে সিংহাসন যেতে চলেছে তাই সিংহাসন রক্ষার স্বার্থে ধৃতরাষ্ট্রকে হত্যার নির্দেশ পালন করতে এসেছে পাতকিনী। তাকে বাধা দিচ্ছে কঞ্চুকী! বিস্মিত হয়েছে পাতকিনী।

পাতকিনী ।। 'এ ড্যাকরা বুড়ো জানে না নাকি পাতকিনী কেন আসে! সে না এলে তোদের নগরীর আবর্জনা বিদেয় করবে কে র‍্যা!' (যা নেই ভারতে,১৫ পৃষ্ঠা)

সে আরও স্পষ্ট করে বলে রাজপুরীর গোপন কলঙ্কের কথা। এই কলঙ্কের শরিক কঞ্চুকী স্বয়ং।

পাতকিনী।। ...'শোন বুড়ো তুই যেমন রাজকম্মোচারী, আম্মো তাই। তোর কাজ রাজবাড়ীর বাচ্চা পালা, আমার কাজ তোরা যেটাকে ফেলে দিস, সেটাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মারা।...' (যা নেই ভারতে,১৫ পৃষ্ঠা)

আপাত দৃষ্টিতে হতে পারে বড় নির্দয় কাজ করে এই পাতকিনী। রাজমহলের ব্যভিচার চরিত্রহীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা যে পাপের জন্ম দেয়। তা থেকে রক্ষা করে পাতকিনী। নাটকের অগ্রগতিতে তার মাতৃ হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তির ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি।

কঞ্চুকী তাকে রাক্ষসী বলায় সে বলে: 'ওরে এ পাতকিনী রাক্ষসী না থাকলে সারা হস্তিনা রাজ্যের অনাচার আর ব্যভিচারের রক্তমাখা পুঁটুলিগুলো জঙ্গলের আঁধারে ঢাকতো কে র‍্যা? বুড়ো কাছিম ! নিজেও কতোবার কতো সোনার চাঁদ এই আঁচলে বেঁধে দিয়েছিস ভুলে গেলি? (যা নেই ভারতে, ১৬ পৃষ্ঠা)

পাতকিনী।। 'সেইটাই তো কোনোকালে হদিশ করতে পারলাম না, কার আদেশ ! তবে নিত্যি আসে বাতাসে ভেসে ভেসে, ঠিক পাতকিনীর কানে পৌঁছে যায়! তাই জগতের সবচেয়ে বড় পাপ কাজটা তাকেই করতে হয়! তাই তো সে পাতকিনী!' (যা নেই ভারতে, ১৬ পৃষ্ঠা)

দমন-পীড়ন নীতি রাষ্ট্রের পক্ষে তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারলেও বাস্তবে সুদূরপ্রসারী ফল খারাপ হয়—মনোজ মিত্র এই কথাটি প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিদুরের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে।

ধৃতরাষ্ট্র ।। '(উত্তেজিত) ব্যাধি বিদুর বংশের চিরকালের ব্যাধি ! হরণ! লুণ্ঠন ! আর সুন্দরী পেলে তো কথাই নেই...' (যা নেই ভারতে,২০ পৃষ্ঠা)

গান্ধার রাজ্য জয় করবার পর লুণ্ঠন সামগ্রী উটের পিঠে চাপিয়ে দ্বিগবিজয়ী বীর পাণ্ডু যখন আসতে যাবেন তখনই গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী সামনে এসে দাঁড়ালেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য গান্ধারীকে নিয়ে এলেন হস্তিনাপুরে। গান্ধার রাজ সুবল ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন সংকটে সমরে মহাবীর ভীষ্ম বৈবাহিক হিসেবে পাশে দাঁড়াবেন, কিন্তু এ মোহ তার ভেঙে গেল। ইনি কি কখনো এই অপমান ভুলতে পারবেন? কার্যত তা সম্ভব হয়নি বরং শত্রু হিসেবে পরবর্তী কুরুক্ষেত্র সমরে শকুনি কাজ করে গেছেন। নাট্যকার সুবল শকুনি এবং গান্ধারীর কথোপকথনে তা জানিয়ে দিয়েছেন:

সুবল ।। '... তোর বিবাহের পরে এরা আমার সঙ্গে ভিক্ষুকের মতো ব্যবহার করছে। ও হো হো, অর্থের লোভে আমি তোর সর্বনাশ করেছি মা। একটা জন্মান্ধের হাতে তোকে সম্প্রদান করলাম। (ওরা দেখেনি উদ্যানের পথে ধৃতরাষ্ট্র চবুতারায় আসছে।) লোভে পড়ে এ কী করলাম! শকুনি।'

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কিন্তু তার অন্তর্লোক উপলব্ধি করতে পারে সবকিছু, তাই মহামতি ভীষ্মকে অনেক আগেই তাঁর প্রশ্ন:

'জেঠামশাই--- গান্ধাররাজ কি স্বেচ্ছায় সাহায্য নিতে এখানে রয়েছেন? নাকি আমরাই তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করছি?'—এই প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় মিথ্যা বলে সবাইকে বোঝানো যায় না। প্রসঙ্গটি স্মরণীয়:

ভীষ্ম।। 'কী হল, প্রভাত না হতে কীসের কোলাহল? গান্ধাররাজ সুবল নিজের প্রয়োজনে এখানে অবস্থান করছেন! যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধাররাজ্য গড়ে তুলতে তিনি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী। এতে তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না।' (যা নেই ভারতে, পৃষ্ঠা ২০) স্বয়ং ভীষ্মের পক্ষেও মিথ্যাকে গোপন করা সম্ভব হয়নি। হলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে এ প্রশ্ন করতেন না।

নাট্যকার মনোজ মিত্র মানুষের সুস্থ সমাজ গঠনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর জন্মদান রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন অম্বিকার মাধ্যমে। ঘটনাক্রমে পাঠক বা দর্শক উপলব্ধি করবেন সুসন্তান এবং কুসন্তান জন্মানোর আসল কারণ।

অম্বিকা।। "(ভীষ্মের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টি রেখে) একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, সেই পুরুষকে কি আমি নির্বাচন করতে পারি?"

মনে রাখতে হবে স্বামী নির্বাচনে পাত্রীর সচেতন গুণ ভিত্তিক বিবেচনার অধিকার অত্যন্ত মূল্যবান। কাশির রাজকন্যা অম্বিকা বুদ্ধিমতী এবং মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সন্তান জন্মদানের জন্য উভয়ের শারীরিক ও হার্দিক মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তার পক্ষে অন্য কাউকে স্বামীর জায়গায় গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল।

অম্বিকা বলেছে 'দেব, কুরুশ্রেষ্ঠ, এই প্রাসাদে আপনি এই ভাগ্যহীনার অভিভাবক। আপনি যা চাইবেন তাই হবে কিন্তু... কিন্তু যা সম্ভব নয়...' (যা নেই ভারতে, পৃষ্ঠা ১০) পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেরেছি মহর্ষি ব্যাসদেব সেই একই কথা বলেছেন:

ব্যাস।। 'তৃপ্তিহীন মিলন বিনষ্ট বীজের মতো। কোন ফল দেয় না। রানি আজ নিশি যাপন বিফলে গেল তোমার। (যা নেই ভারতে, পৃষ্ঠা ১৩)

মিলনের সেই রাতে অতৃপ্ত অম্বিকা পরদিন বিরক্ত, অপমানিত; ব্যাসদেবকে তাঁর হৃদয় ভাঙা মন্তব্য করেছেন। নারীকে বাধ্য করা কত বড় ভুল। এই উক্তিতে তা ধরা পড়েছে:

'একটি রাজবংশরক্ষার তাড়নায় নিযুক্ত আমরা দুটি নারীপুরুষ। মহর্ষি ব্যাস, এই আয়োজিত মিলনে নারীটি যদি তার পুরুষটির থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে কীবা যায় আসে? আপনি আপনার দায় পালন করেছেন ...আমি আমার।' (যা নেই ভারতে, পৃষ্ঠা ১৩)

অবশেষে বলবো যারা হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরসূরী হতে পারতো তারা ভাগ্য দোষে নির্বাসিত। রাজপুরুষদের স্খলনজনিত কারণে তাদের জন্ম। রাজ পুরুষের আগ্রাসী নীতি সমরপ্রিয়তা—সবই বর্তমান নেই, কেবল সামাজিক সম্মান। অতএব তারা সিংহাসনের দাবিদার হয়ে যুদ্ধ করবে এ তো খুব স্বাভাবিক। তাদের উপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটবে প্রতিবাদ; এটাই তো স্বাভাবিক।। নাট্যকার তাই পাতকিনী মায়ের মাধ্যমেই সে কথা ঘোষণা করলেন। মৌমাছির চাকের উপর অজ্ঞাতে ধৃতরাষ্ট্র খোঁচা দিলেন এবং ঘটে গেল বিপর্যয়!

পাতকিনী।। 'দে! আরো দে! না দিবি তো বন থেকে বেরিয়ে তারা ওই মৌমাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তোদের ঘাড়ের ওপর.'..(যা নেই ভারতে,পৃষ্ঠা ২৫)

একটিমাত্র গান আছে এই নাটকে আর সেটি পাতকিনী মায়ের মুখেই বসানো হয়েছে:

"কামড়ে দেবো উপড়ে নেব—
খুবলে খাব ছুবলে নেব —
ভ্রমর হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তেড়ে এসে
কামড়ে দেবো উপড়ে দেবো—" (যা নেই ভারতে,পৃষ্ঠা ২৬)

বোঝাই যাচ্ছে মাতৃ হৃদয় স্বীকৃতি পাক বা না পাক পাতকিনী হৃদয়বতী মহিলা। হস্তিনাপুরের অবৈধ সন্তানদের রাজকুলের মান রাখতে শিশুদের হত্যা করতে নিযুক্ত হয়েছে সে, পারেনি। বোধহয় ধৃতরাষ্ট্র সে কথা মনে রেখে তার কোমল হৃদয়কে চিনে ফেলেছে, তাই সিদ্ধান্ত নেয় এবং কঞ্চুকীকে বলে: 'আপনি বলেছেন, একদিন পাতকিনী আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এবার আমি তার ছেলেদের টানবো। শত পুত্র ভিক্ষা করব তার কাছে।'

বোধহয় ব্যাসদেব জানতেন অম্বিকা ভুল কিছু বলেননি। তার প্রতি ক্রোধ জন্মালেও দুর্বলতা যথেষ্টই ছিল। তাই তিনি বলেছেন: 'বল, বল, কী চাই তোমাদের পুত্র! অম্বিকার পুত্রের কোন বাসনাই অপূর্ণ রাখব না আজ।' (যা নেই ভারতে,পৃষ্ঠা ৪৩)

তারপর ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্রদের জানান: ‘পুত্রগণ, আমরা বড় অসহায়, বড় একা, নিরাপত্তাবিহীন। ওই দেবতা- সাধু - যোদ্ধাদের মিলিত চক্র আমার ধ্বংসে এগিয়ে আসে। তাদের অস্ত্রের ঝংকার উঠেছে ...!

এসো বন্য হিংস্রতা নিয়ে, ক্রূরতা নিয়ে, শঠতা নিয়ে, বর্বরতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো... আক্রমণ কর... ন্যায় নীতি ধর্মশাস্ত্র সব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো... ধ্বংস করো!

যুদ্ধের বিভীষিকা পাতকিনীকে যুদ্ধ বিরোধী করে তুলেছে, অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদে সেও কিন্তু চেয়েছিল মৌমাছির মত আক্রমণ করতে। এখন তার বক্তব্য—

‘মাঠঘাট প্রান্তরে কাতারে কাতারে গড়াগড়ি যায় ছিন্নভিন্ন ধড় মুণ্ডু ও রাজা বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখলাম কি যুদ্ধে হারাবো বলে ! ওরে জঙ্গলের মায়ের বুক এমন করে খালি করে দিসনে বাবা—’ (যা নেই ভারতে, পৃষ্ঠা ৪৪)

নাটকের অন্তিমে আর ছদ্মবেশ নয় কুশীলবেরা নিজেরাই স্বমূর্তিতে কথা বলছেন।

‘শিল্পী ১ (কঞ্চুকী) ।। অতঃপর কুরুক্ষেত্র মহাসমর অন্ধ রাজার শতপুত্রের মৃত্যুবরণ। স্বজনহারা রাজ্যহারা, রাজারানি যুদ্ধোন্মাদ আখ্যা নিয়ে বনবাসে গেল।

শিল্পী ২ (গান্ধারী) ।। একদিন দাবানল ছড়ালো বনে।

শিল্পী ৩ (পাতকিনী)।। হাজার হাজার দামাল শিশুর মত আগুন গাছের মাথায় দোল খাচ্ছিল ...এক গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আরেক গাছের কোলে।

শিল্পী ১ ।। উন্মত্ততায় নয়, আত্মবিনাশেও নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ধৃতরাষ্ট্র সেই অগ্নি শিশুদের আলিঙ্গন করতেই দু’বাহু বাড়িয়ে ছুটেছিল।।’

লক্ষণীয় যে আলোচ্য নাটকে অম্বিকা বা অম্বালিকা যেমন অপমানিত মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে হস্তিনাপুরের রাজ বংশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে পারেননি ঠিক তেমনি ভাবেই গান্ধারীও নিজের গর্ভ নষ্ট করে প্রতিশোধ নিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে ভোলাবার জন্য দাসীর আশ্রয় নিলেন। ইরাকে নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিরাতে আলাদা শয়ন করতেন। লোক সাধারণ এই নাটক থেকে বুঝে নিতে পারবেন জীবনের ধারা ভিন্নখাতে বয় না, মানুষ এবং সময় অনুসারে সে কিছুটা পরিবর্তন করে মাত্র, মূল বিষয়টা একই থাকে। স্ত্রী-পুরুষের মিলন পছন্দের মানুষের সঙ্গে হতে হবে এই আদর্শ তাঁরা ছাড়েননি। বিবাহ সম্পর্ককে সর্বোত্তম আদর্শ বলে মানেননি, নিজেকে বদলাননি। জীবন যায় নীতি বা দর্শন বদলায় না। এখানে তাই প্রমাণ হল। এই সূত্রে আমরা হয়তো পঞ্চ সতীর সংজ্ঞার অর্থ কিছুটা বুঝতে পারলাম। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী এঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের বদলেছিলেন। বদলেছিলেন সভ্যতার প্রয়োজনে নাকি অন্যবিধ কারণে? কারণ যাই হোক এর জন্য চাই সাধনা—কারণ পরিণত বয়সে নিজেকে বদলানো

অসম্ভবের কাছাকাছি। এ নাটকে ভীষ্মও ভেবেছেন হয়তো তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হলেই ভালো করতেন। অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনে নিজেদের বদলাতে হয়। এই বার্তা নাট্যকার দিয়ে গেলেন।

শেষ কথা হিসেবে বলা যায় পৃথিবীতে যুদ্ধের থেকে ভয়াবহ আর কিছু নেই। কিন্তু এই ভয়াবহতা মানুষের লোভ বা লালসার কারণে হলেও হয়তো তার নিরসন সম্ভব। যদি পরস্পর বিরোধী নীতি বা দর্শনের কারণে হয় তাহলে এর শেষ কোথায়? বরিষ্ঠতম সদস্য কঞ্চুকী অনুভব করেছেন মহামতি ভীষ্ম বীরত্ব বলতে বোঝেন যুদ্ধ, রক্তপাত, ধ্বংসকাণ্ড আর ধৃতরাষ্ট্র বাঁচতে চান কপোতের অহঙ্কার নিয়ে। দুটি পরস্পর বিরোধী দর্শন। একজন যুদ্ধবাজ চলে গেলেও সে তার অনুগামী রেখে যাবে। তাহলে যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী কি সম্ভব? এই প্রশ্নই রেখে গেলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র আজকের পাঠকের কাছে। লোক সাধারণকে বুঝে নিতে হবে তাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত। পাতকিনী মায়ের মত শত পুত্রকে যুদ্ধ বা দাঙ্গায় ঠেলে দেবেন, আর পরে অনুশোচনা করবেন—সন্তান হারিয়ে? নাকি সংযত চৈতন্যে ভেবে দেখবেন। এই যে লোকশিক্ষাণ পাঠ দিলেন ত্রিকালদর্শী নাট্যকার, কালের নিরিখে—সাধারণ বাঙালি পাঠক বা দর্শক ক্ষণিকের জন্য হলেও আত্মদর্শনে রাখা করবেন তাঁর রাষ্ট্র চিন্তায়, ব্যক্তি চৈতন্যে।

পাদটিকা :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৭ চতুর্দশ মুদ্রণ মাঘ ১৪০০, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২. কঞ্চুকী চরিত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে ১৮৮২ সালে "রামের বনবাস" নাটকে প্রথম হাস্য রসাত্মক কঞ্চুকী চরিত্র সৃষ্টি করেন।

উৎস:

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, জন্মাষ্টমী ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ২৭৬

৩. রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ: অজিত কুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩,
৪. মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩ (পৃষ্ঠা ৩ থেকে ৪৪

প্রী ত ম চ ক্র ব র্তী

‘ভেলায় ভাসে সীতা’ : কালান্তরের বিনির্মাণ

১

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস-এ নাটকের ষড়ঙ্গ উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়েছে প্লট বা নাট্যবৃত্ত; চরিত্র না প্লট, কার অগ্রাধিকার বেশি- উত্তরকালে এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। তবে কালের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে মহাকাব্যের চেনা কাহিনি নাট্যাঙ্গিকে নবরূপ পেত। সেক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেত নির্মাণ-কৌশল। অবশ্য চরিত্র নির্মাণের মৌলিকতার দিকটিকেও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালে সেখানেও এই ছবি স্পষ্ট। যেমন কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’, ‘বিক্রমোর্বশী’— মহাকাব্য-পুরাণ-ইতিহাসের চেনা-কাহিনি ও চরিত্র নাট্যকারের সৃজন ক্ষমতায় স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল। ভবভূতির ‘উত্তর রামচরিতে’র ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। আবার যদি বাংলা নাটকের আধুনিক যুগের দিকে তাকাই, ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গ’ থেকে বাংলা নাটককে মুক্তি দিয়ে যখন মধুসূদন মৌলিক নাটক লিখলেন তখনও তিনি মহাকাব্য (মহাভারতের কাহিনি নিয়ে ‘শর্মিষ্ঠা’), পুরাণ (ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণের মিশ্রণে ‘পদ্মাবতী’) এবং ইতিহাসকে (টডের ‘Annals and Antiquities of Rajasthan’ অবলম্বনে ‘কৃষ্ণকুমারী) আশ্রয় করে আধুনিক বাংলা নাটকের উৎসমুখের অর্গল খুলে দিলেন। তবে উনিশ-শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা যখন রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবিত করেছিল, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ঝংকার যখন শোনা গেল নাট্য-সংলাপে, তখনই বাংলার রঙ্গমঞ্চের সামনে নেমে এসেছিল ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলে’র যবনিকা। এরপরই বাংলা নাট্যশালায় বয়ে গিয়েছিল ভক্তিরসের প্লাবন, যার কাণ্ডারী অবশ্যই গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর বহু ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ছিল ‘রাবণবধ’, ‘সীতার বনবাস’, ‘সীতার বিবাহ’, ‘লক্ষণ বর্জন’, ‘রামের বনবাস’ বা ‘সীতা হরণে’র মতো নাটক। বিশ শতকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাভারত আশ্রিত ‘ভীষ্ম’ ছাড়াও রামকথার আশ্রয়ে লিখেছেন ‘সীতা’ ও ‘পাষাণী’ (নামচরিত্র অহল্যা)। রঙ্গমঞ্চে এই ‘সীতা’র জনপ্রিয়তা ও তজ্জনিত রাজনীতির ফলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে লিখতে হয়েছিল আরেকখানি ‘সীতা’ নাটক। রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যা নিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন (রাম ও সীতার ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ী ও প্রভা দেবী ছাড়াও অভিনয়ে ছিলেন শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভটাচার্য প্রমুখ)। অর্থাৎ বাংলা-রঙ্গমঞ্চে সীতার আবির্ভাব অনেক আগেই। সংস্কৃত সাহিত্যের ‘উত্তর রামচরিত’ থেকে একেবারে এই সময় মলয় রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় রোকেয়া অভিনীত ‘সীতায়ন’ (পূর্বরঙ্গ নাট্যদলের প্রযোজনা) বহু চর্চিত। এরই মাঝে মনোজ মিত্রের ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

'মৃত্যুর চোখে জল' নিয়ে বাংলা নাট্যজগতে আবির্ভাব মনোজ মিত্রের, লিখেছেন 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', 'নরক গুলজার', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'দর্পণে শরৎশশী' বা 'গল্প হেকিমসাহেব'-এর মত কালজয়ী নাটক। তাঁর নির্দেশনায় সুন্দরমের প্রযোজনা পেয়েছে সাফল্য। চলচ্চিত্র-দূরদর্শনে অভিনয় করেও সম্ভবত নাট্যরচনায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। সেখানে ঘটিয়েছেন মহাকাব্যের বিভিন্ন-কাহিনির বিনির্মাণ, লিখেছেন মহাভারতের কাহিনি-আশ্রিত 'যা নেই ভারতে', 'তক্ষক' বা 'অশ্বত্থামা'র মত নাটক। এ কথা ঠিকই রামায়ণের তুলনায় মহাভারত-আশ্রিত নাটকের সংখ্যা বেশি, তা ভারত-কাহিনির শাখা-প্রশাখের ব্যাপ্তিগুণে। তবু মনে রাখতে হবে শুধু রঙ্গমঞ্চে 'সীতা' নয় বুদ্ধদেব বসুর কলমে রামায়ণ-আশ্রিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র মতো আমরা পেয়েছি। মনোজ মিত্র অবশ্য নাটকের কেন্দ্রে এনেছেন সীতাকে। রাজবধূ বা বনবাসিনী কিংবা অশোবনে বন্দিনী অথবা পরিত্যক্তা সীতা কোনদিনই স্থির মাটি পায়নি, তবু সে ভূমিসুতা। তাঁর জন্মের কেন্দ্রেও আছে পুরুষতন্ত্রের বীজ। অদ্ভুতভাবে দুই মহাকাব্যে নায়িকাদের জন্ম আলো-আঁধারিতে ঢাকা, কেউ যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা যাজ্ঞসেনি, কেউ লাঙলের ফলা থেকে উঠে আসে ভূমিজাতা। পূর্বপুরুষের ধারাটিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে ছিন্ন করে দেওয়া হলো পূর্বনারীর সূত্র। তবে রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনি নিয়ে একালের গল্প-উপন্যাস-নাটক কবিতা রচনা হলেও তার উৎস শুধুমাত্র সংস্কৃত রচনা নয়। কালে-কালান্তরে বিভিন্ন ভাষা ও মৌখিক প্রচারে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি ছড়িয়ে আছে। সেসবের প্রভাবও একালের সাহিত্যে পড়েছে পুরোদস্তুর। অর্থাৎ রামায়ণের সীতা শুধু বাল্মীকিসৃষ্ট নয়; সবচেয়ে বড় কথা 'এপিক' তো কোন একক কবির রচনাও নয়। কোন বিশেষ যুগের সৃষ্টিও নয়। যুগ থেকে যুগান্তরে তার নির্মাণ, বহু কবির সংযোজন-বিয়োজন-প্রক্ষেপণের ফসল সেটি। ভারতে তুলসীদাস থেকে কম্বন এবং বাংলার ভক্তিবাদের যুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদি মহাকাব্যের কাহিনিতে বেশ বড় প্রভাব ফেলেছে। আর যেহেতু মনোজ মিত্রের নাটকটির নামকরণেই সীতার উল্লেখ আছে, তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য চন্দ্রাবতী রামায়ণ। যে কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর লিখেছেন—

> 'ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্যের সুপরিচিত আখ্যানকে দেখতে চেয়েছেন অন্যরকম দৃষ্টিকোণে যা আজকে তাত্ত্বিক পরিভাষায় নারীবাদী বলে চিহ্নিত হতে পারে। বিষ্ণুর অবতার রাম নন, বরং লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সীতাই তাঁর ভাবনার ভরকেন্দ্র। এই জন্মদুখিনী নারীকে কেন্দ্রভূমিতে রেখে তাঁর এই বিনির্মিত সৃষ্টি সত্যসত্যই হয়ে উঠেছে অভিনব, প্রাতিস্বিক- যা 'রামায়ণ' নামের প্রতিস্পর্ধী হয়ে 'সীতায়ন' অভিধা লাভের যোগ্য এবং একই সঙ্গে নারী-মহাকাব্য হয়ে ওঠার দৌড়ে এ রচনা অনেকটা এগিয়ে। আজকের নারীবাদের সাহিত্যোপভোগের নান্দীপাঠ ঘটাতে পারে এই

লৌকিক, মৌখিক, প্রায়-অপরিচিত একটি শীর্ণ অবয়বের রচনার মধ্য দিয়ে।'[১]
মনোজ মিত্র নাটকটিকেও সেই ধারা থেকে বিচ্যুত করা যায় না।

২

মনোজ মিত্রের 'ভেলায় ভাসে সীতা'-র প্রকাশ ২০০৮ সালের দৈনিক স্টেটসম্যানে'র শারদীয়া সংখ্যায়। কিন্তু তার এক যুগ আগে (১৯৯৬) প্রকাশ পেয়েছিল নবনীতা দেবসেনের 'সীতা থেকে শুরু' বা মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন'। আর সীতা নিয়ে নবনীতা দেবসেনের গভীর গবেষণা ছড়িয়ে আছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে, এমনকি উপন্যাসেও ('বামাবোধিনী')। শুধু চন্দ্রাবতী রামায়ণ নয়, সারা ভারত জুড়ে মেয়েদের মুখে মুখে ফেরা রামায়ণের আড়ালে যে সীতার কথা আছে তার বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় নবনীতা দিয়েছেন। মেয়েদের মৌখিক রামায়ণের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> 'পুরুষ যখন সীতার মিথ গড়ে তুলেছে মেয়েদের মুখ বন্ধ করার জন্য, উলটোদিকে তখন গ্রামের মেয়েরা নিজেদের মুক্তির উচ্চারণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই সীতা-কাহিনিকেই। সীতা-মিথ মেয়েদের হাতে তুলে দিয়েছে এক আবরণ- একধরনের মুখোশ, যার আড়ালে তাঁরা নিজেদের ব্যক্ত করবেন, বলবেন তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা, নিজেদের মতো করে ভাষ্য রচনা করবেন পুরুষতান্ত্রিকতার।... মেয়েদের এই গল্পে রামের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মিথ খণ্ডিত হয়েছে স্বয়ংসিদ্ধভাবে, সম্ভবত অজান্তেই। রাম এখানে একজন রূঢ়, প্রেমহীন, দুর্বল স্বামী। আদর্শ পুরুষের বহু দূরে তাঁর অবস্থান। মেয়েরা তাঁকে ডাকেন পাষণ্ড বা পাপিষ্ঠ বলে "রাম তোমার বুদ্ধি হইল নাশ" বলে সরাসরি আক্রমণ করেন তাঁকে। এটা সম্ভব, কারণ মেয়েদের এই রামায়ণগাথা কোনও ধর্মশাস্ত্র বা অনুশাসনবৃত্তের বাইরে। তাঁদের সীতা-মিথ নিতান্তই প্রান্তিক, যেখানে সীতা ধরা দেন এক সাধারণ মেয়ে হিসেবে। মেয়েদের লোকসংস্কৃতিতে স্থান, সময়, ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে একই দুঃখের বিনিসুতোয় গাঁথা হয়ে যান সব মেয়ে।'[২]

মনোজ মিত্র যেহেতু লিখেছেন নাটক তাই সীতা সাধারণ বা অসাধারণ যাই হোন না কেন তাঁর নিত্যযাপনের ছবি সেখানে তুলে ধরা হয় না। বরং নাট্যময়তার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন এক ব্যক্তিত্বময়ীকে। যিনি স্বামীর অনুগামিনী মাত্র নন। মনোজ মিত্র তথাকথিত নারীবাদী না হয়েও কথা বলতে গিয়ে আধুনিক নারীবাদকে অস্বীকার করতে পারেননি। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণে' মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—

> '... নারীবাদ মানেই ডিভোর্স নয়, নারীবাদ মানে দশটা ছেলের সঙ্গে শোয়া নয়, নারীবাদ মানে লেসবিয়ানিজমও নয়, নারীবাদ মানে কখনই সন্তানের অবহেলা নয়, সমাজ ছারখার করা অনাসৃষ্টি নয়। কিন্তু নারীবাদ মানে প্রশ্ন তোলা, অবিরাম, অনিঃশেষ প্রশ্ন।'[৩]

মনোজ মিত্রের সীতা সেভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের নির্মম আচরণে নারী হিসেবে দেবরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, রামকে উদ্দেশে বলেছিলেন- 'এইরকম দয়ামায়াশূন্য বর্বরকে সঙ্গে নিয়ে কেন তুমি ঘুরবে রাম? দূর করে দাও ওকে! যেন ওকে ছাড়া তোমার চলে না?' না, প্রেমহীনা প্রতিবাদিনী নন সীতা; স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, প্রিয় পুরুষকে একান্তে পাবার ইচ্ছাও ধরা আছে তাঁর সংলাপে—'সারাদিন শাশুড়ির পায়ে পায়ে ঘুরতে হতো রাজবাড়ির বধূটিকে! কত রাতে তোমাকে পেতাম, ভালো করে দেখতেও পেতাম না এই মুখখানা! প্রদীপের তেল তখন ফুরিয়ে এসেছে।' নবনীতা মেয়েদের রামায়ণের সীতা সম্পর্কে বলেছিলেন—'মেয়েদের সীতা কোনও বিপ্লবী নন। তিনি নির্যাতিত, দুঃখিনী স্ত্রী। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণার কথা তিনি বলেন।'[৪] নাটকের সীতাও 'বিপ্লবী' নন, তবে নিজের কথা ছাড়াও তিনি ভেবেছেন শূর্পণখার কথা। দেবর কর্তৃক 'শূর্পণখার রক্তপাত' বা স্বামীর মনে 'শূর্পণখার রাজ্যজয়ের অভিসন্ধি', কোনটিই তো সীতার কাম্য নয়। পিতৃসত্য পালনের আড়ালে যে রামের 'সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হবার বাসনা' এবং 'দূর স্বর্ণলঙ্কা অবধি' তাঁর 'একচ্ছত্র আধিপত্যে'র প্রচেষ্টা- এসব সীতাকে ব্যথিতই করেছিল। আবারও স্মরণে আসবে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার (অস্ত্রপুরুষ) পংক্তি -

> সীতা জানতেন রাম কত নিরাপরাধের মৃত্যুর কারণ
> ক্ষত্রিয়ের কাছাকাছি তির ও ধনুক
> ক্ষমতার কাছাকাছি বোমারু বিজ্ঞানী
> এবং অগ্নির কাছে ইন্ধন এলেই হিংসা- সীতা জানতেন
> সীতার আরেক নাম নিরস্ত্রীকরণ
> শ্রীরামের বাহু ধরে বারবার আর্তস্বরে সীতা বলেছেন
> অস্ত্র ফিরিয়ে নাও হে রাজপুরুষ।[৫]

কিন্তু শরভঙ্গের মতো ঋষি তো একটি বিষয় জানেন যে যত 'বেশি জানে, তত কম মানে'; পিতৃতন্ত্র-পুরুষতন্ত্রের স্বর শোনা গেছে শরভঙ্গের প্রতিটি সংলাপে। রামের সহিংস রাজ্যবিস্তারে সীতা বাধা হতে পারেন ভেবেই তিনি যজ্ঞের দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন মায়াসীতা। সেই পুতুল-সীতার আচরণ প্রতিবাদিনী সীতার সম্পূর্ণ বিপরীত, 'অনুগত দাসী' হয়ে স্বামীর পদরেখা অনুসরণ করতে চায় মাত্র—'তাঁর পদসেবা করব। (রামের পায়ের কাছে বসে) পথশ্রমে ক্লান্ত চরণদুটি ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দেব, তাঁকে হাওয়া করব, তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে হাঁড়ির মুড়োয় যেটুকু পড়ে থাকবে তাই খাবো, তারপরও তিনি যা চাইবেন সব দেবো সর্বস্ব নিবেদন করে তাঁকে তুষ্ট করবো।' রামের 'রাজ্যলিপ্সা' সম্পর্কেও তার অভিমতেও নেই কোন নিজস্বতা- 'প্রাণনাথ তুমি লঙ্কা বিজয় করে ফিরে এসো আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমার ললাটে জয়তিলক এঁকে দেব। ওগো পরাক্রমী স্বামী, তুচ্ছ এ নারীর জীবন যৌবন তুমি গৌরবে ভ'রে তোল।' সীতার এমন প্রতিচ্ছবি দেখে 'অভিভূত' হয়েছিলেন রাম,

পঞ্চবটীর সাধকদের কাঙ্ক্ষিত সীতার 'রোবট' মূর্তি রামের কাছে 'অপূর্ব'। আর রাম-লক্ষ্মণ-শরভঙ্গের কাছে যে অপছন্দের সীতা, তিনি নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে, যিনি অনাত্মীয়া অন্যবর্ণাকে 'সখি' সম্বোধন করতে পারেন; ক্ষমতালিপ্সু স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে সদর্পে বলেন—'রক্তমাখা ভূমি নেয় না ভূমিসূতা! আর রক্তমাখা হাত থেকেও নেবে না কোনদিন! জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে কক্ষনো সে রাক্ষসের নিগ্রহের কারণ হবে না।' উদ্ধত দুর্বিনীত কৌশলী দেবরকে যেমন পাথর ছুড়েছে, তেমনই বিদ্ধ করেছে যথোচিত বাক্যবানে—'দাদা পিতৃসত্য পালনে বনে চলেছে, ভাইও পিছু ধরেছে! তলে তলে জানতো চোদ্দবছরে রাজত্বের সীমানা বাড়াবে! সেদিন কেউ একে ঠেকাতে পারেনি! উর্মিলাও না! উর্মিলা পা-দুটো জড়িয়ে ধরল- উর্মিলা মূর্ছা গেল- এই পাষণ্ড ফিরেও তাকাল না! আনুগত্য দাসত্ব পদসেবা—গণ্ডমূর্খের মহৎগুণ।'

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন'-এ 'নারীর ভূষণ' সম্পর্কে রাম প্রশ্ন তুললে সীতা 'ক্রোধ উদ্গিরণ' করেছিলেন এভাবে—

> 'আর রাজার ভূষণ যে প্রজানুরঞ্জন, যার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন দশরথপুত্র, সেই কর্তব্যবোধ কোথায় ছিল যখন এক নিরীহ শূদ্রকে শুধুমাত্র তপশ্চর্যার জন্য ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় হত্যা করেছিলেন? শূদ্র কি প্রজা নয়? নারী কি প্রজা নয়? বাঃ ধিক এই রাজ আদর্শে, ধিক রামরাজ্যে।'[৬]

যদিও উপন্যাসে এই কথাগুলি বলেছিলেন উত্তরখণ্ডের সীতা, শম্বুক-হত্যা ছাড়াও সীতা নিজের অনেক অপমান দেখেছিলেন, লঙ্কাজয়ের পর সীতাকে উদ্ধার করে তা সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ, পতি হিসেবে অন্য কাউকে গ্রহণের প্রস্তাব, গর্ভিনী-স্ত্রীকে কৌশলে নির্বাসন। আবার অশ্বমেধ-যজ্ঞের জন্য সীতা-বর্তমানে স্বর্ণসীতার নির্মাণ। আলোচ্য নাটকে সীতা-জীবনের এতখানি ব্যাপ্তি দেখানো হয়নি; কিন্তু রাজ্য বিস্তারে তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন অরণ্যকাণ্ডেই। শরভঙ্গ মায়াসীতা তৈরি করলেও অপহৃতা হয়েছিলেন প্রকৃত জানকী। এখানে হয়তো রামচন্দ্রও কিছুটা কৌশলের শিকার। এ কূটকর্মে শরভঙ্গের যুক্তি 'অশোকানন থেকে মায়া সীতা উদ্ধারে যে রামকে আমরা পেতাম এবার আসল সীতা উদ্ধারে নিশ্চয় তার থেকে অধিক দৃঢ় বিধ্বংসী রামচন্দ্রকেই পাবো।' যদিও প্রকৃত সীতাহরণের কথা শুনে রামচন্দ্র 'হা সীতা- আমার সীতা' বলে হাহাকার করেছেন তথাপি স্বামী প্রেমের গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়! কারণ ভোরের আলো আঁধারিতে অপহৃতা-সীতা ফিরে এলেও তাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র। সীতা বোঝেননি 'অধম লঙ্কেশ্বর'-এর চেয়ে তাঁর স্বামীকে আরও নীচে নামিয়েছে অহং। রামের সংলাপ- 'সব ভুলে হাত ধরে তোমাকে ঘরে তুলে নেব! এতে করে গৌরব বাড়বে সীতা, তোমার না আমার? জগৎ জানে রাবণ বলপ্রয়োগে আমার স্ত্রী হরণ করেছে! আমাকেও তাই বলপ্রয়োগেই তোমাকে উদ্ধার করতে হবে! আমার পৌরুষ তাই বলে সীতা।' এই একই ঘটনা আমরা দেখেছি নবনীতা দেবসেনের 'মূল রামায়ণ' রচনাটিতে; সেখানে খুব সহজে বীর হনুমান একাই লঙ্কা থেকে জানকী উদ্ধার করেছিলেন।

সে ঘটনায় দাশরথির আপাত আনন্দ দেখে তাঁকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন বাল্মীকি—

> 'মনুষ্য অবতার হয়ে জন্মেছেন বলেই কি মানুষী সংস্কার আপনার দৈব চরিত্রে এতই গভীরে প্রবেশ করেছে, যে আপনি বিস্মৃতই হয়েছেন আপনার মনুষ্যজন্ম নেবার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? রাবণের দ্বারা সীতা-হরণ করানোরই বা উদ্দেশ্যটা কী ছিল? কেঁদে কেটে একশা হয়ে শেষকালে কিনা একটা বাঁদরকে দিয়ে সীতা উদ্ধার করিয়ে এনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমকূজন শুরু করেছেন? বলি এবারে রামায়ণের যুদ্ধটা তবে হবে কেমন করে? শুনি! সেই কৃত যুগ, ত্রেতা যুগ দুই যুগ ধরে যে-মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে, যার জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দশ মাথা (চার প্লাস এক প্লাস পাঁচ) এক করে প্ল্যান করতে হয়েছে, সেই যুদ্ধটারই তো মূলে হাভাত করে ছেড়ে দিয়েছে এই ব্যাটা অতিপক্ক, ওভারস্মার্ট বাঁদর।'[৭]

নাটকের সীতাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র, যুদ্ধ ব্যতীত সীতা-গ্রহণ তাঁর কাছে 'অযশস্কর'। সীতা ভেলায় ভেসে আবার লঙ্কাপুরীর দিকে যাত্রা করেছে। মনোজ মিত্র সেখানে নাটকে সমাপ্তি টেনেছেন। তবে নবনীতা 'মূল রামায়ণ' সমাপ্ত করেছেন প্রতিশোধ পরায়ণ বাল্মীকির সংলাপে—

> 'বড্ড তেজী মেয়েমানুষ। না? আচ্ছা আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেব স্বামীর কোলে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে! হবে! তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো! একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেব! কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে।'[৮]

মনোজ মিত্রের নাটকে নিষ্ঠুর বাল্মীকি না থাকলেও আছেন কৌশলী শরভঙ্গ, যাঁর নির্মমতায় দেখে শিষ্য উতথ্যও তাঁকে ত্যাগ করে গেছে। আর সংস্কৃত রামায়ণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সীতা পরিত্যাগ' সম্পর্কে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী লেখেন—

> 'এখানে স্বয়ং কবি-স্রষ্টার নাম সীতার সহানুভবতায় একত্র হয়ে ওঠার পরেই রামচন্দ্রের মহানুভবতা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। তিনি আস্তে আস্তে কবির কাছে প্রত্যাখ্যাত হতে থাকেন। রামচন্দ্রের দিক থেকে আদর্শ রাজা হওয়ার প্রক্রিয়াটা মহাকবি এমনভাবেই বর্ণনা করেছেন, যেখানে আদর্শটাই একটা ফাঁকি হিসেবে তীব্র হয়ে ওঠে। বিশেষত স্বয়ং কবিই যেখানে সীতার পক্ষে পাশে এসে দাঁড়ান, তাঁর পুত্র হলে রাজা রামচন্দ্রের কাছে খবর পর্যন্ত পাঠান না এবং পরিশেষে সীতাই যখন রামচন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করেন, সেই মুহূর্তগুলিতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটা রামায়ণের পরিবর্তে অনেক বেশি সীতায়নে পরিণত হয় এবং এই সীতায়নের পরম্পরা প্রাদেশিক রামায়ণগুলির আদর্শবাদ অতিক্রম করে ঊনবিংশ, বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর সীতায়নী প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করেছে একান্ত বিপ্রতীপভাবে।'[৯]

অর্থাৎ শুধু একালের গল্প-উপন্যাস-নাটক নয়, মূল রামায়ণও উপসংহারে এসে 'সীতাকথা'তেই পরিণত হয়েছিল।

৩

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে বীজ রোপন করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দীর পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এ দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্ম ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক-ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়ে দিল।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাম ও রামরাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাই রাম তাঁর কাছে 'চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু', এবং 'আর্য অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু' নির্মাতা। কিন্তু রামায়ণ কাহিনি বিবিধ বৈচিত্র্যে এইসব উদ্দেশ্য সাধনের পথে রামচন্দ্রের গৃহীত উদ্যোগ ও বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কালে কালান্তরে। কালের বিবর্তনে যেমন মহাকাব্যে শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি ঘটেছে, সংযোজনের সঙ্গে ঘটেছে বিয়োজনও। একই সঙ্গে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ঘটেছে বদল; এবং সেটাই স্বাভাবিক। যে বিষয়টি এককালে সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, আজ সেই অংশ নিয়ে কূটপ্রশ্ন উঠে আসে, অবকাশ থাকে বিতর্কের। 'রামরাজ্যে'র নৈতিকতা নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলেন একালের কবি—

"ভারতের গ্রামে গ্রামে আজও হনুমান
করজোড়ে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করেন
উঁচুজাতিদের চাপের শূদ্রহত্যা করেন যে রাজা
এবারের নির্বাচনে তাকে ভোট দিন
চোদ্দটা বছর যিনি স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব না নিয়ে
কাটালেন, নির্বাচনে তাকে দিন দেশের দায়িত্ব।"[১১]

আর মনোজ মিত্রের নাটক শুধু সীতার কথা বলে না বলে, অনার্য সভ্যতার উপর আর্য সভ্যতার অধিগ্রহণের গল্পও শোনায়। অনার্য-নারীর উপর আর্যপুরুষের 'আভিজাত্যের দম্ভ' ফুটে ওঠে শূর্পনখার 'রক্তমাখা মুখে'। 'পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমণীর শ্লীলতাহানিতে'- শূর্পণখা থেকে সীতা, প্রত্যেকেই এর শিকার। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' সূর্পণখা প্রেমিকা, নবনীতার 'রাজকুমারী কামবল্লী' প্রণয়প্রার্থিনী, তবু তার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের তিরস্কার ছিল তীক্ষ্ণ—

'স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর! ওটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষজনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলব না, বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। নারীর আবার ওসব কী? তোর দিব্যি গতর আছে, যা গিয়ে আমসত্ত্ব দে, বড়ি দে, আচার পাঁপড় তৈরি কর, কামজ্বর সেরে যাবে। আর যুদ্ধকৌশল জানিস তবে যা না বালিকাবিদ্যালয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দে, যোগব্যায়াম শিক্ষা দে, আত্মরক্ষার কৌশলাবলি শিক্ষা দে-জীবনটাকে কাজে লাগা। প্রণয় করতে এসেছেন। ইস! আহ্লাদ কত!'[১২]

মনোজ মিত্রের নাটকে শূর্পণখা পঞ্চবটীর রানি, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই প্রশাসনিক প্রধান আর স্বর্ণলঙ্কার 'পিসিরানি'। নিজের রাজ্যের প্রতি আছে আন্তরিক কর্তব্যবোধ। বৈমাত্রেয় ভাই খর ও সেনাপতি দূষণের মৃত্যুতে শুধু বিরক্তই নয় রামচন্দ্রের চোদ্দ-বছর বনবাসের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সে সচেতন- 'পিতৃসত্যপালন। তা পিতৃসত্যপালনে যিনি একবস্ত্রে বনবাসে আসছেন, তাঁর পিছু পিছু অযোধ্যার মালবাহকেরা কেন রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্রের পেটিকা বয়ে এনেছিল বলতে পারো? সারিবাঁধা শকটে অস্ত্র ঢাকা দেওয়া ছিল কেন সীতা?' সীতার কাছেই তার জিজ্ঞাসা- 'সর্বস্ব ত্যাগ করেও কেন এই জগতের বিস্ময়টিকে অযোধ্যার অস্ত্রশালাটি টেনে আনতে হলো বনবাসে, সেটাই বড় বিস্ময়ের, তাই না? (কঠিন গলায়) তোমার স্বামীর মূল উদ্দেশ্য শূর্পণখার পঞ্চবটী রাজ্যটি হস্তগত করা।' উত্তর থেকে দক্ষিণে আর্যসভ্যতার বিস্তার নিয়ে তার অভিযোগ এবং প্রতিবাদ- 'রাজ্যে যদি আমার শান্তি না থাকবে এতকাল তপোধনদের তপস্যা সেখানে চলল কী করে? এতই যদি অত্যাচার, কী করে এখান থেকে তাঁদের মোক্ষলাভ, স্বর্গলাভ সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে?... তোমার স্বামীকে (রামকে) দুর্বুদ্ধি যোগাচ্ছেন পঞ্চবটীর ওই তথাকথিত শান্তিপ্রিয় সাধকদল!' নিজের অপমানের প্রতিবিধানে ও পঞ্চবটী রক্ষার্থে শূর্পণখা সহায়তা চেয়েছে দাদা রাবণের (কারণ ভোজন-নিদ্রা সর্বস্ব কুম্ভকর্ণ এবং 'স্বার্থপর কুচক্রী বিভীষণ' কাউকেই সে ভরসা করেনি)। যদিও দাদার থেকে বিশেষ আশ্বাস পায়নি, তবে তাকে সচেতন করে দিয়েছে—'এখনো যদি পঞ্চবটী রক্ষা না কর দাদা, জানবে তোমার স্বর্ণলঙ্কাও রেহাই পাবে না। ওই চতুর চূড়ামণি রামচন্দ্র এই কুবেরের ঐশ্বর্য না হাতিয়ে বনবাস থেকে ফিরবে ভেবো না।' বালির মৃত্যুর সংবাদ এনেছে শূর্পণখাই, আর মায়াসীতার বিষয়টিও তার অজানা নয়। সর্বোপরি জানকীর প্রতি তার ভালোবাসা অকৃত্রিম। 'লঙ্কাদহনের আগুন আভা'র সামনে দাঁড়িয়েছে দুই সখী, নাটকে লঙ্কা থেকে রামের কাছে সীতার প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় শূর্পণখার ইতিবাচক ভূমিকা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

নাটকের রাবণ 'চিরকালের শিশু'; মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের ট্র্যাজিক হিরো বা আনন্দ নীলকণ্ঠনের প্রতিবাদী প্রতিস্পর্ধী নায়ক তিনি নন, বরং জীবন-বিমুখ উদাসীন তিনি। রাজোচিত ব্যক্তিত্বের বড় অভাব তার মধ্যে। ইহলোকের বদলে পরলোক নিয়ে চিন্তিত

বেশি- 'যে রাজা আজ বাদে কাল স্বর্গের সিংহাসনে আরোহন করবে সামান্য একটা পঞ্চবটী বাঁচাতে সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ছি ছি! স্বর্গে সিঁড়িখানার গাঁথুনি স্থগিত রেখে এসব কি করে বেড়াচ্ছি।' যদিও সগর্বে বলেছে 'কুবেরের ঐশ্বর্য' তার করতলে আর ব্রহ্মতেজে সে পৃথিবীতে 'অপরাজেয়' এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ ইন্দ্রের সিংহাসন। কাম-ক্রোধ-কামিনীকাঞ্চন জয় করে জিতেন্দ্রিয় হতে চায় সে। তবু তার আচরণে গাম্ভীর্যের বড় অভাব। যে কারণে মন্দোদরীয় কটাক্ষ- 'জ্ঞান তো আছে ষোলআনা! কর্মে তার প্রতিফলন নেই!' যদিও সীতার বরমাল্য পেলে 'পূর্বের কর্মসূচি'- 'স্বর্গবিজয় এবং অনার্যের শির উচ্চে তোলা'- সেই সাধনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাবণ। অন্যদিকে হনুমান লঙ্কায় বিধ্বংসী আগুন লাগালেও রাবণের তাপ-উত্তাপ দেখা যায়নি; লঙ্কেশ্বর 'ধেনো মদ' গিলে 'দরজা বন্ধ করে গড়াগড়ি' খাচ্ছে, তাই বোধহয় সীতার কাছে বরণমালার বদলে 'লাথি' দেখতে হয়েছে।

নাটকের রাবণ ও মন্দোদরী মূলত 'কমিক রিলিফ' সৃষ্টি করেছে; সঙ্গে আছে চেড়ির দল। সীতা বা শূর্পণখার মত সিরিয়াস চরিত্র মন্দোদরী নয়। বিভিন্ন রামায়ণে সীতার জন্ম-রহস্যের বর্ণনায় কখনো রাবণ, কখনো বেদবতীর নাম এসেছে, এখানে সেটি প্রকাশ পেয়েছে মন্দোদরীকে কেন্দ্র করে- 'এ কে! এদিক দিয়ে দেখলে যেন আমার সন্তানটির মুখটা বসানো! কুমারীকালের গর্ভ! আমার লজ্জা জড়ানো প্রথম ফসল! জ্যোতিষী বলেছিলেন বংশ ধ্বংস করবে! ভয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম! কে জানে সাত ঘাট ঘুরে সে আবার শোধ নিতে ফিরে এল কিনা!' স্বামীকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতার অন্ত নেই তার। শূর্পণখার প্রতি আচরণে ভানের প্রকাশ আছে—'তুই লঙ্কাপুরীতে আমাদের কাছে এসে থাক! তুই আমার কত আদরের ননদিনী।' ননদের কপালের কাটা দাগের উপশমের প্রসঙ্গও তুলেছে। পরক্ষণেই তার মুখে শোনা গেছে- 'জানতাম ননদিনী কালনাগিনী যখন ঢুকেছে, দাদাটাকে ছোবল না মেরে ছাড়বে না।' রাবণের সঙ্গে তার বিবাহ যে জোরপূর্বক, দাম্পত্য আলাপে তাও প্রকাশ করেছে মন্দোদরী।

* * *

এই কাহিনি তুলে ধরেছে সীতা ও মায়াসীতার মাঝে ভেসে বেড়ানো মেয়েদের অবস্থানগত সংকটটিকেস এবং আর্য সভ্যতার আগ্রাসন, যা আধুনিক-কালের প্রেক্ষিতে 'millitant nationalism' তুল্য। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কথাও বলা যায়। অথবা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভাগবতের কাহিনি আশ্রয়ে লেখা মন্মথ রায়ের 'কারাগার', ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল সেই নাটকের অভিনয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের দুটি মহাকাব্যের কেন্দ্রে আছে নারী অবমাননার ঘটনা, অথচ দুজনেই রাজবধূ এবং রাজকন্যা। তবু তাঁরা নির্যাতিতা, নির্বাসিতা। মনোজ মিত্র 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত দুটি ঘটনা, মূলত লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার

অপমান ও রাবণের সীতা-হরণ, এ বিষয়গুলিকেই গ্রহণ করেছিলেন। নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত অবয়বে নাট্যকার মিথের আড়ালে সমকালীন মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আসলে আধিপত্যবাদ বা নারী নির্যাতন কিংবা ক্ষমতার আস্ফালন অথবা কার্যোদ্ধারের জন্য অন্যায় কূটকৌশল প্রয়োগ-এই দেশকাল অতিক্রমী বিষয়গুলি আজও বহমান। আর রামায়ণের মতো জনপ্রিয় কাহিনির অতি পরিচিত চরিত্রদের উপস্থাপনে সেই নাট্য-সমস্যার আবেদন হয়েছে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সর্বজনীন।

সূত্র-সংকেত :

১. সনৎকুমার নস্কর, 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১৩৫

২. নবনীতা দেবসেন, 'রামায়ণ : কথক যখন মেয়েরা' (প্রবন্ধ), 'মাসিক কবিতাপত্র', ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৫

৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

৪. নবনীতা দেবসেন, 'রামায়ণ : কথক যখন মেয়েরা' (প্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৫. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১৯৫

৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'সীতায়ন', আনন্দ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১৪৭

৭. নবনীতা দেবসেন, 'সীতা থেকে শুরু', আনন্দ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ২০

৮. তদেব, পৃ. ২১

৯. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'রামায়ণী', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭৭৬

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (সপ্তদশ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৫৮২

১১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র' প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১২. নবনীতা দেবসেন, 'সীতা থেকে শুরু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

————

অ র্জু ন বি শ্বা স
মনোজ মিত্রের পৌরাণিক নাটকে আধুনিক জীবনের বিনির্মাণ

বাংলা সাহিত্য আলোচনা-সমালোচনায় বিনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের বিষয়টি অতিআধুনিক। আধুনিক সাহিত্যিক বা লেখকেরা প্রাক-আধুনিক কিংবা পৌরাণিক কাহিনী- চরিত্র-বিষয়বস্তু সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক-ভাব, ভাষা, রচনাশৈলী, কাহিনি, চরিত্র, বয়ান, ভাব-আদর্শ, ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে বিনির্মাণের বয়ান নির্মাণ করে চলেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে নাট্য কাঠামো নির্মাণেও এই সূত্র তার ব্যতিক্রম নয়। আরো অনুসরণ করেছেন বা সাহায্য নিয়েছেন পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতের বিনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ তত্ত্ব- তথ্য ও সাহিত্য আন্দোলন প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে মিশেল ফুঁকো ও তাঁর ছাত্র জ্যাঁক দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্ব এবং রলা বার্তের 'ডেথ অফ অথর'- এর ধারণা। ফলে সাহিত্যে শুরু হয় ভাঙ্গা গড়ার পালা। পাঠক বিষয়টি পাঠ করে মূল ভাবনা থেকে সরে এসে আরেকটি ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করেন, নিরন্তর বদলে যেতে থাকে লেখকের সৃষ্টির ভাবনার সূত্র। জন্ম দেয় পাঠক/লেখক নিজস্ব নির্মাণ ভাবনার নতুন অবয়ব। এর ফলে একটি নির্মাণ হয়ে ওঠে নবনির্মাণ বা বিনির্মাণ। যদিও এই ভাবনা-চিন্তার কথা মাথায় রেখে সৃষ্টি না করলেও মনোজ মিত্রের বহু পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আধুনিক জীবন ভাবনায় চালচিত্রের বিনির্মাণ চলে এসেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিচিত্র ধরনের নাটক লিখে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪)। মনোজ মিত্র একধারে নাট্যকার ও অভিনেতা। চলচ্চিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্র নাট্য পরিচালক ও নাট্য অভিনেতাও বটে। আধুনিক সাহিত্য ধারার দিকদর্শন, নবনাট্য আন্দোলনের যুগপুরুষ মনোজ মিত্র ছিলেন দর্শনের ছাত্র। তাঁর নাটকের মধ্যে জীবনদর্শন ছাড়াও যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। কিছু কিছু উপন্যাস-গল্প-কবিতা লিখলেও তাঁর অত্যন্ত সফলতা আসে অভিনয় ও নাটক লিখে। এই শক্তিমান নাট্য শিল্পী বহু শ্রেণীর নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পৌরাণিক ঘটনা-চরিত্র ও কাহিনীর উপর নির্ভর করে লেখা নাটক হল—১.'তক্ষক' (১৯৬৭), ২.'অশ্বত্থামা'(১৯৭২-৭৩), ৩.'শিবের অসাধ্যি'(১৯৭৪), ৪. 'নরক গুলজার'(১৯৭৪), ৫. মদন সিরিজের 'আমি মদন বলছি'(১৯৭৪) ও 'মদনের পঞ্চকান্ড'(১৯৭৪), ৬.'চোখে আঙুলদাদা'(১৯৭৬), ৭.'শোভাযাত্রা'(১৯৯০),৮.'পুঁটি রামায়ণ'(১৯৮৯-৯০), ৯.'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), ১০.'জয় বাবা হনুনাথ'(২০০৪), ১১.'যা নেই ভারতে'(২০০৫), ১২. 'ভেলায় ভাসে সীতা'(২০০৭),১৩. 'হনুমতী পালা' বা 'মন্দোদরী হরণ'(২০০৯) ও ১৪. 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি'(২০১০) ইত্যাদি।

নাটকগুলির চরিত্র, কাহিনি ও শৈলী পুরাণ থেকে সংগ্রহ করলেও নাট্যকার লেখনিতে

প্রচুর স্বাধীনতা এনেছেন। আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবাদ তাঁকে পুরাণের পথ থেকে কলকাতার শিক্ষিত মানুষের মুখোশধারী রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই সকল নাটকগুলির মধ্যে তিনি কিভাবে আধুনিক বিনির্মাণ বুনন করেছেন, সময় ও যুগোপযোগী করে তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

২

নাট্যকার মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪) পূর্ণাঙ্গ, স্বল্প পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক সমস্ত ধরনের নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় ৮০টির কাছাকাছি। 'তক্ষক'(১৯৬৭) তাঁর একটি একাঙ্ক নাটক। মহাভারতের সকলের পরিচিত সর্প তক্ষকের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করলেন এই নাটকটি। কুরু বংশীয় সম্রাট অভিমুন্য ও উত্তরার পুত্র পরীক্ষিত ঋষি শৃঙ্গীর অভিশাপে তক্ষক দংশনে মারা যায়। এই নাটকে তিনি দেখিয়েছেন কর্তব্য পালনই জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি। জীবনকে উপভোগ করার জন্য মৃত্যুর অভিশাপকে বরণ করে নিয়েও মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন মহারাজ পরীক্ষিত। মহারাজ জীবনের যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই "তুমি কি মৃত্যুর থেকেও বড়"-রবীন্দ্রনাথের এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি, ফলে তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। রাজা পরীক্ষিতের মতই আমাদেরকেও জীবনের সমস্ত সংকটকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলতে হবে। জীবনে সুখ-দুঃখ, বাধা-বিপত্তি, সম্পদ-বিপদের সবস্থান আসবে কিন্তু তাকে সহজ করে নিতে হবে, মনোজ মিত্র পৌরাণিক পটভূমিতে রাজা পরীক্ষিতের গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সংকট থেকে উত্তরণের বার্তা দিয়ে গেলেন। রাজা পরীক্ষিতের মতোই মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে আলিঙ্গন করে নিতে হবে। তবেই আমরা জীবনের সমস্ত সংকট থেকে উত্তরণ এবং জীবনকে ভালোবেসে বরণ করে নিতে শিখব। পৌরাণিক বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সমাজ সংকটের বিনির্মাণ করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র।

অশ্বত্থামা (১৯৭২-৭৩) সত্তরের দশকের বাংলার উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে লেখা। ১৯৬৩ সালে রানীগঞ্জে থাকাকালীন এই নাটকটি লিখলেও পরবর্তীকালে ১৯৭২-৭৩ সালে আবার নতুনভাবে লিখলেন। নাটকটির কাহিনি, চরিত্র নামকরণ মহাভারতের অনুকরণে হলেও আসল উদ্দেশ্য মহান ভারতবর্ষের অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্বত্থামাদের সাম্প্রতিক কালের হিংস্রতাকে মিলিয়ে দেওয়া। নাটকটি বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায়, থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনাতে 'রঙ্গনা' নাট্যমঞ্চে ১৯৭৪ সালের ২মে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির অভিনয় করেছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র ও সুদীপ্ত বসু। পরবর্তীকালে বহুরূপী শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭৮ সালে প্রথম নাটকটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতের অশ্বত্থামা চরিত্রের উত্থান-পতন দৃঢ়তা এবং হাহাকার এর মধ্যে দিয়ে বাস্তব সমাজের অশ্বত্থামাকে তুলে এনেছেন লেখক। নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে গোধূলি দৃশ্য—কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা

হচ্ছে—"ঘাতক আমরা, রাজার পালিতঘাতক... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি। যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে অধর্মের বিনাশে।"[১]

বিশ শতকের ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে নকশাল আন্দোলন। বহু উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় যুবক আদর্শের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলনে। কিন্তু পাশাপাশি মেকি আন্দোলনকারীরা আদর্শবাদের মোড়কে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। ফলে আন্দোলনে দেখা দিয়েছিল বিভ্রান্তিকর অবস্থা। এই বিভ্রান্তিকর দিশাহীন যৌবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন অশ্বথামা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। মহাভারতের নির্দয় অশ্বথামাকে মনোজ মিত্র গড়ে তুলেছেন অন্তদ্বন্দ্বে, ঘাতে-প্রতিঘাতে ছিন্নভিন্ন যৌবনের প্রতীক রূপে। সমগ্রজীবন আদর্শ অনুগত প্রাণ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারেনি, তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে ভিন্ন প্রশ্ন উকি দিয়েছে? ন্যায় নীতি মূল্যবোধ ও অনুশোচনার প্রশ্ন? মহাভারতের অশ্বথামা আসলে এই বিভ্রান্তকর যুবসমাজ। যারা শত্রু চিনতে ভুলে যান। তাই অকারণে রক্তপাত ঘটিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অশ্বথামার মনে প্রশ্ন জাগে কাদের হত্যা করলাম, কেন হত্যা করলাম-'অন্ধ! শত্রু চিনিনা। শত্রুকে আঘাত করতে পারিনা। শেষ মুহূর্তে ভুল করি। একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই!'[২]

রাষ্ট্র শক্তির প্রতিনিধি দুর্যোধনেরা সবসময় ব্যবহার করেন যৌবনকে, অশ্বথামাকে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। মহাভারতের অশ্বথামা এবং আজকের অশ্বথামা যাদের হত্যা করছেন, তাদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কোন রাগ কিংবা রোষ কোনদিনই ছিলনা। তবুও কেন রাজার হয়ে, রাষ্ট্রের হয়ে আদর্শকে হত্যা করবে। তাই শত চেষ্টাতেও অশ্বথামা পান্ডবদের হত্যা করতে পারেনা আবারও ভুল করে। ভুল করে নিয়ে আসে পঞ্চপান্ডবের সন্তানদের ছিন্ন মস্তক। ধ্বংস করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

নাটকটির দ্বিতীয় পর্বে নিশীথ বা রাত্রের দৃশ্যে যেখানে এই তিন মহাপুরুষ বলাবলি করছেন—

"অশ্ব।। তারপর... নিথর রাত্রি....পাণ্ডব শিবিরে শোকভারে আছে নিমগ্ন...

কৃত।। হ্যাঁ হ্যাঁ...

অশ্ব।। দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে....

কৃত।। ঘুমায় ওরা?

অশ্ব।। ঘুমায় ওরা কর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস...।

কৃত।। শিয়রে প্রদীপ..."[৩]

পাণ্ডবদের আদর্শের বার্তাবহ রূপে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। তা আসলে কমিউনিস্ট মতাদর্শ। রাষ্ট্রের পালিত ঘাতকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আদর্শকে ধ্বংস করা। তাই

গান্ডীবধারী অর্জুনের বেশে ছুটে আসে নবযুগের নতুন আদর্শ। নাটকটির সংলাপ রচনাতেও আধুনিক ভাষা ব্যবহারের সৌন্দর্য্য- শৈলীনির্মাণ হয়েছে। নাটকটির পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে আধুনিক গবেষকের মন্তব্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক—"মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে অশ্বত্থামা নাটক। মহাভারতের অশ্বত্থামা দুর্যোধনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কৌরব পক্ষের শক্তিশালী একজন বীর যোদ্ধা। সে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছিল মহা যুদ্ধের একেবারে শেষ অংশে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের ১৮ দিনব্যাপী যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অশ্বত্থামার হাতে। যুদ্ধের এই শেষ অংশটুকু পরিস্ফুট হয়েছে অশ্বত্থামা নাটকে। মহাভারতের এই অংশটির পুনর্নিমাণের মাধ্যমে নাট্যকার সুকৌশলে সাম্প্রতিককালের হিংস্রতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।... এ নাটক কয়েক সহস্র বছর আগের ঘটনা, তা হয়ে যায় সমকালীন যুগে প্রতিভাষ্য।"[৪]

৩

'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪) ও 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) নাটক দুটিতে মনোজ মিত্র দেব-দেবী, স্বর্গ-মর্ত্যের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে তুলে এনেছেন সমকালীন সামাজিক অস্থিরতা, রাজনীতির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নকশাল আন্দোলন, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতিকে। মনোজ মিত্র 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে জমিদারদের দৈত্যাসুর আর দেবী দুর্গা রাষ্ট্র নায়িকারূপে চিহ্নিত করেছেন। নতুন যুগোদৈত্য জোরদারে থাবা, শিংও নখ একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে। নাটকের মধ্যে 'গরিবি হটাও' স্লোগানে যেমন ব্যঙ্গ আছে তেমনি বিদ্যুৎহীন খুঁটি, ভোট নিয়ে জালিয়াতি, শাসক দলও পুলিশের ভিতরে ভিতরে যোগসাজশ, রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী কোন্দল, নকশাল আন্দোলনের সময় শিক্ষার অবনতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তবতাকে জুড়ে দিয়েছেন নাট্যকার। জোতদার-চাষীর দ্বন্দ্ব সংঘাতে শিবের মত নেতারা বড় অসহায়। জোতদারের শোষণ কৌশলে কৃষক দরদী নেতাও শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তখন অসহায় মানুষ ছিদেমরা ঈশ্বর নির্ভর হয়ে পড়েন। আর এই সময় মানুষ মানুষের চৈতন্যের জাগরনের ওপর আন্দোলন ছেড়ে বাধ্য হন এবং অসহায় ভাবে শিবের মত নেতাদের বলতে হয়—"হল না রে ছিদেম, হল না। জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যি রে....শিবেরও অসাধ্যি।"[৫]

এই রূপ কাহিনি, চরিত্র ও শৈলী দিয়ে দৈব-মানব চরিত্রের একই সারিতে দাড় করিয়ে দিয়েছেন। আর নাটকটি হয়ে উঠেছে পৌরাণিকতার আড়ালে আধুনিক বিনির্মান।

পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) এর সংক্ষিপ্ত বা একাঙ্ক রূপ 'সত্যি ভূতের গপ্পো'(১৯৮২) এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন—'সত্যি ভূতের গপ্পো' একাঙ্কটি আমারই পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নরক গুলজারের' ছায়া অবলম্বনে লেখা। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ও

'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর প্রযোজনায় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৬ প্রথম অভিনয় হয়েছিল।" নাটকটিতে উঠে এসেছে সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপটি। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে 'নরক গুলজার' নাটকটির মধ্যে। জমিদার তন্ত্র বদলেছে, গণতন্ত্র এসেছে কিন্তু মানুষ বদলায়নি,বদলায়নি শোষণের রংঢং বা শৈলী বদলেছে শুধু কৌশল। জোরদার হয়েছে মন্ত্রী, মানুষের দুরবস্থা একই রকম থেকে গেছে। জমিদারের লাঠিয়াল আজকের পুলিশ বাহিনী ফলে শোষণের কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। প্রজা শোষণের সেই চিরন্তন কাহিনি সমানে চলছে, সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গে যেন প্রকৃত অর্থেই চলেছে ভূতের রাজত্ব। এই অবস্থাকে জনসম্মুখে তুলে আনতেই মনোজ মিত্র লিখলেন 'সত্যি ভূতের গপ্পো' নাটকটি।

নাটকটিতে পুরাণ ও বর্তমান যুগের চরিত্রের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। চরিত্রগুলি আমাদের অতি পরিচিত বিধাতা, যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, গুগলু, মামা, কদম দাস, নেংটি- ঘড়ুই- বাটুল- গুইবাবা, মানিক ও ফুল্লরা। স্বর্গ মর্ত্য মিলেমিশে একাকার। দেবতা ও ভূত-মানুষের হাসি- মজা- হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে নাটকটি ফ্যান্টাসির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নাট্যভঙ্গি ও আধিপত্যে নাট্যকার ব্যবহার করলেন এপিক নাটকের শৈলী বা ফর্ম। নাটকটিতে তিনি পৌরাণিক চরিত্রের মোড়কে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কার্যকলাপ তুলে ধরেছেন। বর্তমান সমাজে ঠকবাজ ঘুষখোর বেনামী ব্যবসাদার যে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন তিনি এই চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। হাস্যরসাত্মক ও তির্যক ভঙ্গিতে সমাজের আঁতের কথা তুলে ধরেছেন। নাটক শুরু হয়েছে—নরকেশ্বর পড়িমরি-হন্তদন্ত হয়ে বিধাতার কাছে ছুটে এসেছেন এরকম একটি দৃশ্য দিয়ে। বিধাতার পি. এ. হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্তের সংলাপের মাধ্যমে। যমরাজ চিত্রগুপ্তের কাছ থেকে জানতে পারলেন বিধাতা সুখনিদ্রায় আছেন। যমরাজ তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন-"থাক তোমার,আর মলম ঘষতে হবে না। যেমন প্রভু তেমন তার পার্শ্বচর! বলে দিয়ো... তোমার ঐ প্রভুটিকে বলে দিয়ো, আর বেশিদিন ভগবানগিরি করতে হবে না! কোথায় কি হচ্ছে কোন খবর রাখবে না, বিধাতা হয়েছে! গুষ্টির পিন্ডি হয়েছে! অকর্মণ্য জরদ্গব... যত জুটেছে শালা ঘাটের মড়া..."[৬]

হঠাৎ করে বিধাতা বেরিয়ে এলে হকচকিয়ে যান যমরাজ ও চিত্র গুপ্ত। যমরাজের আগমনের কারণ হিসাবে জানান-'আপনার ছোট বৌমা ছিনতাই হয়ে গেছে প্রভু!

বিধাতা।। সেকি!... ছোট বৌমা! আমার পাগলি ছেনতাই! ছেনতাইকারীর নাম বল?

যম।। ঐ নরক বাসী ভূত পিচাশ-

বিধাতা।। ভূত পিচাশ-

যম।। কাল রাতে আপনার বৌমাকে নিয়ে বিমানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম—দুষ্ট ভূতগুলো দল বেঁধে বিমানখানি লোপাট করে প্রাণেশ্বরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় আটকে রেখেছে প্রভু...

বিধাতা।। সে কি! এখানেও হাইজ্যাকিং!... রক্ষীরা কি করছিল?'[৭]

এ ঘটনা কখনোই পুরাণের হতে পারে না। ছিনতাইকারী, রাহাজানি, মস্তান, গুন্ডা, রাজনৈতিক নেতা মহাজন এ সবই আজকের সমাজে গড়ে ওঠা সমাজবিরোধী। বর্তমান সমাজে নারী ধর্ষণ, নারীর সম্মানহানি, নারী ছিনতাই, নারীপাচার হামেশাই হচ্ছে। দুষ্কৃতিদের কবল থেকে ধনী-দরিদ্র প্রশাসক কেউই রক্ষা পায় না। আবার সমাজে গুগলু'র মতো মস্তানেরও অভাব নেই। বড় বড় কেসে ফেঁসে রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের, মন্ত্রীদের সৌজন্যে কিংবা উঁচু তলার প্রভাবে সাজা মুকুব হয়ে যায়। তাই গুগলু বিধাতাকে বলেন—'সেকি গুরু! চিনতে পারছ না! তুমিই তো আমাকে নরকে ফিট করেছ গুরু...

গুগলু... গুগলু ওস্তাদ! নামকরা রেল ডাকাত! জনতা মেল...লালগোলা প্যাসেঞ্জার.... কামরূপ এক্সপ্রেস ছিল ওর কর্মস্থল!'[৮]

নাটকটির ভাষা-সংলাপ সহজ সরল। সহজ সরল ভাষা শৈলি দিয়েই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন নাটকটির মধ্যে। তাই এখানে চিত্রগুপ্ত, বিধাতা মস্তানদের কাকু-মামাতে পরিণত হয়।

আসলে 'নরক গুলজার' নাটকে সম্পূর্ণরূপে উঠে এসেছে এর সত্তর দশকের ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক। শোষক-শোষিতের লড়াই, সর্বহারা মানিক ফুল্লারার আর্তনাদ, রাষ্ট্রশক্তির আঁতাতের চিরন্তনকাহিনি।

৪

মদন সিরিজের শ্রেষ্ঠ দুটি একাঙ্ক নাটক 'আমি মদন বলছি'(১৯৭৪) ও 'মদনের পঞ্চকান্ড'(১৯৭৪), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ থেকে প্রকাশিত 'মনোজ মিত্রের নাট্য সমগ্র'র দ্বিতীয় খন্ড ও চতুর্থ খন্ডে জায়গা করে নিয়েছে। নাটক দুটিতে মনোজ মিত্র আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে বিনির্মাণ করেছেন। কলকাতার বেতার কেন্দ্রের প্রযোজনায় ধারাবাহিক ভাবে অভিনেতা রবি ঘোষের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছিল। পৌরাণিক চরিত্র মদনকে নিয়ে নাট্যকার আধুনিক দৃষ্টিতে এক অসাধারণ সমাজচিত্রের বর্ণনা করেছেন। যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রতীক মদন চরিত্রটি যতই পৌরাণিক হোক না কেন মনোজ মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা হয়ে গেছে গ্রাম বাংলার গেঁড়ে মদন কিংবা ভৃত্য মদনে।

এই নাটক দুটিতেও পশ্চিমবঙ্গের ৭০-দশকের ভয়াবহ অবস্থার কথায় প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের সাদামাটা মদন শহরে এসেছে সৌন্দর্যের খোঁজে। মদনের গ্রাম ছেড়ে আসার পিছনে আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ সমাজের সংকটের দিকগুলি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। গ্রাম্য পচা গলা দুর্গন্ধ পরিবেশ থেকে, খাদ্য-চিকিৎসা সংকট থেকে মৃতপ্রায় মদন শহরে এসেছে সঠিকভাবে বাঁচতে। তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য সংকট, জমিদারদের অত্যাচার এই সবকিছুর ঘোর অন্ধকার থেকে, 'অসোন্দর' গ্রাম থেকে বাঁচতে, আলোর দিশা দেখতে কলকাতা

নগরে এসেছেন মদন! গেঁড়ে মদন। এসেছে সুন্দরের সন্ধানে। কিন্তু হাই সে কি দেখলো, গ্রামের জমিদারদের মতন এখানেও এলাকা ভাগ করে নিয়েছেন মস্তানেরা। সবচেয়ে করুণ দুরবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে। স্কুল-কলেজের ভর্তি থেকে পরীক্ষা সবই মস্তানদের কবলে। নির্বাচনের সময় ওরা 'জিপ' হাঁকিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। শহরের এই দুরবস্থা দেখে মদন বিস্মিত হয়ে বলছেন—'কলকাতার বাবুরা ধারালো ছুরি নিয়ে ইনি ওনার পেট ফাঁসালেন, গাড়িতে আগুন ধরালেন, তার ছেঁড়লেন, বোমা ঝাড়লেন... কীসে থেকে যে কী হলো বাবুমশাইরা, সোন্দর সোন্দর এস্ট্যাচুগুলান কচুকাটা করলেন..।'[৯]

'আমি মদন বলছি' নাটকের মদন আজ আতঙ্কিত। শহরের স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের ব্যবহারিক চিত্র দেখে। তাইতো মদনের চিন্তায় নাট্যকার সমকা উত্থাপন করলেন—"শহর ভেসেকটমি করিয়ে তাকে খোজা করে রাখবে।" এই মদনের চরিত্র নির্মাণের মধ্যেই আছে নাট্যকারের আধুনিক চিন্তা চেতনার নবনির্মাণ ভাবনা।

আবার 'মদনের পঞ্চকাণ্ড'(১৯৭৪)নাটক এক গৃহ ভৃত্য মদনের পাঁচ পরিবারের কর্ম অভিজ্ঞতার কাহিনী। শ্রীমান মদন বা চাকর মদনকে আমরা দেখতে পাই-"যেকোনো জমায়েতে যে কোন বড় অনুষ্ঠানের মুখপাতে তিনি খাটো ধূতি, সস্তা জামা, ছেঁড়া চটি আর ময়লা গামছায় মদন, আমাদের ট্রিপিক্যাল মদন..।"[১০] এই মদন একটি চাকরির আশায় গোটা সমাজকে তোলপাড় করে দিয়েছেন। যদিও সে চাকরি কিন্তু কোন অফিসে নয় আদালতে নয় সে হতে চেয়েছে এক গৃহস্থের সৎ চাকুরে।

মদন যে বাড়ির চাকর সে বাড়িতে সাহেব আর মেম সাহেব থাকবেন। তাদের সন্দেহ বাতিক কার্যকলাপে মদন হতবাক। চরিত্রহীন সাহেব মেম সাহেবের কাহিনি বর্তমান শিক্ষিত সমাজের কামুক চরিত্রের আদর্শ উদাহরণ। নাট্যকার সুন্দর সংলাপে মধ্য দিয়ে মর্তের কামুক চরিত্রের উদঘাটন করেছেন—

"ছি ছি ছি ছি! তুমি এইরকম!
ছি ছি ছি! তুমিও এইরকম!
ছি ছি ছি তোমার লজ্জা করল না!
ছি ছি ছি তোমারও লজ্জা করল না!"[১১]

নাটকটিতে মনোজ মিত্র সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন পৌরাণিক নামাঙ্কিত চরিত্র মদনের দৃষ্টি পথের মধ্য দিয়ে।

৫

'চোখে আঙুল দাদা'(১৯৭৬) মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক। নাটকটি প্রমথনাথ বিশীর একটি ছোট গল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন বলে নাট্যকার জানান। 'চোখে আঙুল দাদা' মনোজ মিত্রের পৌরাণিক পটভূমিতে আধুনিক কাহিনির বিনির্মাণ। পৌরাণিক ও আধুনিক যুগসংমিশ্রণে স্বর্গ ও মর্তের চরিত্রগুলি নাটকের আদর্শ ও জীবন্ত চরিত্র হয়ে

উঠেছে। মর্ত্যলোকের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা চোখে আঙুল দাদাকে নিয়ে স্বর্গের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। ঘোষকের একটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে নাটকটির সূচনা—'একটা দুঃসংবাদ আছে। আজ সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ... যে নাটকটি হবার কথা, তারই নায়ক... শ্রী চোখে আঙুল দাদা হঠাৎ ঝিনঝিন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচন্ডভাবে ঝিনঝিন করতে করতে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।... তাঁর জগৎলীলা যখন দেখাতে পারছি না, তাঁর স্বর্গ লীলা দেখাব।..'[১২]

স্বর্গ মর্ত্যের মিশ্র পটভূমিতে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক অবক্ষয় তুলে ধরেছে নাট্যকার। চোখে আঙুল দাদা সমাজের এমন এক ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি যার কিনা কারো কাজেই ভালো লাগে না; ভালো চোখে দেখেন না। সবক্ষেত্রে সকল কাজেই খুত ধরেন। এঁদের কাছে নিজের দেশের কোন কাজই ভালো নয়, নিজে কিছু করবে না কিন্তু ভুল ধরবে। এই শ্রেণীর মানুষের বিনির্মাণ করেছেন 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকটির মধ্যে।

সবজান্তা চোখে আঙুল দাদার বাড়ি 'পশ্চিমবঙ্গ এসটেটের' সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি। এরা সাধারণত— 'ঢোলা প্যান্টালুন আর রঙচঙা ঢোলা পাঞ্জাবি.. কাঁধে ঝুলি.. মাথায় বটের ঝুরির মতন চুল.. ছাগলে দাড়ি.. রুটি সেঁকা চাটুর মতন দুই চোখে দুখানি বেগুনি রঙের কাঁচ বসানো চশমা, আর ধরুন সর্বদাই দাঁতে চুরোট কামড়ে আছে!খালি প্যাড়দারি করে ঘুরে বেড়ায়!'[১৩]

এই আধুনিক মডেল চরিত্রের 'আঁতেল মার্কা' সমালোচকের দল আমরা আজকাল প্রচুর দেখতে পাই। যারা নিজের ঘরে কুটোটি করেন না, অথচ অপরের কাজের খুঁত ধরে বেড়ান, কুটালোচনা করেন। আত্মকেন্দ্রিক ফাঁকিবাজ চোখে আঙুল দাদা নিজেই বলেছেন- 'কর্ম! কর্ম তো আমার একটাই ছিল বিধাতা! লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দাদার মতো লোকের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া!'[১৪]

এই সকল মতলববাজ দাদারা নিজের বৃদ্ধ মায়ের ভুল ধরাতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। খুঁত ধরা প্রসঙ্গে চোখে আঙুল দাদা বিধাতাকে যে কথা বললেন তা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক, বিধাতার টনক নড়ে যায়। বর্তমান সমাজে সামাজিক ও পারিবারিক যে অবক্ষয় তার চিত্র এখানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বর্তমান যুগের সন্তান ও মায়ের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, সংকট তা ধরা পড়ে চোখে আঙুল দাদার কথাবার্তার মধ্যে- 'বিধাতা-কার খুঁত'?

চোখে আঙ্গুল—আমার মায়ের। বলতুম, ওহে বৃদ্ধা, শোনো.. কি ননসেন্সের মত চা করো তোমরা... চা হয়েছে এটা, চা! চা! চা! বানাতে শেখেনি! এদেশের কেউ কি চা বানাতে শিখবে না! রাবিশ! গো টু হেল!

চিত্র।। বাঃ বাঃ সোনা ছেলে ! ...হুতোম প্যাঁচাটি।'[১৫]

আবার চিত্রগুপ্ত ও বিধাতার কথাবার্তা থেকে বোঝ যায় এই চরিত্রগুলিও পৌরাণিক নয়, আধুনিক যুগের কর্মচারী মালিক চরিত্র। বিধাতার অফিসের রেকর্ড বিভাগের কর্মচারী

হলেন চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্তের খাতায় এই অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির নাম না থাকায় বিধাতা তাকে বকাঝকা করেন—

'বিধাতা।। একটা লোকই বা বাদ পড়বে কেন? সে কি জগৎ ছাড়া! কাজকর্ম না পোষায় ছেড়ে দাও।

চিত্র।। (প্রায় কেঁদে) প্রভো....

বিধাতা।। (ভেংচি কেটে) প্রভো!... সামান্য একটা রেকর্ড তাও রাখতে পার না।'[১৬]

শুধু তাই নয় মালিক শ্রেণীকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেয়ার প্রবণতা কর্মচারীদের মধ্যে দেখা যায়— তার চিত্রও এখানে ধরা পড়েছে। বর্তমান সময়ে অফিস আদালতের কর্মচারীদের কাজ-কর্মের অবহেলার পাশাপাশি তাঁদের দপ্তরের খাতাপত্রের যে কি দশা তার চিত্রও নাটকে পাওয়া যায়—'আমাদের আবার হয়েছে কি বাবা আঁতেল... তোমার রেকর্ড পত্তর সব ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে!"[১৭]

সব মিলিয়ে নাটকটি পুরাণের পাত্রে আধুনিক যুগের 'গেলাসে মুচকুন্দ ফুলের সরবৎ' পরিবেশন করেছেন। ফলে পুরাণ চরিত্রকে সমসাময়িক করে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। যার কারণে তাঁর হাতে চরিত্রগুলি পুরাণের হলেও কথাবার্তার ভাব-ঢং-শৈলী- চলন-বলন-পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য খাবার সবই আমাদের পরিচিত রক্তমাংসের মানুষের জগতের।

'শোভাযাত্রা'(১৯৯০) মনোজ মিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'জয় বাবা হনুনাথ' নাটকটির বৃহৎ সংস্করণ বলা যেতে পারে। শোভাযাত্রা আসলে রথযাত্রা। "জগন্নাথ-বলভদ্র ও সুভদ্রা"কে নিয়ে রথযাত্রা হয় বিশেষ তিথিতে। কিন্তু নাটকটিতে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার অভিঘাত তুলে ধরা হয়েছে তা অন্যরূপ। সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহার উক্তিতে তা আরও স্পষ্ট- 'সারা ভারত জুড়ে যখন ধর্মীয় রথের রাজনীতি দেশটাকে সাম্প্রদায়িক ভেদচিহ্নে টুকরো করতে উন্মত্ত, তখন আমাদের নাট্যকার এক পারিবারিক ঐতিহ্যের ধর্মীয় বিশ্বাসের রথকে সামাজিক বিশ্বাস ও সংহতির রথে রূপান্তরিত করে দেখিয়ে দিলেন যে, সাহিত্য-শিল্প ও নাট্যর সামাজিক উপযোগিতাবাদে কেবল মার্কসবাদী বস্তুবাদীরাই বিশ্বাস করেন না, অমার্কসবাদী বস্তুবাদীরাও মান্য করেন।'[১৮]

আসল কথা, বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লালকৃষ্ণ আদবাণীর ভারতব্যাপী রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে।

সে যাই হোক না কেন, নাটকটির মধ্যে মনোজ মিত্র দেখালেন সামাজিক বিবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ। দেশের ধর্মীয় বিদ্বেষ বাতাবরণের মধ্যে, জাত পাত ভেদাভেদের মধ্যে নাট্যকার দেখালেন সমন্বয়ের বাণী। জগন্নাথের যে রথ ছিল পারিবারিক সম্পত্তি। সেই রথ গ্রামবাসীর হাতে তুলে দেয়-ধনগোপাল। পারিবারিক উৎসবকে সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত করলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষ পা মিলিয়েছে এই শোভাযাত্রায়। তাই রঞ্জন

গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—"শোভাযাত্রা" মানুষের সর্বজনীন শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে। জমিদার বংশের নিজস্ব রথযাত্রা সব মানুষের রথযাত্রায় পরিণত হয়। ধনগোপাল এবং তার পরিবারও বাইরে থাকতে পারেন না এই জীবনস্রোতের। তথাকথিত বংশগৌরব আর অতীতের জন্য হা-হুতাশ মুছে যায় কালের অভিঘাতে। শ্রীমিত্র এখানে অসাধারণ প্রজ্ঞায় বলে দেন, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহে একাকার হয়ে যায় সমস্ত জমিদার পরিবারের আজকের বংশধরেরা।"[১৯]

তাই এই নাটক কেবল ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আটকে থাকেনি, হয়ে ওঠেছে সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজের নির্মাণের কাহিনি।

৬

'পুঁটিরামায়ণ'(১৯৮৯-৯০),'দেবী সর্পমস্তা'(১৯৯৫),'জয় বাবা হনুনাথ'(২০০৪) ও 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), এই একাঙ্ক নাটকগুলিও পুরাণ ও মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা।

'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) সাপ্তাহিক বর্তমানে প্রথম প্রকাশ হয়। রামায়ণের রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, কালনিমি এই সকল চরিত্রগুলির পাশাপাশি পুঁটিরাম বাগচী, বক্কেশ্বর, বৈদ্য চরিত্রগুলির সমান্তরাল সুন্দর বুনন তৈরি করেছেন। রামায়ণের খোলসের ভিতর পৌরাণিক ও আধুনিক চরিত্রগুলিকে মিশিয়ে নতুন আঙ্গিক পুঁটি রামায়ণ। নাটকটি হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচী এলাকাসহ গোটা সমাজটাকেই দেখিয়েছেন নতুন দৃষ্টির আঙ্গিকে। মনোজ মিত্র তুলে এনেছেন পুঁটিরাম বাগচীসহ একালের গোটা সমাজটাকে। এই রামায়ণে নায়ক রাম নয় পুঁটিরাম বাগচী। আর রাবণ-ইন্দ্রজিৎ- কালনেমি হলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্রনায়ক, "মেজর জেনারেল" কিংবা পলিটিক্যাল এডভাইসার। এঁরা বিশ শতকের স্বর্ণালঙ্কায় ঢুকে গিয়ে সেখানে চালু করেছে আধুনিক এক নতুন ব্যবস্থা। আসলে নাট্যকার আধুনিক সমাজের কলুষিত দিকগুলিকে কটাক্ষ করেছেন এই নাটকের মধ্য দিয়ে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, সংসদে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি তদন্তের পক্ষপাতিত্ব কিম্বা বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা সবকিছুতে সিস্টেমের আড়ালে রামায়ণের কেচ্ছা। তথাকথিত আধুনিকতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে, কুলাঙ্গার সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে, বিবেক ও মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন এই নাটকটির মধ্যে।

'দেবী সর্পমস্তা'(১৯৯৫) মনোজ মিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত 'মনোজ মিত্রের নাট্য সমগ্র' তৃতীয় খন্ডে আছে। 'দেবী সর্পমস্তা' ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত।দেবী সর্পমস্তা'য় রাজা লোকেন্দ্র প্রতাপের বংশ, রাজ্য এবং সিংহাসন রক্ষায় আদিম বনচারী মানুষের ভূমিকা দেখিয়েছেন নাট্যকার। এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের চিরন্তন সত্যকে। অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই মন্তব্য করেন- "ইতিহাস-ঐতিহাসিকতার দুরত্ব, আদিবাসী সমাজের আদিমতার দূরত্ব ওই হিংস্রতাকে একটা

নাটকীয় সংগতি দেয়। শেষ পর্যন্ত যে যাকে চায়, তাকেই পায়—কিন্তু অনেক ঝড় ঝাপটা অনেক ভাঙন পেরিয়ে।"[২০]

এখানে সূক্ষ্মভাবে যেন চলে আসে অসহায় চাঁদ সওদাগরের প্রতিচ্ছায়া। অনার্য বনোচারীর দেবীমনসা এই বন-পাহাড় আদিম মানুষের শক্তি সাহস রক্ষাকারী। অথচ ভারতবর্ষ বনচারী আদিম জনজাতির মানুষগুলোকে কখনোই আপন ভাবেনা। কিন্তু এই আদিম মানুষগুলিই শাসকের শক্তি ভান্ডার। অথচ তারা বঞ্চিত দেবীমনসার মত। জমেছে বঞ্চনার পাহাড়। উন্নয়নের নামে যখন একালে আদিবাসী মানুষকে স্বভূমি থেকে উৎখাত হতে হয়, বঞ্চনার কথা বললে জোটে দমন-পীড়ন তখনই নাটকটি সমকালীন হয়ে ওঠেন এবং নাটকটি হয়ে ওঠে আধুনিক পুরাণের পুনর্নির্মাণ।

'জয় বাবা হনুনাথ' (২০০৪) ছোটদের জন্য রচিত মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটক। ছোটদের জন্য রচিত হলেও এর তাৎপর্য ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতা উচ্চমার্গের। নাটকটি রামায়ণের প্রভুরামভক্ত হনুমানের কাহিনিকে মাথায় রেখে আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক নেতাভক্ত হনুদের কথা তুলে ধরেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন 'ভারতীয় জনতা পার্টির' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। এই সরকারের বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন লাল কৃষ্ণ আদবানি। তাঁর সারাভারত 'রথ যাত্রার' প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন নাট্যকার 'শোভাযাত্রা'য়। নাট্যকার মনে করেন "রাম রাজ্য" স্থাপন করতে গিয়ে দেশে সৃষ্টি হয়েছে হনুমান বাহিনি। এই হনুদের হাতেই দেশের শাসনভার। আসলে নিজের নিজের বুদ্ধি ও মেধা অনুসারে রামায়ণে কেউ দেখেন রামচন্দ্রের সত্যপাল, প্রজাপালন; আবার কেউ দেখেন শুধুই হনুমান-জয় বাবা হনুনাথ। নাট্যকার তাই পন্ডিত চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন-"রাজা কেন বনে যাবে, ছিঃ! বনই এসে দাঁড়াবে রাজার দুয়ারে। তার বেশি দেরিও নেই। অচিরেই দেখবে সোঁদরবনের জল জঙ্গল ঢুকে পড়েছে রাজবাড়িতে।"[২১]

আজকের দিনে হাসপাতাল থেকে শুরু করে সর্বত্রই চলছে এই হনুদের দাপাদাপি-লাফালাফি। এই বাস্তব সত্যকেই নাট্যকার পৌরাণিক মোড়কে আধুনিক করে তুলেছেন।

'যা নেই ভারতে' (২০০৫) একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটিতে সমাজ চেতনার অনেক জানা-অজানা দিকগুলি মহাভারতের আদলে চিত্রিত। 'যা নেই ভারতে' ভারতে না থাকা তথ্যকে আমাদের সামনে নাট্যকার হাজির করেছেন পৌরাণিক মোড়কে। মহাভারতের বহু অজানা, অনালোকিত দিকগুলিতে আলো ফেলেছে এবং যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুগপ্রচলিত ধারণার বিপরীত সত্যকে তিনি হাজির করেছেন নতুন আঙ্গিকে। নতুন কালের নতুন দৃষ্টিতে মহাভারতকে দেখতে গিয়ে ভীষ্মকে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক যুদ্ধবাজ

রাজনীতিবিদ হিসেবে। আর ধৃতরাষ্ট্র হয়ে গেছেন শান্তিকামী মানুষের প্রতিনিধ। ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র দুই বিপরীত মেরুর মতাদর্শে বিশ্বাসী।

ভীষ্মের গাম্ভীর্য খসে পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে সাম্রাজ্যলোভী, প্রভুত্বকামী এক মানুষ। কঞ্চুকীর কথায় খসে পড়েছে ভীষ্মের ছদ্দবেশ -'সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না।'[২২]

নাটকটিতে কুরু পাণ্ডবের বংশ রক্ষার দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সিংহাসনের অধিকার লড়াইয়ের বাসনাও জাগিয়ে তোলা হয়েছে। একদিকে বনবাসে মৃত্যু পান্ডুর পাঁচ সন্তান, অন্যদিকে ব্যসেদেবের কাছ থেকে গান্ধারীর দত্তক নেওয়া একশত সন্তান। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সংকট সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সমাগত দ্বন্দ্ব যা সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনের দ্বন্দ্ব। শকুনির সংলাপে এই দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে- "একদিকে দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার ফিরিয়ে আনা আর একদিকে তোমার স্বামীর প্রতিরোধের সঙ্কল্প। শ্যেনপক্ষী আর কবুতরের লড়াই।"[২৩]

আর ভীষ্ম হলেন সেই যুদ্ধপ্রিয় শ্যেনপক্ষী অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র শান্তির দূত কবুতর।

এই নাটকে পৌরাণিক মহাভারত কাহিনির মধ্যে মনোজ মিত্র প্রয়োগ করেছেন আধুনিক ভারতের কাহিনি। বঞ্চিত, অবহেলিত প্রান্তিক মানুষের জাগরণ স্রোতকে তিনি মহাভারতীয় পটভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন। ফলে 'যা নেই ভারতে' হয়ে দাঁড়াল 'যা আছে ভারতে' বিশিষ্ট সমালোচক বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমাদের কাছে—"আমাদের চেনা পাণ্ডব ও কৌরবদের জায়গায় আমরা দেখি একদিকে যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত শক্তি, অন্যদিকে অবহেলিত, বঞ্চিত, অপমানিত, প্রান্তিক মানুষদের ঐক্য। আমাদের চেনা মহাভারতে এসব নেই, কিন্তু আমাদের চেনা দেশ ভারতে এ সবই দেখছি আমরা। মনোজ সমকালীন চেতনার আলো ফেলেছেন নাটকের বিশেষ বিশেষ স্তরে। শুধু জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিও ছায়া ফেলে।"[২৪]

৭

'ভেলায় ভাসে সীতা'(২০০৭),'হনুমতী পালা' বা 'মন্দোদরী হরণ'(২০০৯) ও 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি'(২০১০) খুবই সাম্প্রতিক কালে লেখা নাটক। মনোজ মিত্র এই নাটকগুলি তাঁর চিরাচরিত পথেই লিখেছেন। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনি অনুসরণ হয়েছে নাটকগুলি। 'তক্ষক' কিংবা 'অশ্বথামা' নাটকের অনুরণন ফিরে পেলাম 'হনুমতী পালা' কিংবা 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটক দু'টির মধ্যে। 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার কথা। কিন্তু এখানে বেহুলা নয় সীতা ভেসেছেন। রামায়ণের অন্যতম নারী চরিত্র সীতা। সীতার দুর্ভাগ্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবহেলা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে। এই নাটকটিতে রামায়ণের রাম, লক্ষণ, রাবণ, শূর্পনাখা নতুনভাবে নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। রামায়ণের কাহিনির বিপরীত স্রোতে ভেসে গেছে সীতা চরিত্রটি। শূর্পণখার প্রতি হওয়া অন্যায় কখনোই

সীতা সমর্থন করেননি। স্বামী ও দেওরের কাজকে নারী সমাজের লাঞ্ছনা মনে করেছেন। এই সীতাকে রাবণ হরণ করলে তাঁর বীরাঙ্গনা মানসিকতার কাছে পরাজিত রাবণ। এবং ভেলায় করে সীতা পঞ্চবটীর দিকে ফিরে আসে।

সমুদ্রের তীরে দূরে পর্বতের চূড়ায় বসে জটায়ুর দাদা সম্পাতি লঙ্কা থেকে ভেলায় সীতাকে পঞ্চবটীর দিকে আসতে দেখেন। সীতার মুক্তির আনন্দ সকলের আনন্দিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাম এতে সন্তুষ্ট বা খুশি হননি। তাই সীতাকে পুনরায় লঙ্কায় ফিরে যেতে বলেন। সীতা এটা ভাবতেই পারেনি তাই তো সীতা বলেন 'আমার জেদের কাছে, আমার হার-না-মানা প্রতিজ্ঞার কাছে হার মেনেছে রাবণ! মরণপণ প্রতিজ্ঞা! আমাকে কেউ জয় করতে পারবে না! জয় করেছে একজন-সেই কবে হরধনু ভঙ্গ করে!... ভাবতে পারো রাম, লঙ্কার লোকেরা আমায় ভেলায় তুলে দিচ্ছে, আর লঙ্কেশ্বর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে!"[২৫]

ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির নাটক 'ভেলায় ভাসে সীতা'। নাটকটি সম্পূর্ণ আধুনিক সময়োপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই পৌরাণিক কাহিনি বিনির্মাণ ঘটলো।

'হনুমতী পালা' বা 'মন্দোদরী হরণ' (২০০৯) নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। রামায়ণের রাবণ স্ত্রী মন্দোদরী কাহিনি অবলম্বনে নাটকটির রচিত। মন্দোদরীর আক্ষরিক অর্থ 'কোমল উদর বিশিষ্টা'। পুরাণ মতে মন্দোদরী ছিলেন অসুররাজ ময়াসুর ও অপ্সরা হেমার কন্যা। এবং রামায়ণ অনুসারে, মন্দোদরী ছিলেন লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণের রাজমহিষী। রাবণ তাকে হরণ করে আনেন। স্বামী রাবণের শত দোষ সত্ত্বেও মন্দোদরী তাকে ভালোবাসেন এবং ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বারবার সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। কারণ মন্দোদরী রাম পত্নী সীতারও গর্ভধারিণী মা। তাই সীতাকে রাবণ হরণ করলে গোপন কারণে কষ্ট পান। রাবণের মৃত্যুবান মন্দোদরী কাছে থাকে, হনুমান তা কৌশলে হরণ করেন এবং রাবণের মৃত্যু সম্ভব হয়ে ওঠে।

'হনুমতী পালা' বা 'মন্দোদরী হরণ'র মধ্যেও রামায়ণের নবনির্মাণ হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য ধারার সবশেষ নাটক 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' ২০১০ সালে রচিত। নাটকটি 'ব্রাত্যজন নাট্যপত্র', শারদীয়াতে২০১০ হলে প্রথম প্রকাশিত। এবং সুন্দরম প্রযোজিত মধুসূদন মঞ্চে ২২ মার্চ ২০১২ সালে প্রথম অভিনীত।

"আশ্চৌর্য ফান্টুসি" নাটকটিও রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত। রামায়ণের রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি, মন্দোদরী, বজ্রজালা, সরমা, সীতা, হনুমতী চরিত্র অবলম্বনে মজার ফ্যান্টাসি নাটক 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি'। নাটকটিতে রামায়ণের নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে আধুনিক বাস্তবতার মাটিতে দাঁড় করিয়ে সিবিআই তদন্ত করা হয়েছে। নাটকটির ছোট ছোট ঘাত প্রতিঘাত দর্শককে মুগ্ধ করে, অনাবিল আনন্দ দেয়। হনুমতী আংটি নিয়ে বান্ধবী সীতাকে খুঁজতে গেলে হাস্যরসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়—

'হনুমতী সত্যি! সত্যি তুই আমার সই সীতা?
বজ্রজ্বালা সীতা-সীতা-সীতা না তো কি নেত্যকালী?..
বজ্রজ্বালা। এই তো. এই তো আংটি।
বজ্রজ্বালা হনুমতীর হাত থেকে আংটি
হনুমতী মাগো! চিনতে পারলি?
বজ্রজ্বালা পারব না? আমার বাপের বাড়ির রাঁধুন..
বজ্রজ্বালার থেকে আংটি কেড়ে নেয়।
হনুমতী বাবাগো! এটা কুম্ভকর্ণের বউ নাকি? ওরে সীতা, ওরে সই রে..'[২৬]

নাটকটিতে হনুমতি আংটি নিয়ে প্রত্যেকে পৌরাণিক চরিত্রের কাছে যান। এবং প্রত্যেকে চরিত্রে মধ্যেকার লোভ-লালসা যুক্ত বাস্তব রক্তমাংসের মানুষকে আবিষ্কার করেন। মনোজগতের তদন্তে পৌরাণিক চরিত্রগুলি মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে আশ্চৌর্য ফান্টুসি ছাড়া কিছুই নয়।

সমাজ সচেতন নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্র বার বার ফিরে গেছেন পুরাণের আঁতুড়ঘরে, সেখান থেকে খুঁজে এনেছেন সদ্যোজাত আধুনিক চেতনা সম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র, কাহিনি কিংবা শৈলী। এবং নাটকে প্লট ও ফ্রেমে গড়ে ওঠে মেদ-মাংস ঝরানো পৌরাণিক কাহিনি। হয়ে উঠে নব রামায়ন, নব মহাভারত যা এক নব নান্দনিক শিল্প ভাবনা। এই কারণেই বাংলানাট্য সাহিত্য আন্দোলনে মনোজ মিত্র বারে বারে মেদ-মাংস ঝরিয়ে কেবল কঙ্কালকে নিয়ে মহাভারতের, রামায়ণের ও বিভিন্ন পুরাণের নানান কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার বিনির্মাণ করেন এবং সমকালীন দৃষ্টিতে তাকে নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। যার কারণে নাটকগুলির কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, শৈলী, সংলাপ সমস্তই হয়েছে প্রাসঙ্গিক এবং প্রশ্নাতীত। এই প্রশ্নাতীতকে চিরন্তন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন রেখে নাট্যকার মনোজ মিত্র ১২নভেম্বর ২০২৪ সালে মর্ত্যলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গলোকের স্বর্গীয় আনন্দের জগৎ এ পৌঁছে যান।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র,মনোজ-অশ্বত্থামা-'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র'দ্বিতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট -কলি ৭৩-অগ্রহায়ণ ১৪০১-পৃ ৭৭.
২. ঐ-পৃ ৬১.
৩. ঐ-পৃ ৭৪.
৪. রায়,রচনা -গবেষক-B.B.M.K.U.- সহকারী অধ্যাপক AJKM কলেজ-'গবেষণা-সারৎসার, ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্বিন্যাস ও তার আলোচনা'-পৃ-১১ (শোধগঙ্গোত্রী থেকে প্রাপ্ত)

৫. মিত্র,মনোজ-'শিবের অসাধ্যি'-'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র'-দ্বিতীয় খন্ড-ঐ -পৃ৩১৯.
৬. মিত্র,মনোজ-'নরক গুলজার'-কলাভৃৎ পাবলিশার্স-বর্ণপরিচয় দ্বিতল-কলেজ স্ট্রিট মার্কেট-কলকাতা ০৭-অক্টোবর ২০১৩-পৃ১০.
৭. ঐ-পৃ১১.
৮. ঐ-পৃ৪০.
৯. মিত্র,মনোজ-'আমি মদন বলছি'-মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খন্ড-পৃ৪৫১.
১০. মিত্র,মনোজ-'মদনের পঞ্চকান্ড'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-চতুর্থ খন্ড-পৃ২৪৬
১১. ঐ
১২. মিত্র,মনোজ-'চোখে আঙুল দাদা-'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র'-দ্বিতীয় খন্ড-ঐ -পৃ৩৬৯
১৩. ঐ -পৃ৩৭১
১৪. ঐ-পৃ৩৭২
১৫. ঐ-পৃ৩৭৩
১৬. ঐ-পৃ৩৭০
১৭. ঐ-পৃ৩৭২
১৮. সাহা, নৃপেন্দ্র-সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা'-গণশক্তি পত্রিকা-১১.০২.১৯৯২
১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন-'সুন্দরমের' 'শোভাযাত্রা'-সীমা জয়ের নাটক-পশ্চিমবঙ্গ-২৫বর্ষ-২৯-সংখ্যা- ৩১.০১.১৯৯২.
২০. মিত্র,মনোজ-'দেবী সর্বমস্তা'-মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-তৃতীয় খন্ড-সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়-ভূমিকা-পৃ৩-৪
২১. মিত্র,মনোজ-'জয় বাবা হনুনাথ'-মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-পঞ্চম খন্ড-পৃ৩৭৭.
২২ মিত্র,মনোজ-'যা নেই ভারতে'-মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-পঞ্চম খন্ড-পৃ১৯
২৩. ঐ-পৃ৪১
২৪. চক্রবর্তী, দীপেন্দু-'যা নেই ভারতে' দেশ পত্রিকা- অনলাইন.
২৫. মিত্র,মনোজ-রামায়নী মহাভারতী-'ভেলাই ভাসে সীতা'-দেব পাবলিশিং-কলকাতা ৭৩-আগস্ট ২০১৯ -পৃ১৫৫.
২৬. মিত্র, মনোজ-'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' -কলাভৃৎ পাবলিশার্স-বর্ণপরিচয় দ্বিতল-কলেজ স্ট্রিট মার্কেট-কলকাতা ০৭-মে২০১২-পৃ২১-২২.

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার-পৌরাণিকা-ফার্মা কে এল এস প্রাইভেট লিমিটেড- কলকাতা ০১.
২. সরকার,সুধীর চন্দ্র-পৌরাণিক অভিধান-এম.সি সরকার এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড- কলকাতা০৭.
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ-'বাংলা সাহিত্যের পৌরাণিক নাটক'-পুস্তক বিপণি-কলিকাতা ০৯.
৪. ঘোষ,অজিত কুমার-বাংলা নাটকের ইতিহাস-জেনারেল প্রকাশনী-সপ্তম সংস্করণ- ১৯৮৫ -কলকাতা ১৩.

কৈ লা শ প তি সা হা
রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে মনোজ মিত্রের দুটি নাটক

বাঙালি জীবনে রামায়ণ ও মহাভারত হল এক পরম সম্পদ। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখে নানান সৃষ্টিকর্ম এবং দিক থেকে দিগন্তে পথ চলা। মহাকাব্য কোনো একক মানুষের সৃষ্টি নয়, আবার এক কালের মধ্যেও আবদ্ধ নয়। রামায়ণ ও মহাভারত বহু প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে আত্মস্থ করে রচিত। মানুষ তার ভক্তি শ্রদ্ধা, সুখ দুঃখের বিচিত্র কাহিনি, জয় পরাজয়ের নানা বৃত্তান্ত মুখে মুখে বহন করে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। এই লৌকিক ও মৌখিক কাহিনির সম্ভার ব্যপ্তি লাভ করেছে মহাকাব্যের অবয়বে। তাই মহাকাব্য কেবল সময়ের সরণিতে আটকে না থেকে হয়ে উঠেছে চিরায়ত। যুগে যুগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি নব নব রূপে ও বাস্তবের মাঝে নিত্য নতুন ভাবে ধরা দেয়। সময় ও সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের কাহিনিকে দেখার ও বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে।

উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁ এবং যুক্তিবাদকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীন মহাকাব্যকে একালের নিরিখে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। যার ফলশ্রুতিতে মহাকাব্যের আখ্যান ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে মহাকাব্যের নবনির্মাণ। আমাদের আলোচ্য 'যা নেই ভারতে' (২০০৫) এবং 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮) নাটকে নাট্যকার মনোজ মিত্র রামায়ণ মহাভারতকে নিছক অনুসরণ করেননি বরং স্বীকরণ করেছেন যথার্থ নাট্যকারের গুণে। নাটক দুটিতে তিনি মহাকাব্যিক আখ্যানবৃত্ত ও সময়বৃত্তে আটকে না থেকে সমকালকে নাটকে প্রয়োগ করেছেন অসামান্য দক্ষতায়।

'যা নেই ভারতে' নাটকটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই পর্ব ও নয়টি দৃশ্য সমন্বিত নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা তেরো। এখানে দেখানো হয়েছে সমকালের রাজনীতির মারপ্যাঁচ, সাম্রাজ্যবাদ, ক্ষমতালিপ্সা, বংশানুক্রমে ক্ষমতা ধারণ, শোষণ, লুণ্ঠন ও নারীকে ভোগ্য করে রাখার মানসিকতা। নাটকটির মুখবন্ধে অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশবাদী জার্মান শিল্পী অটো ডিক্স এর একটি মন্তব্য স্মরণ করে বলেছেন, "শেষ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধই ঘটেছে যোনির জন্য, যোনির উপরই। মনোজ মিত্রের নাটকে যেন তারই প্রমাণ।"[১] অম্বা, অম্বালিকা, তাঁদের দাসী, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, ইরা—প্রত্যেকেই যুদ্ধবাজ, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাভিলাস চরিতার্থ করতেই তাদের যোনি ও গর্ভ নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে দিয়েছেন। নাট্যকারের নাট্য কল্পনায় এই যোনিদানের কুৎসিত পম্পরাকে অবলম্বন করে পাতকিনী চরিত্রটির সৃষ্টি।

নাটকটির শুরুতে কঞ্চুকী এবং অকালপ্রয়াত বিচিত্রবীর্যের বড় রাণি অম্বিকার চোখ দিয়ে মহাভারতের কাহিনিকে দেখানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী,

রাজা সুবল ও শকুনি। মহর্ষি ব্যাস এখানে সিংহাসনের অন্তরালে থাকা ভীষ্মের রাজনৈতিক পরিকল্পনার একজন বাহক মাত্র, যিনি দৈব মহিমার আশ্রয় নিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করেন। বড় রাণি অম্বিকাকে নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনে অনুরোধ করেছে অন্তঃপুরাধ্যক্ষ কঞ্চুকী এবং পুরোহিত। এখানে অম্বিকার পুরুষ নির্বাচনে কোনো স্বাধীনতা নেই। তার অসহায় আর্তনাদ শোনা গেছে নাটকের শুরুতে :

"কোনওদিন আপনার ভ্রাতাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। ভেবেছি ওই বালকের হাতে সমর্পণ করে আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। দেব, ভাগ্যগুণে যখন সেই বালক স্বামীর ছায়াটি সরে গিয়েছে, আর অন্য পুরুষে সমর্পণ করবেন না। কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি এই অভাগীকে গ্রহণ করো, তোমা ভিন্ন কাউকে জানে না অম্বিকা।"[২] কিন্তু ভীষ্মের নির্দেশে তাঁকে শয্যায় আহ্বান করতে হয় ব্যাসকে। যার মুখ দর্শন করতে চান না, তারই সঙ্গে শয্যা ভাগ করে নিতে হয় অম্বিকাকে। এখানে তার স্বীকারোক্তি স্পষ্ট—

"আমি যেমন আপনার মনোনীত কামিনী নই, আপনিও নন আমার কামনার পুরুষ। একটি রাজবংশ রক্ষার তাড়নায় নিযুক্ত আমরা দুটি নারী পুরুষ। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, আমি আমার।"[৩]

এখানে হৃদয়বৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই, আছে বংশরক্ষার তাগিদ। তাদের আয়োজিত মিলনে জন্ম হয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের। অম্বিকার প্রত্যাখ্যানে ব্যাসের পৌরুষ আহত হয়েছে বলেই মিলনজাত সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়ে ভীষ্মকে জানান—"অজ্ঞাতকুলশীলের হাতে ধনজনমান সকলই হারাবে সে সিংহাসনখানিও।"[৪] এই ভবিষ্যৎবাণী ভীষ্মকে অস্থির করে তোলে। শাসকশ্রেণি সবসময় তার শাসনক্রম প্রজন্ম পরম্পরায় অব্যাহত রাখতে চায়। তাই যে ভাবেই হোক বংশ রক্ষার উপায় তাকে খুঁজে নিতে হয়। ভীষ্ম যখন ব্যাসের কাছে জানলেন—"সেই পুত্র কখনও তার মাতৃমুখ দর্শন করবে না"[৫] তখন ভীষ্ম ব্যাসদেবের সাহায্য নিলেন অম্বালিকা ও দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য। পরবর্তীকালে পিতামহ ভীষ্মের সামনে পাণ্ডু পুত্রদের তথা পাণ্ডবদের আগমণবার্তাকে নাট্যকার সন্দেহের চোখে দেখেছেন।

অম্বিকা ও অম্বালিকার দুই শিশুকে লালন করেছে কঞ্চুকী। অম্বিকার ছলনায় দাসীর গর্ভে ব্যাসের ধার্মিক সন্তান বিদুরের জন্ম কাহিনিটি থাকলেও নাট্যকার তাকে ব্যাসের কামনা তাড়নার ফসল হিসেবে দেখিয়েছেন। নাটকে পাতকিনীর আগমন শিশু ধৃতরাষ্ট্রকে জঙ্গলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে সে ভীষ্মের আদেশে অলক্ষণযুক্ত শিশুটিকে সরিয়ে ফেলতে চায়—"ওপর থেকে আদেশ হয়েছে, বড় বউটার ব্যাটাকে জঙ্গলে সরাও।"[৬] এই অবাঞ্ছিতদের যদি সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তারাই ভবিষ্যতে শাসকের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পাতকিনী নিজেকে 'জঙ্গলের মা' বলে চিহ্নিত করে। হস্তিনারাজ্যের অনাচার ও ব্যাভিচারের মধ্যে বাচ্চাগুলিকে জংলি করে পালন করাই তার কাজ। কিন্তু কাহিনিতে সে এসেছে কখনও ঝড়ের মত, কখনও প্রতিশোধ নিতে,

কখনও বা সন্তানদের জন্য অন্ন ও অর্থের দাবি নিয়ে। তার পালিত সন্তানেরাই শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশত পুত্রের পরিচয় পেয়েছেএরাই যুদ্ধবাজ ও বুনো স্বভাবের একশত কৌরব।

নাটকে ধৃতরাষ্ট্রকে দেখানো হয়েছে কোমল স্বভাব, সংবেদনশীল ও প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে। গান্ধাররাজ্য লুণ্ঠন করতে যাওয়া, সুবল শকুনি ও গান্ধারীকে অতিথি করে রাখা, গান্ধারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বিবাহ করতে বাধ্য করা এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে। পাণ্ডুর সঙ্গে তার বিবাদ সকন্যা সহ সুবলকে যুদ্ধবন্দী করা নিয়েই। গান্ধাররাজ্য লুণ্ঠন করার পর প্রিয় উটের গলা জড়িয়ে তাকে যেতে দেবে না বলে রাজকন্যা সামনে এলে ভীষ্মের নির্দেশে তাদের ধনসম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে রাজকন্যা সহ তার পরিবারকে আনা হয় অতিথির মত করে। সেই সঙ্গে গান্ধারীকে চোখ দিয়ে মেপে নেয় ভীষ্ম। এই ঘটনার জন্য ভীষ্মকে বলা হয়েছে জাত প্রেমিক। বিয়ে না করেও তিনি নারী শরীর সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্টভাবেই বলেন, "ব্যাধি, বিদুর কুরুবংশের চিরকালের ব্যাধি ! হরণ, লুণ্ঠন ! আর সুন্দরী পেলে তো কথাই নেই"[৭] সর্বত্যাগী ভীষ্ম কেন অন্যের ভোগের আয়োজনে ব্যস্ত এই সংগত প্রশ্ন জাগে ধৃতরাষ্ট্রের মনে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধাররাজ্যকে সাহায্য করে পুনরায় গড়ে তুলতে চান ভীষ্ম। এখানেও ধৃতরাষ্ট্রের মনে জটিল জিজ্ঞাসা :

"সে কী ! আমরাই যে দেশ ধ্বংস করেছিসেই দেশ গড়ে তুলতে আমরাই এখন অর্থ সাহায্য করব। জেঠামশাই, গান্ধাররাজ কী স্বেচ্ছায় সাহায্য নিতে এখানে রয়েছেন?নাকি আমরাই তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছি ?"[৮]

ধৃতরাষ্ট্রের মত রাখালসুলভ বেপরোয়া মানসিকতা রাষ্ট্র তথা শাসনতন্ত্র চায় না। তাই ভীষ্ম কুরুবংশের রাজা হিসেবে পাণ্ডুর নাম ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে পাণ্ডুকে অশ্বমেধ যজ্ঞের নির্দেশ দেন ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি এই অবিচার অম্বিকা মেনে নিতে পারেনি। রাজতন্ত্র তথা ক্ষমতাতন্ত্রের হিংসাত্মক ও নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ বাক্যে জানিয়েছেন—"রাজপদ পেতে গেলে বুঝি যুদ্ধ, পররাজ্য লুণ্ঠন, অপহরণ অনিবার্য?"[৯]

ভীষ্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে ধৃতরাষ্ট্র। আসলে যুদ্ধবাজ ভীষ্মের বিপরীতে শান্তিকামী ধৃতরাষ্ট্র আস্থা রাখতে পারে না। সন্তানহীনতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে পাণ্ডু যখন হস্তিনারাজ্য ত্যাগ করে, তখন ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রভার দিতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ঘোষণা করে—" কাল প্রতূষে আমায় যদি রাজদণ্ড গ্রহণ করতে হয়, হস্তিনারাজ্যের মানুষ আর কখনও রণহুঙ্কার শুনতে পাবে না।"[১০] এই ঘোষণা সম্পূর্ণ ভীষ্ম-দর্শন বিরোধী।

বংশরক্ষার দিক থেকেও ভীষ্ম দিশেহারা, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অম্বিকা ভীষ্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়: "জীবনের থেকে প্রতিজ্ঞা বড় নয়। জীবন এগিয়ে যায়, প্রতিজ্ঞা এক ঠাই

স্থির থাকে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধকে পেছনে টেনে ধরে।"[১১] ব্যাসের পরামর্শে ভীষ্ম কুন্তীর নিয়োগজাত সন্তানদের পাণ্ডু পুত্র হিসেবে হস্তিনায় স্বাগত জানানোর কথা বললে ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্ট বিরোধিতা করে বলে, "প্রবেশাধিকার পাবে না। পাণ্ডুর পুত্র পরিচয়ে কোনওদিনই পাবে না।"[১২] ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভীষ্ম স্পষ্ট জানিয়ে দেন—"শোনো ধৃতরাষ্ট্র, শোনো বিদুর, আমি আছি পঞ্চ পাণ্ডবের পাশে। হস্তিনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তোমরা যদি তাদের স্বীকৃতি না দাও, তারাই তা কেড়ে নেবে। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেব আমার লক্ষ্যপূরণে !"[১৩]

এই মন্তব্যে ভীষ্ম আরও একটি ক্ষমতার লড়াই এর বীজ পুঁতে দেন। ক্ষমতাতন্ত্রী সবসময় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতে চাই। তাকে কেন্দ্র করে চলে দূরন্ত প্রতিযোগিতা। নাটকে বর্ণিত দুই পক্ষের লড়াই আসলে দুটি মতাদর্শের লড়াই। শকুনির ইঙ্গিতে তা আরও স্পষ্ট"যদি হত সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ, এ বিবাদ এতদূর গড়াতো না। এ বিবাদ দুটি পরস্পরবিরোধী নীতির দুটি বিরোধী দর্শনের।"[১৪]

যুদ্ধবিরোধী ধৃতরাষ্ট্র পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যুদ্ধবাজের ভূমিকা নিয়েছে। নিজের বাহিনী শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য পাতকিনীর সন্তানদের দত্তক নিয়েছে যারা সর্বস্ব হারিয়ে অর্জন করেছে পৈশাচিক শক্তি। এরাই পরে স্বীকৃতি পেয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র হিসেবে। এই পৈশাচিক বাহিনী নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র নেমে পড়েছে ক্ষমতার লড়াইতে জয়ী হতে "পুত্রগণ, আমরা বড় অসহায়, বড় একা, নিরাপত্তাবিহীন। ওই দেবতা, সাধু আর যোদ্ধাদের মিলিত চক্র আমার ধ্বংসে এগিয়ে আসে অস্ত্রের ঝংকার উঠেছে রক্ষা করো বন্য হিংস্রতা নিয়ে, বর্বরতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো! আক্রমণ করো ন্যায়নীতি ধর্মশাস্ত্র সব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো ধ্বংস করো! জয় চাই যে কোনও মূল্যে জয় চাই।"[১৫]

রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ন্যায় নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে বণ্য হিংস্রতা নিয়ে লড়াই এ নামতে চায়, না হলে জয়ী হওয়া যায় না। এখানেই নাটকে যুক্ত হয়ে গেছে সমকালের ব্যঞ্জনা। এ লড়াই তো বর্তমান সময়েও বিদ্যমান। নাটকে উল্লিখিত কৌরব পাণ্ডবের লড়াই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঙ্গলের আদিবাসীদের লড়াই এর কথা এখানে মনে করা যেতে পারে। ক্ষমতার এই লড়াই চিরকালীন। প্রেসিডেন্সিতে দেওয়া মনোজ মিত্রের একটি বক্তব্যের সূত্র ধরে অধ্যাপক ঋতম মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে—"ঐ শতপুত্রের জন্মরহস্য এবং হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির পিছনে জঙ্গলের অবস্থান নিয়ে ভেবেছেন 'যা নেই ভারতে' লেখার আগে। ওই শিশুদের জন্মের সময় জঙ্গল কেন উত্তাল হল, ওদের সঙ্গে জঙ্গলের কী সম্পর্ক আর নষ্ট জরায়ু থেকে কীভাবে সন্তান হতে পারে এইসব ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর তিনি সাজিয়েছেন নাটকে।"[১৬]

'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকটির প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছ কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারকে। নামকরণ থেকে বোঝা যায় রামায়ণের সীতা নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। রামায়ণে বর্ণিত রাম রাবণের যুদ্ধ এখানে গুরুত্ব পেয়েছে ঠিকই,

কিন্তু নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের দক্ষতায় প্রাধান্য পেয়েছে নীতিধর্ম। সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "অতিকথার বিস্তৃত পরিসরে বিচরণ করতে গিয়ে তিনি যেমন নাট্যকারের ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনই আবার বাল্মীকি রামায়ণের বাইরে অন্য রামায়ণের অনুসারী হয়েছেন। কিন্তু সর্বদা তাঁর নাটকের কেন্দ্রে থেকেছে নীতিধর্মের প্রশ্ন।"[১৭]

এই নীতিধর্মের উপর ভিত্তি করে মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই হল নাট্যকারের লক্ষ্য। নাটকের শুরুতে পঞ্চবটী বন ও তাকে ঘিরে এক ভৌগোলিক পরিবেশ নির্মিত হয়েছে। এই স্থান প্রাচীন পক্ষীকূল, রাক্ষস ও বানরদের বনভূমি। আমরা দেখেছি রামায়ণে অতিকথার অন্তরালে সীতার লাঙ্গলদূহিতা (কৃষককন্যা) সত্তাটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। সেই উপেক্ষার জায়গা থেকে নাট্যকার মনোজ মিত্র সীতার কৃষকদূহিতা সত্তাটিকে নাটকের প্রথমে উপস্থাপন করেছেন। যিনি আজন্ম মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার কাছে পঞ্চবটী বনের মায়াময় পরিবেশে মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। রাম ও অন্তঃপুরবাসীদের নিষেধ সত্ত্বেও সীতা যে বনবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল সীতার অরণ্যের প্রতি ভালোবাসা। সে কারণে পঞ্চবটীকে নির্দ্বিধায় মা ডেকে বসে "মাটি গাছপালার সঙ্গে আমার যে নাড়ির যোগ ! কিন্তু বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সবই আমার রাজার বাড়ি ! পঞ্চবটীতে এসে সেই সম্পর্কটা আবার ফিরে পেলাম ! ফিরে পেলাম মায়ের গন্ধ"[১৮] পঞ্চবটীর মাটি, গাছপাল্লা ও প্রকৃতির টানই শূর্পনখাকে সীতার সঙ্গে সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে "পঞ্চবটীকে যে মা ডাকে, সে যেই হোক, সে আমার প্রাণের সখী। আয় সখী আমার বুকে আয়।"[১৯]

এই সখ্যের দাবিতে শূর্পনখা সীতার কাছে উন্মোচন করে রাম লক্ষ্মণের আসল উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যমণ্ডিত রাম-রাবণের যুদ্ধে ধর্ম-অধর্মের ধারণা পাল্টে গিয়ে পরিণত হয় পেশি শক্তি আস্ফালনের যুদ্ধে। সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে পঞ্চবটীতে আগমন ঘটে রাম-লক্ষ্মণের—"তোমার স্বামীর মূল উদ্দেশ্য শূর্পনখার পঞ্চবটী রাজ্যটিকে হস্তগত করা।"২০

শূর্পনখার এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রাম শুধুমাত্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসেনি, তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সে সর্বত্যাগীর বেশ ধরে রাজ্য জয়ে নেমেছে অনার্য শক্তির বিনাস ঘটিয়ে আর্যায়ণের লক্ষ্যে। এই ভাবনাটি স্পষ্ট করেছে শূর্পনখা—"পিতৃসত্যপালনে যিনি একবস্ত্রে বনবাসে আসছেন তার পিছু পিছু অযোধ্যার মালবাহকেরা কেন রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্রের পেটিকা বয়ে এনেছিল বলতে পারো? সারিবাঁধা শকটে অস্ত্র ঢাকা দেওয়া ছিল কেন সীতা ?"[২১]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন একের পর এক রাজ্য জয় করে, তেমনি আর্যপুত্র রাম বনবাসী তকমা লাগিয়ে পঞ্চবটীতে ঢুকে প্রথমেই রাক্ষস হত্যা করে সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লক্ষ্য সসাগরা ধরিত্রীর অধিশ্বর হওয়া। সে কারণে রাম বনবাসী হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেছে নিজেই—"অলস দিন কাটাতে আমি বনবাসে আসিনি সীতা। শুধু পঞ্চবটী কেন, বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের এই দণ্ডকারণ্য অধিকার করবো"[২২]

প্রশ্ন ওঠে এ রাম কোন রাম ? কোথায় রামের আদর্শ? নাট্যকার বুঝিয়ে দেন এ রাম যুদ্ধবাজ, অবিবেচক, স্বার্থপর। রাজ্য জয়ই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। শরভঙ্গের কাছে সীতা জানতে পেরেছে—"পিতার ইচ্ছায় সিংহাসনটি কনিষ্ঠকে দিয়ে বনে আসাটা যেমন পিতৃ সত্যপালন, আবার বনবাসে এসে পিতার সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করাটাও আর একরকম পিতৃসত্যপালন। বৃদ্ধ রাজা দশরথের বুদ্ধিশুদ্ধি পরিপক্ক। পুত্রকে বনবাসে পাঠিয়ে অস্ত্রশালাটি ঠিক খুলে দিয়েছিলেন"[২৩]

নাটকের পরবর্তী অংশে আমরা খুঁজে পাই অপমানিত ক্ষুব্ধ রাবণকে। যে রাবণ স্বর্গে যাবার অতিপ্রায়ে রুদ্রাক্ষের মালা জপে চলেছে। এক হাতে জপের মালা, আর হাতে খড়গ, একদিকে স্বর্গের সিড়ি বেয়ে অনার্যবিজয় অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতিশোধ এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে রাবণ শূর্পনখাকে বোঝানোর চেষ্টা করে—"দ্যাখ বোন কখনও কখনও অস্ত্রেও ক্লান্তি আসে বরং শান্তভাবে স্বর্গের সিড়িটা গড়ে যদি হেঁটে গিয়ে স্বর্গ বিজয় সমাধা করতে পারি আর্যজাতির সাধ্য হবে না বিন্ধ্যপর্বতের এপারে সাম্রাজ্যবিস্তারের কিংবা অনার্যের কেশস্পর্শ করার কিংবা তাকে হেয় জ্ঞান করার।"[২৪]

বোন শূর্পনখার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে রাবণ নিজের ভাবনা পাল্টে ফেলেছে। বোনের অপমান এবং পঞ্চবটী ফিরিয়ে দেওয়ার অভিলাস পূরণ করতে রাবণ নিজের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। তার স্পষ্ট বক্তব্য: "রক্তের বদলে রক্ত চাই"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধবিরোধী রাবণকেই খুঁজে পাই"বোন, এমন একটা সময়ে তুই এলি, যখন যুদ্ধে আমার মন মতি নেই। আমি মাঝে মাঝে গর্জন ছাড়ি বটে, লোকে ভয় পাচ্ছে, তবে আমার কাছে তার কোনও অর্থ নেই।"[২৫]

এর বিপরীতে আমরা বরং যুদ্ধবাজ রামকেই বেশি করে খুঁজে পাই। তার জন্য প্রয়োজন হয় মায়াসীতার। সে যুদ্ধবাজ রামকে এগিয়ে দেয় যুদ্ধে। এই অংশে নাটকীয় দ্বন্দ্বের মধ্যে রামের চক্রান্তের এক একটি পর্দা ফাঁস হয়। মায়াসীতার বিপরীতে নাট্যকার হাজির করেন প্রতিবাদী সীতাকে। তিনি মায়াসীতার মত পুতুল নন, রক্ত মাংসের নারী। রামের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার সাফ কথা—"আমি তোমাকে পঞ্চবটীতে রক্ত ঝড়াতে দেব না কারও ভূমি দখল করতে দেব না ওই পুতুলটা নিশ্চয়ই তা দেবে! সত্যি বলো রাম, এই পথের কাঁটা সরিয়ে তুমি ওই পুতুলটাকে নিয়ে থাকতে চাও?"[২৬]

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মায়াসীতা নয়, স্বর্ণলঙ্কায় পৌঁছায় আসল সীতা। কিন্তু সীতার হার না মানা জিদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় রাবণ। সীতা নিঃশর্ত মুক্তি পায়। ভেলায় ভাসতে ভাসতে আবার পঞ্চবটীতে ফিরে আসে। শেষ দৃশ্যে সীতার মুক্তি জরাগ্রস্থ সম্পাতিকেও নতুন করে শক্তি জোগায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভূমিসূতার মত সেও বলে ওঠে—"আমার যদি শক্তি থাকত মা, এখুনি আকাশে ওড়ে ওড়ে পঞ্চবটীতে জাগিয়ে দিতাম। (জোরে)

ওগো শোনো আমাদের সীতা মা ফিরেছেও সোনার হরিণেরা আমাদের সীতা মা ফিরেছেও মাটি মাখা হাঁসেরা দেখে যা রে তোরা, দেখে যা"[২৭] কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যুদ্ধ নয়, রাজ্য জয়ের চক্রান্তে পুনরায় ভাসতে হয় সীতাকে।

ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়োজনে নারীত্বের অবমাননা পুরুষের কাছে তুচ্ছ। নাটকটি শেষ হয়েছে একটি দৃশ্যপটের ব্যঞ্জনায়—"সীতার মুখের উপর ছায়া কাঁপছে, যেন ভেলায় ভাসছে সে।"[২৮] বোঝা যায় শক্তি, রাগ, সুখ, ভালোবাসার অভাবে সীতার ভেলায় ভেসে যাওয়াই নিয়তি। আলোচ্য নাটকে সীতা যেন একালের নারীর প্রতিনিধি, অন্যদিকে রামের সাম্রাজ্য বিস্তার যেন ক্ষমতালাভের অনুষঙ্গ। রাবণ হলেন একজন সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ।

রামায়ণ ও মহাভারতের বিনির্মান প্রসঙ্গে মনোজ মিত্রের 'ভেলায় ভাসে সীতা' এবং 'যা নেই ভারতে' এই দুটি নাটকে প্লট এবং চরিত্রের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি ক্ষমতার রাজনীতির নগ্ন রূপটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। গ্রামশি তাঁর 'Selection from the Prison Notebook' গ্রন্থে বুর্জোয়া শ্রেণিকে 'হেজেমনি' এবং প্রলেতারিয়েতকে 'সাবলর্টান' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন কর্তৃত্ব থাকবে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে, বাইরে থেকে শ্রমিক শ্রেণি বিকল্প সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাবে। 'যা নেই ভারতে' নাটকে ধৃতরাষ্ট্র তার শতপুত্র নিয়ে বিকল্প প্রতিষ্ঠার লড়াই চালায়। আবার 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকে সীতা রামের কাছে ফিরে এসেও পুনরায় একা লঙ্কা ফিরে যায়। এও যেন একক মানবতার লড়াই।

ফুকো ক্ষমতার তিনটি পৃথক স্তরের কথা বলেন—সার্বভৌমত্ব, অনুশাসন এবং প্রশাসনিকতা। রাষ্ট্র যেমন তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীতেমনি অনুশাসনতন্ত্র এবং প্রশাসনিকতায় তার ক্ষমতার জাল সর্বত্র বিস্তার করে রাখে। আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট আধার বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই। রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলেও আধুনিক ধনতন্ত্রে ক্ষমতাতন্ত্র একইভাবে চলতে থাকবে। তাহলে বোঝা যায় যে, ক্ষমতার মুঠো থেকে আধুনিক সমাজবদ্ধ মানুষের মুক্তি নেই।

আধুনিক সমাজে ক্ষমতা তার প্রয়োগ হয় বিশেষ জায়গায়, বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা এবং বিশেষ ব্যক্তির উপরে। তাই হয়তো 'যা নেই ভারতে' নাটকে ধৃতরাষ্ট্র রণহুঙ্কার চায় না, ধ্বংস চায় না, হিংসা চায় না, অশ্বমেধ চায় নাশেষ পর্যন্ত পৈশাচিক জয়ের উল্লাস করেছে শতপুত্রের কাছে। আসলে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দৈহিক ও মানসিক শোষণ থেকে বেরোবার পথ আমাদের কারোরই জানা নেই। 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকে সীতা অবশ্য অনেকটা মানবতার পথের যাত্রী। ক্ষমতার রাজনীতিতে ক্ষমতার কাঁধ বদল ঘটে, কিন্তু পালাবদল ঘটে না। ক্ষমতার মূলে থেকে যায় প্রভুত্বের অধিকার, কর্তৃত্বের অধিকার এবং শাসনের অধিকার। এই অধিকারকে কেন্দ্র করেই শাসক আর শাসিতের মধ্যে নিরন্তর ক্ষমতার লড়াই চলে। নাট্যকার মনোজ মিত্র আলোচ্য দুটি নাটকে যেমন ক্ষমতা দখলের

রাজনীতিকে দেখিয়েছেনতেমনি যুদ্ধ, হত্যা, রক্তপাতের বিপরীতে সুস্থ মানবসমাজ গড়ার লক্ষ্যে মানবতার জয়গানও গেয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখবন্ধ, মনোজ মিত্র, রামায়ণী মহাভারতী, দে'জ, ২০১৯, পৃ- বারো

২) মনোজ মিত্র, যা নেই ভারতে, রামায়ণী মহাভারতী, দে'জ, ২০১৯, পৃ- ৭১

৩) তদেব, পৃ- ৭৪

৪) তদেব, পৃ- ৭৫

৫) তদেব, পৃ- ৭৫

৬) তদেব, পৃ- ৭৭

৭) তদেব, পৃ- ৮২

৮) তদেব, পৃ- ৮৩

৯) তদেব, পৃ- ৮৫

১০) তদেব, পৃ- ৯৯

১১) তদেব, পৃ- ১০০

১২) তদেব, পৃ- ১০৭

১৩) তদেব, পৃ- ১০৮

১৪) তদেব, পৃ- ১০৯

১৫) তদেব, পৃ- ১১১

১৬) ঋতম মুখোপাধ্যায়, যা নেই ভারতে : বিবাদ দুটি বিরোধী দর্শনের, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় (সম্পা), মনোজ মিত্র : নানা বর্ণে নানা রঙে, দিয়া, জুন, ২০২২, পৃ- ২৮৯

১৭) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখবন্ধ, রামায়ণী মহাভারতী, পৃ- আট

১৮) ভেলায় ভাসে সীতা, রামায়ণী মহাভারতী, পৃ- ১১৮

১৯) তদেব, পৃ- ১১৮

২০) তদেব, পৃ- ১১৯

২১) তদেব, পৃ- ১১৯

২২) তদেব, পৃ- ১২৩

২৩) তদেব, পৃ- ১২৪

২৪) তদেব, পৃ- ১২৮

২৫) তদেব, পৃ- ১২৭

২৬) তদেব, পৃ- ১৩৬

২৭) তদেব, পৃ- ১৫৪

২৮) তদেব, পৃ- ১৫৬

সাক্ষাৎকার :

কিংবদন্তী নাট্য ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র-র সাক্ষাৎকার ঃ অনলাইনে সাক্ষাৎগ্রহণে সৌরভ চট্টোপাধ্যায়

সৌরভ।। সুইনহো ই-হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্র।। আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আপনাদের জন্য এবং আপনাদের সব পাঠকদের জন্য।

সৌরভ।। ধন্যবাদ। আজ আমরা সুইনহো স্ট্রিট পত্রিকার পক্ষ থেকে এই গৃহবন্দি অবস্থাতেই সুইনহো ই-হাউসের 'কথায় কথায়' ওয়েব পেজের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে আপনার কাছে উপস্থিত। আজ আলাপচারিতায় আপনার কাছ থেকে জেনে নেব আমাদের অনেক অজানা। অনেক অন্ধকার পাবে আলো।

আমরা জানি আপনি এবং সুন্দরম অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুন্দরমের সাথে আপনি কাটিয়েছেন সাত দশকেরও বেশি কিছু সময়। সুন্দরমের সূচনালগ্নকালীন বাংলা থিয়েটারের প্রেক্ষাপট নিয়ে যদি কিছু বলেন।

মনোজ মিত্র।। এই নাটকের দলটা তৈরী করেছিলাম আমরা ১৯৫৭ সালে। তখন আমরা স্কটিশচার্চ কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। আমরা থিয়েটার করতাম। তখন আমাদের কাছাকাছি ছিল বিশ্বরূপা থিয়েটার। বিশ্বরূপা বা শ্রীরঙ্গম। গোড়াতে শ্রীরঙ্গম ছিল। প্রথম যখন থিয়েটার করতে যাই, পরে সেটা বিশ্বরূপা থিয়েটার নাম হয়। বোধ হয় ১৯৫৮-৫৯ সাল। শ্রীরঙ্গমের চেহারাটা খুব খারাপ ছিল। যদিও সেখানে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আমার একটা কথা মনে আছে, সেটা আমি লিখেওছি দু'চারটে জায়গায়। আপনাদের বলতে কোন অসুবিধা নেই। আমি আর আমার বন্ধু পার্থপ্রতীম চৌধুরী, পরে ফিল্ম ডিরেক্ট করেছিল, এই সুন্দরম নাটকের দলের মধ্যেই ছিল, দলের সে-ই ডিরেক্টর ছিল এবং অনেক নাটক করেছে। আমি তো গোড়ার দিকে নাটকই করতাম না। অভিনয়টা করতাম, নাটক লিখতাম টিখতাম না। তা একদিন, সেদিন থিয়েটার আছে শ্রীরঙ্গমে। একেবারেই গোড়ার দিকে... তা ১৯৫৫ সাল হবে। আমরা যখন থিয়েটারে ঢুকছি, অতি উৎসাহী লোকেরা একটু আগেই থিয়েটারে চলে যায়। আমরা একটু আগে চলে গেছি, তখন দুপুর গড়িয়ে। হয়তো তিনটেতে চলে গেছি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। আর বিশ্বরূপা কোথায় ছিল জানেন তো? ওটা ছিল রাজা রাজকৃষ্ণ মিত্র স্ট্রিটে। হাতি বাগানে রূপবাণী সিনেমার পাশ দিয়ে ঢুকতে হয়। ওই গলিটার মধ্যে ছিল। যে গলিটার মধ্যে বিশ্বরূপা, সেই গলিটার মধ্যেই সারকারিনা। সেই গলিতেই বিজন থিয়েটার পরে রঙ্গনা। আমরা যখন যাচ্ছি, তখন ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।

আর শ্রীরঙ্গমটা প্রথমে ছিল একটা জংলা যায়গায়। প্রথমটায় মানে ঢুকতেই। তার ওপাশে পুরোনো একটা বাড়ি। মনে হতো থিয়েটার বা অন্য কিছু। আর রাজকৃষ্ণ মিত্র স্ট্রিটের মুখের কাছটায় রাস্তার থেকে বেশ কিছুটা দুরে ছিল শ্রীরঙ্গম। মুখের কাছটাতে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো একটা খিলান ছিল। তার পাশে একটা কুঠুরি, সেটার খুব দীন দশা। জলও জমতো। সেখান থেকে থিয়েটারে পৌঁছাতে গেলে কতগুলি ইট পাতা ছিল। ওই পাতা ইটের মধ্য দিয়ে যেতে হত। যেখানে বিশ্বরূপা থিয়েটারের বাড়িটাড়ি হয়েছিল, সামনের দিকটা গাড়িটারি রাখবার জায়গা ছিল। সেসব অনেক পরে। ওখান থেকেই জঙ্গল ছিল। ওই খিলানের নীচে দিয়ে গেলে জঙ্গলের মধ্যে ইট পাতা ছিল, তার মধ্যে পা দিয়ে দিয়ে আমি আর পার্থ যাচ্ছি। আমি তখন বেশিদিন কলকাতায় আসিনি। আমি কলকাতায় এসেছি ৫৪ এর শেষের দিকে। যখন আমি কলেজে পড়তে এলাম। তো পার্থকে আমি বলছি যে, এ-মা এই জায়গায় শিশির ভাদুড়ী থিয়েটার করেন! এখনটায়! হঠাৎ পিছন থেকে একটা গুরু গম্ভীর আওয়াজ এলো, "আমাদের টপকে টপকে যাচ্ছে, হ্যাঁ হে ছোকরা। কলকাতা শহরে ঠিক এইখানটাতে শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করেন। এই মঞ্চে।" আমি ফিরে তাকাতে যাব পার্থ প্রায় টেনে নিয়ে আমাকে ভিতরে চলে এলো। বললো, তুই কী রে ব্যাটা কোথায় কার দিকে তাকাচ্ছিস বুঝতে পারছিস! আমি বললাম না। ও বলল ওই তো শিশির ভাদুড়ী। আমি বললাম তা—ই! আমার আর দেখা হলো না শিশির ভাদুড়ী। আর ভেতরটা কি অন্ধকার। পর্দাটা ছেঁড়া। কী অবস্থায় থিয়েটার ছিল! ইংরেজরা চলে যাবার পর প্রথম ১০ বছর তো কিছু গড়ে ওঠেনি। সেই প্রথম শ্রীরঙ্গম ভেঙেচুরে রাসবিহারী সরকার মশাইরা বিশ্বরূপা গড়ে তুললেন। আমি যখন কলকাতায় এলাম, আমার থিয়েটারের সূত্রপাতে কলকাতার থিয়েটারের চেহারাটা এরকমই ছিল। স্টার থিয়েটার দেখতে ভালো ছিল। রাস্তার উপরে ছিল। আর ওদিকে মির্নাভা। আর রঙমহল-এর সামনে তখন দোকান পাট।

সৌরভ।। নতুন একটা থিয়েটার দল 'সুন্দরম'র ভাবনা এলো কিভাবে?

মনোজ মিত্র।। আমরা দলটা তৈরি করলাম ফাস্ট ইয়ারে এসে। স্কটিশে থিয়েটার হওয়ার একটা ঐতিহ্য ছিল। ছিল এই কারণে যে এখানে আর কেউ না—শিশিরকুমার ভাদুড়ী এখানকার ছাত্র ছিলেন। তার আগে ছিলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ। নাটক লিখতেন, বাংলা থিয়েটারে অসাধারণ সব নাটক লিখে গেছেন। সেটা ১৯০০ সালে। তো এখানকার মাস্টারমশাইরা উৎসাহী ছিলেন। একজন ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজে নাটক লিখেছিলেন। রঙমহল থিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল। তখন আমরা বড় বড় ছাত্র, হয় ফোর্থ ইয়ারে পড়ি বা এম এ ক্লাসে। তা ওখানকার মাস্টারমশাইদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, একটা থিয়েটারের ঝোঁক ছিল এবং আমরা যখন কলেজে ভর্তি হই প্রত্যেকটা ক্লাসের আলাদা থিয়েটার ছিল। প্রত্যেকটা ক্লাসের। ফার্স্ট ইয়ার আর্টস, ফার্স্ট ইয়ার সাইন্স। প্রত্যেকটা বিভাগের বছরে একটা করে থিয়েটার। এবং সেখানে মাস্টারমশাইদের

পার্টিসিপেশনও থাকতো। তারা হয়তো ছাত্রদের সঙ্গে অভিনয়ও করতেন। আমাদের সময় একজন নাট্যকার ছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ মশাই।

সৌরভ ।। আপনার গবেষণা যে আপনি অসম্পূর্ণ রেখে ছিলেন, 'সুন্দরমে'র অ্যাটাচমেন্ট কি তার কারণ?

মনোজ মিত্র ।। সুন্দরমকে দোষ দেব না। থিয়েটারে আসাটা কারণ। থিয়েটারে আসা মানে সন্ধ্যেবেলা আটকে থাকা। সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল দেওয়া। তারপর থিয়েটার নাটক লেখা শুরু করি। '৫৯ থেকে। মাষ্টারমশাইরা বলতেন গবেষণাটা করো। তা প্রথমবার গবেষণা চলাকালীন মাস্টারমশাই মারা গেলেন। প্রীতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তখন আমি এথিক্স এর গবেষণা করছিলাম। তারপরে আমি অনেকদিন কিছু করিনি। তারপর সাধন ভট্টাচার্য। আমি তখন এসথেটিক্স পড়ছিলাম। এম এ ক্লাসে পড়ার সময় আমি এসথেটিক্স নিয়েছিলাম যা কেউ নেয় না। শিল্পবিদ্যা বা সৌন্দর্য বিদ্যা বা শিল্প সৌন্দর্য বিকাশ। তা সেই মাস্টারমশাই তিনিও মারা গেলেন। উনি খুব নাম করা লোক ছিলেন। উনি অল্পদিন পড়িয়েছিলেন আমায়। খুব স্যাড ডেথ। তা যাই হোক উনি মারা যাবার পর আর আমি করিনি। সাধনবাবুর সাথেই কাজ শুরু করেছিলাম। সাধনবাবু ছিলেন বাংলা সাহিত্যের। কিন্তু ওনার এসথেটিক্সের উপর পড়াশুনা ছিল। তা সেই সূত্রে তিনি আমায় নিয়েছিলেন। উনিই নিজেই বলেছিলেন তুমি আমার কাছে করো। আমি একদিন ওনার সাথে আলোচনা করেছিলাম তাতে উনি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমি প্রথম যে নাটকটা লিখি সেটা '৫৯-এ লিখেছিলাম। তখন আমি এম এ পড়ি। তারপর '৬০-এ সেটা অভিনয় হয়েছিল। রবীন্দ্রভবনে। অভিনয় হয়েছিল আমাদের পরীক্ষার সময়। সাধনবাবু দেখে বললেন, 'তুমি পড়? তুমি দেখতে আসবে?' বললাম, আমাকে দেখতে ডাকেন তো আসবো। দেখতে পেলে তো আমার ভালোই লাগবে। ঐ নাটকটা তো আমি অভিনয়ও করেছিলাম থিয়েটার সেন্টারে।

সৌরভ ।। অহীন্দ্র চৌধুরী আপনার নাটক দেখে প্রশংসা করেছিলেন শুনেছি. . .

মনোজ মিত্র ।। হ্যাঁ, এই থিয়েটার সেন্টারে। থিয়েটার সেন্টারে বিচারক হিসাবে অনেকেই ছিলেন তার মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী মশাইও ছিলেন। এবং তৎকালীন আরো অনেক নামকরা অভিনেতা ও নাট্যকার সব ছিলেন। আমার খুব হেভি মেকআপ ছিল। অনেকক্ষণ ধরে তুলতে হয়। মুখে তুলো লাগিয়ে লাগিয়ে মেকআপ করা হয়। সে মেকআপ এখন আর কেউ করতে পারেন না। অনন্ত দাস নামে একজন সত্যজিৎ বাবুর ২৪টা ছবির মেকআপ করেছিলেন। সে আমাদের বন্ধু লোক ছিল। সে আমাদের মেকআপ করতো। সে আমার মেকআপটা করেছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী বললেন, "এ রকম মেকআপ ছেলেপিলে করেছে আমার তো বিশ্বাসই হয় না। কোন ছাত্র করেছে? দেখি আমায় একটু দেখাও তো।" বলে উনি বাইরে বসে ছিলেন। লবিতে। প্রায় ৪৫ মিনিট লেগেছিল সেটা তুলতে। সেটা না তুলে

যাওয়াও যায় না। মুখে সে সব লেগে থাকে। তা অহীন্দ্র চৌধুরী প্রথমে চিনতে পারেননি। বললেন, তা সে তাকে আনলে না? তা অনন্ত বলল এই তো। তা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বয়স কত? থিয়েটারে কোন অভিনেতাকে আমি এরকম দেখিনি। থিয়েটারে কোন অভিনেতাকে আমি দেখিনি যে সে পরের কথাটা জানে না। আগের কথাটা বলতে বলতে আবার অন্য কথার মধ্যে যাচ্ছে। সে জানে না এটা কখনো হয় না। সে সবটা জানে সবটা মুখস্ত করে গেছে। তোমায় দেখে আমার মনে হচ্ছিল না তুমি মুখস্ত করে গেছো। তুমি একটা কথা থেকে আরেকটা কথা বলছো। বলছো খুব সংযোগ করে। কিন্তু এটাই হচ্ছে কৃতিত্ব যে তুমি বুঝতে দিচ্ছ না যে এটা তোমার জানা।

সৌরভ ।। আপনার ওই বয়সে সেটা এক বড় প্রাপ্তি।

মনোজ মিত্র ।। হ্যাঁ, আমার অদ্ভুত লেগেছিল। অদ্ভুত লেগেছিল। তিনি আরো বলেছিলেন যে একটা অসুস্থ লোক খাট থেকে নামলো আর তার পায়ের আঙুলগুলো খুলতে লাগলো তা আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি। আমরা বুড়োরাই করতে পারি না।

সৌরভ ।। আপনার নতুন একটা নাটক এই মার্চে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। লকডাউনের কারণে সেটা আটকে গেল। আবার কবে বা কখন সেটা সম্ভবপর হবে ... সেটাও তো অনিশ্চিত. . .

মনোজ মিত্র ।। এখন প্রতিদিনই দুপুর বেলা রিহার্সাল দিচ্ছি। টেলিফোনে। গতকাল যেমন দেওয়া গেল না। অনেক সময় লাইন কেটে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব ডিসটার্ব। অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা। আবার রিহার্সাল দেবো।

সৌরভ ।। এই যে একটা প্রোগ্রাম প্লান করা ছিল যা ভেস্তে গেল, তার জন্য মন খারাপ করছে না?

মনোজ মিত্র।। অনেকে তো কান্নাকাটি করছে। তিনটি দলের থিয়েটার একসাথে হওয়ার কথা ছিল। বিভাসদের, মেঘনাদদের আর আমাদের। ২৬, ২৭, ২৮ মার্চ। এই তিনদিন হওয়ার কথা ছিল মধুসূদন মঞ্চে। তা এখন আবার ঠিক করেছে সব এই তিনটি নাটক নিয়েই আবার আমরা করবো প্রথম যখন খুলবে।

সৌরভ।। এই ক্রাইসিস চলে যাবার পরে?

মনোজ মিত্র ।। কিন্তু এই ক্রাইসিস ওভার করার পর তো আরো বড় ক্রাইসিস। তিনটি লোক তো পাশাপাশি বসতে পারবে না।

সৌরভ।। বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে আপনি এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। আপনি নাট্যকার, আপনি পরিচালক, আপনি অভিনেতা, আপনি অধ্যাপক, আবার আপনি নানান প্রশাসনিক দায়িত্বভারও সামলাচ্ছেন। একসাথে এতগুলো কাজ, কষ্ট হয় না!

মনোজ মিত্র।। সবই মূলত একই কাজ। নাটকের দল চালানো, নাটক করা বা বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার দেখা এগুলো করলেই আমার মনে হয় যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে। সব মানুষ। দিন না বিভাসকে দিন। আমাদের এখানে তো এমন নয় যে প্রত্যেক বিভাগে আলাদা আলাদা লোক। আমাদের কলকাতার থিয়েটারে যিনি ডিরেক্টর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনিই নাটক রচনা করেন ভাল মন্দ যাই হোক না কেন। এবং তিনিই মূল অভিনয় করেন। আবার তিনিই অ্যাডমিনিসট্রেসন দেখেন। এ সব তাকে করতে হয় এবং যাদের সাথে করতে হয় তাদের সাথে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে করতে হয়। আরেকটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে টাকা না দিয়েই আমরা অভিনয় করি। বা কাউকে দিলেও সামান্য টাকা দিই। ফলে অনেক কলাকৌশল করে করতে হয়। সেটা আপনিও থিয়েটার করতে গেলেই বুঝতে পারবেন। কতরকম চালাকি করে কতরকম অ্যাড্জাস্টমেন্ট করে করতে হয়।

সৌরভ।। আপনার নাটক তো শুধু সুন্দরম নয়, বাংলার বিভিন্ন নাটকের গোষ্ঠীর কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছে। অন্যের ভাবনায় আপনার নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখতে আপনার কেমন লাগে?

মনোজ মিত্র ।। আমার তো ভালো লাগে বেশ। খুবই ভালো লাগে। বিভাসরা যখন করেছিল 'নরক গুলজার', কুমারদা যখন করেছিল 'রাজদর্শন' ... আমি সবসময় ... অন্যদের করাটা আমার ভালো লেগেছে। আমি দেখতে গিয়েছি। সৌমিত্রদা করেছিল 'শরৎশশী' তপন থিয়েটারে। অনেকদিন চলেছিল। বা বাংলাদেশে গিয়েছি। ওরাও 'শরৎশশী' করেছিল। একই সঙ্গে দুটি নাটক এখানে দেখে গেলাম আবার ওখানে গিয়েও দেখলাম। বাংলাদেশের একটা নিজস্বতা আছে। বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো ... তাদের একটা নিজস্বতা আছে। তাদের লেখার ভঙ্গি আলাদা। আমাদের সাথে মেলেই না। কাহিনি বিন্যাসগুলো বেশ অন্য রকম। মানে চমৎকার। আমি আগে পড়েছি। কিন্তু ইদানিং বছর দু'তিন পত্রিকাগুলো পড়তে গেলে অবাক হয়ে যাই। আমি তো বাংলাদেশের ছেলে। ছেলেবেলায় চলে এসেছিলাম তো এই

বাংলায়। এত লেখা, এত ভাবনা চিন্তা ঘটে গেছে। এটা একটা বৈপ্লবিক কান্ড স্বাধীন বাংলাদেশে। নাট্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। অসাধারণ। বাংলা নাট্যসাহিত্য খুব সমৃদ্ধশালী।

সৌরভ।। শিল্পের যে নানা প্রকাশভঙ্গি, মানে নাটক, গান, কবিতা, ছবি এদের পারস্পিরক সম্পর্ক —এই বিষয়ে আপনার মতামত কী? এই যেমন নাটকে গানের ব্যবহার, তেমনই অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে নাটক কতটা জুড়ে আছে?

মনোজ মিত্র ।। যেটা যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তার সম্পর্কটা সবথেকে বেশি। যেখানে যেটার প্রয়োজন নেই সেখানে সেটা ব্যবহার করলে বিসদৃশ লাগবে বা ভালো লাগবে না। নাটক এমন একটা জায়গা যেখানে প্রয়োগটা যদি ঠিকঠাক হয়, যাকে দরকার হয় সে যদি দাঁড়ায়, তখন সেটা সুন্দর লাগবে। সব বাংলা নাটকে যদি গান দেওয়া হয় তাহলে কি সেটা ভালো লাগবে! লাগবে না। যেটা সম্ভব না সেটাকে যদি সম্ভব করতে চান তাহলে উৎকট কান্ড লাগবে। ধরুন ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমাকে বলেছিল মঞ্চে ওঠার আগে ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, তার শব্দ হচ্ছে। এখন আপনি যদি ঘোড়ার গাড়ি মঞ্চের উপরে তুলতে যান তাহলে গোটা নাটকটাই আর হবে না। তবে নাটকে গান বাজনা আলো এগুলো মাস্ট। নাটকে এগুলোর একটা কনট্রিবিউশন আছে।

সৌরভ ।। আপনি মঞ্চ থেকে বড় পর্দায় কেন এবং কীভাবে? মঞ্চে এমন কী পাচ্ছিলেন না যার জন্য বড়পর্দায় যেতে হল?

মনোজ মিত্র ।। না না তেমন কিছু ব্যাপার না। আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। আমার কোন আসার পরিকল্পনাই ছিল না। বড় পর্দার সাথে আমার কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছা কোন ভাবনাচিন্তাই ছিল না। আমি ফিল্মমেকিং দেখতেও কোনদিন যাইনি। টালিগঞ্জ পাড়াতেও কোনদিন যাইনি। আমাকে যখন তপনবাবু বললেন, আমি এন টি টু তে থাকব, আপনি একটু আসতে পারবেন? কথা আছে একটু। আমি বললাম এন টি টু কি? উনি চুপ করে রইলেন। ওনার অদ্ভুত রসিকতা ছিল। প্রচ্ছন্ন রসিকতা ছিল। চুপ করে থেকে বললেন, আপনি জানেন না বোধহয়। আমি বললাম কোনো দোকান পাট? এলো উনি বললেন হ্যাঁ—দোকানই। আপনি আসুন না দোকানে। পরে এই নিয়ে কতবার যে কথা শুনিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি উনি

আমাদের থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন। সেদিন কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি! দর্শকও নেই বেশি। আমরা ঢিলেঢালা অভিনয় করছিলাম। মাঝখানে ইন্টারভ্যালে একজন এসে বলল, তপন সিনহা আর অরুন্ধুতি দেবী এসেছেন। তখন আমরা ন্যাচারালি আবার সঠিক ভাবে অভিনয় করতে শুরু করলাম। শো এর পরে, উনি খুব কম কথা বলতেন, ভেতরে এলেন। বললেন, বসবো না ভাই। আমরা বললাম, আমাদের হাত পা কাদা লাগা পা ছুঁতে পারছি না, কাদা লেগে যাবে। বললেন, আপনি খুব ভালো করেছেন। এটা আমি জানাতে এলাম। আমার বড়ো ভালো লেগেছে। থিয়েটারে এরকম অভিনয় হয় আমি জানতাম না। বলে চলে গেলেন। পরের দিন ভোর বেলায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ও আমাদের বেলগাছিয়ার বাড়িতে এসে বললেন, আপনাকে তপনদা দেখা করতে বলেছেন। তা বললাম কোথায় দেখা করবো? বললেন, আপনি বরং আজ একটা টেলিফোন করে জেনে নেবেন। তা বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। আমি কলেজে গিয়ে টেলিফোন করবো। তা কলেজে গিয়ে একটা দুটো ক্লাস করে প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে টেলিফোন করলাম। তখন তো টেলিফোন এত বেশি সবার পকেটে থাকতো না। ফোন করলুম। যেই আমার নাম বললাম, আপনার সাথে আমার কালকে থিয়েটারে কথা হয়েছিল। বললেন, আমাদের স্টুডিওতে আসতে পারবেন? আমি বললাম এন টি টু কী? কোথায় এটা? উনি চুপ করে রইলেন। খুব রসিক লোক। বললেন, এক কাজ করুন গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার বাড়িতে আসুন ওখান থেকে এক মিনিট লাগবে। আমি বললাম না না আপনার বাড়ি আমি চিনি। তা যাবখন চলে। তারপর গেছি। তারপর ক্লাস-টেলাস করে তিনটের সময় ওনার বাড়ি গিয়েছি। অনেক সময় ধরে অনেক রকম কথাটথা হলো। তারপর কথাটথা হওয়ার পর বললেন, আমি এরকম ভাবছিলাম যে ছবি করব। আপনি রাজি আছেন? তারপর উনি বললেন, আপনি যে বসে বসে অভিনয় করছিলেন, এরকম করলে ফিল্ম জমবে। আমি বললাম, ফিল্মের ব্যাপার আমি বলতে পারব না। আমি বললাম বাঞ্ছারাম করছেন কে? বললেন, দিল্লিতে হলে আমি অবশ্যই রাজকাপুরকে নিতাম। আর আমি জমিদার হিসেবে নিতাম উত্তমকুমারকে। আমি বলেও এসেছি। সে খুব উৎসাহিত। আমি বললাম, বাঞ্ছারাম কালীদা করবেন কি? উনি বললেন কাকে দেওয়া যায় ভাবছি। তারপর বললেন, যে প্রডিউসার সে তাড়াতাড়ি কেনাকাটি করতে চায়। কেনাকাটির ব্যাপারে সেটা কি হবে? আমি তো জানিনা। আমি তো কোনদিন বিক্রি করিনি। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আপনারা যা করবেন করে নেবেন। বললেন ঠিক আছে। আমি যখন নেমে আসছি, সন্ধে হয়ে গেছে। দলে যাব। দলটা সাউথে। আমি সিঁড়ি থেকে পা দিয়েছি। ভীষণ রসিক লোক ছিলেন। হঠাৎ পিছনে একটা হাত কাঁধে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, যে তালে ওই কথা রইল? আমি বললাম কী কথা! বললেন, আপনি ছবি করছেন। না হলে

কিন্তু আমি ছবি করব না। এবং সবচেয়ে বড় রোলটাই আপনাকে করতে হবে। যেহেতু আপনাকে প্রতিদিনই চাই।

সৌরভ ।। বড়পর্দা, ছোটপর্দা, মঞ্চ সব জায়গাতেই আপনি সফল। কিন্তু আপনার সবথেকে বেশি ভালো লাগে কোনটি?

মনোজ মিত্র ।। আমার ভালোবাসার জায়গা বলতে গেলে, ভালোবাসা তখনই জন্মায় যে জিনিসটা পারা যায় না, যে জিনিসটা করতে কঠিন লাগে, তা হলো মঞ্চ। মঞ্চে আরো অনেক কিছু দরকার হয়। শুধু কথার মধ্যে ডুবে গেলেই হয় না। প্রতিমুহূর্তে ক্রিয়াশীল হতে হয়। সক্রিয় হতে হয়। এখানে তো একজন হেল্পার আছেন, ডিরেক্টর আছেন। বলবে এখান থেকে একটু সরে যান। না হয় আরেকবার করুন। ছবি বিশ্বাসকে দশবার বলিয়েছিলেন ক্ষুধিত পাষাণে। ওটা একটা রেকর্ড ছবি বিশ্বাসের।

সৌরভ ।। তাহলে কি মঞ্চই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসার?

মনোজ মিত্র ।। ডেফিনেটলি মঞ্চই সবচেয়ে ভালোবাসার।

সৌরভ ।। বর্তমান সময়ে কোন অভিনেতা বা নাট্যকার সম্ভাবনার আলো দেখাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

মনোজ মিত্র ।। এসব বলতে গেলে ঝগড়া ঝাঁটি বাঁধবে না? সবাই মনে করেন যে তিনিই আলো দেখাচ্ছেন। তিনিই একটা ভবিষ্যত। তার আছে, অন্যদের নেই। এখন এরকম অনেক লোকজন আছে। আমাদের ছেলে বেলায় বা শুরু যখন করি বা চিরকালই আমাদের কখনো এরকম কিচ্ছু ছিল না। এখন যেরকম মানুষ (কী বলবো) বড্ড বেশী আত্মসচেতন, আত্ম-আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে। আমার চাই। তা নয়। আগে একটা নাটক ভালো হলে সবাই মিলেই হাততালি দিতাম। সবাই মিলেই তার প্রশংসা করে বেড়াতাম। অরুণ মুখোপাধ্যায় যখন ঐ যে নাটকটা করলেন, নামটা ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, 'জগন্নাথ' করলেন, আমরা সকলে মিলেই তার প্রশংসা করেছি। সবাই মিলেই হইচই পাকিয়েছি। তাকে কেউ আমরা হিংসা করা বা ছোট করা এসব কখনো ভাবতেই পারেনি। আপনি

হয়তো জানেন না আমরা একসময় গোড়ার দিকে 'সাজানো বাগান' নাটকটা করতে পারছিলাম না টাকা পয়সার অভাবের জন্য। প্রথম কিছু দিন, দশ পনেরোটা শো এর পরে ভেবেছিলাম আর করবো না। অরুণ বাবু বললেন, আমি 'জগন্নাথে'র অনেক টাকা পেয়েছি আমি টাকা দিচ্ছি, করুন। এরকম ছিল তো।

সৌরভ ।। নাট্যকার, অভিনেতা না পরিচালক নিজেকে কোনটা হিসেবে দেখতে বেশি ভালো লাগে?

মনোজ মিত্র ।। পরিচালক হিসেবে দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। নাটক লিখতে এবং অভিনয় করতে ভালো লাগে।

সৌরভ ।। আপনি স্বাধীনতা দেখেছেন, দেশভাগ দেখেছেন, দেখেছেন এক বদলে যাওয়া পৃথিবী। আবার বর্তমান সময়ে প্রতিদিন বদলে উঠছে পৃথিবী। এই পরিবর্তিত সময় নাটকে কি প্রভাব ফেলবে?

মনোজ মিত্র ।। নিশ্চয়। নিশ্চয়ই। আজই ফেলবে না। হয়তো দু'দিন বাদে ফেলবে।

সৌরভ ।। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নাট্যপ্রেমী, নাট্যকর্মিদের কাছে আপনার কী বার্তা?

মনোজ মিত্র ।। আমরা তো আমাদের কাজটুকু করছি। বার্তা আর কী হবে? আমাদের কাজই আমাদের বার্তা। দেখুন আমাদের নাটকটা করার কথা ছিল ২৬, ২৭, ২৮ মার্চ। তিন দিন। তো তিনটে নাটক আমরা করবো বলে সমস্ত ঠিকঠাক করলাম। প্রচুর আশা নিয়ে। এই নাটকটা বন্ধ হয়ে গেল আগের দিন। কী করবো মেনে নিতে হলো। এখন কী করি জানেন তো, এই পাঁচ ছ' দিন করলাম। টেলিফোনে রিহার্সাল করলাম। লাইন সবগুলো নিয়ে নেয়। কোনো অভিনেতাকে আটকানো যায় না! আটকানো যায় না। ওরা নিজেদের পার্টটুকু হচ্ছে তারপর বন্ধ করে দিচ্ছে।

সৌরভ ।। আপনার সাথে অনেক সময় কথা বললাম। আপনার মুখ থেকে অনেক কথা জানতে পারলাম। আপনার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি। আপনি ভালো থাকুন এই শুভকামনা রইল।

নাটকের নাম, রচনাকাল, প্রকাশকাল, কোন পত্রিকা, কাদের প্রযোজনা, কোন মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়েছে ক্রমান্বয়ে সাজানো হল
নাট্যকার মনোজ মিত্র : পাঁচ দশক (১৯৫৯-২০০৯)

নাম	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রযোজনা	পত্রিকা	মঞ্চ
মৃত্যুর চোখে জল	১৯৫৯	১৯৬০	সুন্দরম	বিংশ শতাব্দী থিয়েটার	সেন্টার
পাখি	১৯৬০	১৯৬০	বহুরূপী	গন্ধর্ব পত্রিকা	রঙমহল
মোরগের ডাক	১৯৬০	১৯৬১	গন্ধব	গন্ধর্ব পত্রিকা	রঙমহল
নীলকণ্ঠের বিষ	১৯৬১	১৯৬৪	নক্ষত্র	গন্ধর্ব পত্রিকা	রঙমহল
তক্ষক	১৯৬৭	১৯৬৭	—	একাঙ্ক পত্রিকা	—
মহাত্মা	১৯৬২	১৯৬৭	মাস থিয়েটার্স	গন্ধর্ব পত্রিকা	মুক্ত অঙ্গন
নীলা	১৯৬৩	১৯৬৫	ঋতায়ন	বিংশ শতাব্দী	মিনার্ভা
বাতিদান	১৯৬৩	১৯৬৫			বিশ্বরূপা
অশ্বত্থামা	১৯৬৩	১৯৭৮	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	বহুরূপী	রঙ্গনা
ব্ল্যাক প্রিন্স	১৯৬৪	—		গ্রন্থাকারে	বিশ্বরূপা
রঙিন মাছেরা	১৯৬৪	—		গন্ধর্ব পত্রিকা	বিশ্বরূপা
অবসন্ন প্রজাপতি	১৯৬৪	—	ঋতায়ন	—	মিনার্ভা
বেকার বিদ্যালংকার	১৯৬৪	১৯৬৬	—	গ্রন্থাকারে	রঙমহল
আরক্ত গোলাপ	১৯৬৫	—	শিল্পতীর্থ	গ্রন্থাকারে	রঙমহল
সিংহদ্বার	১৯৬৬	১৯৬৬	ঋতায়ন		মুক্ত অঙ্গন
জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ	১৯৬৬	—	মাইমেসিস	গ্রন্থাকারে	—
লোমহর্ষ	১৯৬৭	—	—	—	—
টাপুর টুপুর	১৯৬৭	১৯৭২	আরুণিক	গ্রন্থাকারে	মুক্ত অঙ্গন
কালবিহঙ্গ	১৯৬৮	১৯৬৮	ঋতায়ন	অভিনয় সন্দর্ভ	ইডেন উদ্যান
নেকড়ে	১৯৬৮	—	ঋতায়ন	ছাপা হয়নি	রঙমহল
কামধেনু	১৯৬৯	১৯৭০	ঋতায়ন	অভিনয় দর্পণ	রঙমহল
কোথায় যাবো	১৯৭০	—	রূপচক্র	গ্রন্থাকারে	মিনার্ভা
বাবা বদল	১৯৭০	—	রঙমহল	—	রঙমহল
চাকভাঙা মধু	১৯৬৯	১৯৭১	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	এক্ষণ পত্রিকা	রঙ্গনা
পরবাস	১৯৭০	১৯৭৫	সুন্দরম	—	অ্যাকাডেমি নাট্যমঞ্চ
কেনারাম বেচারাম	১৯৭০	১৯৭৭	প্রতিকৃতি	দেশ পত্রিকা	রঙমহল
আমি মদন বলছি	১৯৭৪	১৯৭৪	—	এপিক থিয়েটার	—
মদনের পঞ্চকান্ড	১৯৭৪	১৯৭৪	—	—	বেতার কেন্দ্র
নরক গুলজার	১৯৭৪	১৯৭৭	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	প্রকাশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
শিবের অসাধ্যি	১৯৭৪	১৯৭৫	—	গ্রন্থাকারে	—
চোখে আঙুল দাদা	১৯৭৬	১৯৭৯	—	একাঙ্ক সংকলন	—
সাজানো বাগান	১৯৭৬	১৯৮০	সুন্দরম	দেশ পত্রিকা	মুক্ত অঙ্গন
দম্পতি	১৯৭৬	১৯৮২	—	সুখসারি	রঙ্গনা

নাম	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রযোজনা	পত্রিকা	মঞ্চ
তেঁতুল গাছ	১৯৭৯	—	—	গ্রুপ থিয়েটার	—
সন্ধ্যা তারা	১৯৭৯	১৯৭৯	—	একাঙ্ক সংকলন	—
মেষ ও রাক্ষস	১৯৭৯	১৯৮০	সুন্দরম্	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
রাজ দর্শন	১৯৮১	১৯৮১	বহুরূপী	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
বাবুদের ডাল কুকুরে	১৯৮১	১৯৮১	—	—	—
কাক চরিত্র	১৯৮২	১৯৮৩	—	মহানগর	—
অলকানন্দার পুত্র কন্যা	১৯৮২	১৯৮৯	নেপথ্যকর্ম	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
নৈশভোজ	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৬	সুন্দরম্	—	রবীন্দ্রসদন
পাকে বিপাকে	১৯৮৫	১৯৮৭	—	গ্রুপ থিয়েটার	শারদীয়া
মহাবিদ্যা	১৯৮৬	১৯৮৬	—	আজকাল পত্রিকা	—
প্রভাত ফিরে এসো	১৯৮৮	১৯৮৮	—	দেশ পত্রিকা	—
কিনুকাহারের থেটার	১৯৮৮	১৯৮৯	বহুরূপী	—	অ্যাকাডেমি
পুঁটি রামায়ণ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০	—	সাপ্তাহিক বর্তমান	—
আঁখি পল্লব	১৯৯০	১৯৯০	স্বপ্ন সন্ধানী	কলকাতা শারদীয়া	শিশির মঞ্চ
স্মৃতি সুধা	১৯৯৩	১৯৯৩	নাগরিক নাট্যায়ন	প্রতিবেদন	—
শোভাযাত্রা	১৯৯০	১৯৯১	সুন্দরম্	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
দর্পনে শরৎশশী	১৯৯১	১৯৯১	নিভা আর্টস	দেশ পত্রিকা	তপন থিয়েটার
টু-ইন-ওয়ান	১৯৯১	১৯৯১	স্বপ্ন সন্ধানী	স্টেটসম্যান	—
দম্ভরঙ্গ	১৯৯২	১৯৯২	সুন্দরম্	পাক্ষিক বসুমতি	গিরিশমঞ্চ
গল্প হেকিমসাহেব	১৯৯২	১৯৯৩	সুন্দরম্	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
বৃষ্টির ছায়াছবি	১৯৯৩	১৯৯৩	—	স্যাস পত্রিকা	বেতার দূরদর্শন
আকাশ চুম্বন	১৯৯৫	১৯৯৫	—	যুগান্তর পত্রিকা	নজরুল মঞ্চ
আত্মগোপন	১৯৯৪	১৯৯৪	অন্য থিয়েটার	শারদীয়া অ্যাকাদেমি	গিরিশ মঞ্চ
দেবী সর্পমস্তা	১৯৯৫	১৯৯৫	—	শারদীয়া আজকাল	—
ছায়ার প্রসাদ	১৯৯৭	১৯৯৭	সুন্দরম্	দেশ পত্রিকা	অ্যাকাডেমি
পালিয়ে বেড়ায়	১৯৯৯	১৯৯৯	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	আনন্দলোক পত্রিকা	—
নাকছাবিটা	২০০০	২০০০	অন্য থিয়েটার	শারদীয়া দেশ	রঙ্গনা
মুন্নি ও সাতচৌকিদার	২০০১	২০০১	সুন্দরম্	শারদীয়া দেশ	রঙ্গনা
কুহুযামিনী	২০০২	—	—	—	—
অপারেশন ভোমরাগড়	২০০৩	২০০৩	সুন্দরম্	শারদীয়া দেশ	মধুসুদন
চমচম কুমার	২০০৩	—	সুন্দরম্	গ্রন্থাকারে	নিরঞ্জন সদন
রঙের হাট	২০০৪	২০০৪	সুন্দরম্	আজকাল পত্রিকা	ভারতীয়ম
জয়বাবা হনুনাথ	২০০৪	২০০৪	রূপান্তর	গণশক্তি	শারদ সংখ্যা
যা নেই ভারতে	২০০৫	২০০৫	সুন্দরম্	শারদীয়া প্রতিদিন	আকাদেমি
ব্রিজের ওপর বাপি	২০০৬	২০০৬	—	শারদীয়া প্রতিদিন	—
রূপের আড়ালে	২০০৬	২০০৬	—	দৈনিক স্টেটসম্যান	—
বনজোছনা	২০০৬	২০০৬	নির্বাক	প্রতীচী	নাটঘর
ওই চাঁদ	২০০৭	২০১১	—	প্রতীচী শারদীয়া	—
ভেলায় ভাসে সীতা	২০০৮	২০০৮	—	দৈনিক স্টেটসম্যান	—
ন্যানসি ও ফ্যানসি	২০০৯	২০০৯	—	চিরসবুজ উৎসব সংখ্যা	—

নাটক	রচনা কাল	পত্রিকায় প্রকাশ	গ্রন্থাকারে প্রকাশ	প্রথম প্রযোজনা	আরও তথ্য
গন্ধজালে	২০১০	পূর্ব পশ্চিম শারদ সংখ্যা ২০১০	১. অষ্টধাতু /কলাভৃৎ পাবলিশার্স ২০১০ ২. নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩		
ওড় পাখি ওড় না	২০১০	চির সবুজ লেখা/উৎসব সংখ্যা/ ২০১০	১. নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩ ২. রাজাগজা দশ মজা/ মিত্র ও ঘোষ ২০১৫		
আশৌর্য লঙ্কাকাণ্ড	২০১০	ব্রাত্যজন নাট্যপত্র শারদীয় ২০১০			ব্রাত্যজন নাট্যপত্র শারদীয় ২০১০-এর সূচিপত্রে 'আশৌর্য রামায়ণ" লেখা আছে। 'আশৌর্য ফান্টসি' এরই পরিমার্জিত রূপ।
ছোট ছোট বাড়ি	২০১০	শারদীয় প্রতিদিন ২০১১	নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩	১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ /অন্য থিয়েটার/নি—বিভাস চক্রবর্তী/মধুসূদন মঞ্চ	পরিমার্জন ২০১৩
ম্যাকাঁও	২০১০	আমার সময় (The Times of India)-র শারদ নিবেদন ২০১১	নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩		
আশৌর্য ফাটুসি	২০১১	প্রাত্যহিক খবর শারদীয় ২০১১		২২ মার্চ ২০১২/ সুন্দরম/ নি-মনোজ মিত্র /মধুসূদন মঞ্চ	'আশৌর্য লঙ্কাকাণ্ড' এর পরিমার্জিত রূপ
ভগীরথের মূর্তি	২০১১	নব পত্রিকা শারদীয় ২০১১	নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩	৩১ মার্চ ২০১২/অন্য থিয়েটার	বিশিষ্ট প্রযোজনা ত্রিতীর্থ (বালুরঘাট) ০৭ মে ২০১৩/ নির্দেশনা—হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
হর্ষ রস রঙ্গ	২০১২	আজকাল শারদ সংখ্যা ২০১২	নাটক সমগ্র ৬/মিত্র ও ঘোষ/২০১৩		দূরদর্শন চিত্রনাট্য রূপে ২০০৮ সালে রচিত হর্ষবর্ধন অ্যান্ড সন্স নামে কলকাতা দূরদর্শনে অভিনীত।
ব্যাঙ্গমা যায় বাণিজ্যে	২০১৪	??	রাজাগজা দশ মজা/ মিত্র ও ঘোষ ২০১৫		
জাদুবংশ	২০১৮	এই সময়/ শারদ সংখ্যা ২০১৪		১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫/সুন্দরম/ নির্দেশনা—মনোজ মিত্র/ ভারত রঙ্গ মহোৎসব/ নয়াদিল্লি	
ভ-এ ভেল্কি	২০১৫	এই সময়/ শারদীয়া ১৪২২ ২০১৫			
দৈবকণ্ঠ	২০২১	আজকাল শারদীয়া ২০২৪		সুন্দরম, ২০২৩	

*** সারণিটিতে ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত। উৎস—মনোজ মিত্রের নাটক : পাঁচ দশক (ড. জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র)**

মনোজ মিত্র অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র (১৯৮০-২০০৯)

ছবির নাম	**পরিচালক**	**মুক্তিকাল**
বাঞ্ছারামের বাগান	তপন সিংহ	১৯৮০
আদালত ও একটি মেয়ে	তপন সিংহ	১৯৮২
ময়না তদন্ত	উৎপলেন্দু চক্রবর্তী	১৯৮২
মোহনার দিকে	বীরেশ চট্টোপাধ্যায়	১৯৮৪
শত্রু	অঞ্জন চৌধুরী	১৯৮৪
গৃহযুদ্ধ	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	১৯৮৪
ঘরে বাইরে	সত্যজিৎ রায়	১৯৮৫
সন্ধ্যা প্রদীপ	অঞ্জন চৌধুরী	১৯৮৫
বৈদূর্য রহস্য	তপন সিংহ	১৯৮৫
আতঙ্ক	তপন সিংহ	১৯৮৬
দাদু নাতি হাতি	নীপ বড়ুয়া	১৯৮৬
পরিণতি	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮৬
কেনারাম বেচারাম	অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮৬
আসুন	ভিক্টর ব্যানার্জী	১৯৮৮
কিডন্যাপ	আবির বসু	১৯৮৮
নয়নমণি	শচীন অধিকারী	১৯৮৯
আবিষ্কার	সলিল দত্ত	১৯৯০
গণশত্রু	সত্যজিৎ রায়	১৯৯০
শেষ আঘাত	জয়ন্ত পুরকায়স্থ	১৯৯০
অন্তরের ভালোবাসা	বিমল রায়	১৯৯১
কাগজের নৌকা	শেখর সরকার	১৯৯১
বৌরাণী	ভবেশ কুন্ডু	১৯৯১
পতিপরম গুরু	বীরেশ চট্টোপাধ্যায়	১৯৯১
প্রেম পূজারী	নন্দন দাশগুপ্ত	১৯৯১
অধিকার	দেব সিংহ	১৯৯২
গুঞ্জন	অমিতাভ ভট্টাচার্য	১৯৯২
পাষণ্ড	পণ্ডিত শিবপ্রসাদ সেন	১৯৯৩
মিষ্টি মধুর	শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৯৩
সন্ধ্যাতারা	প্রভাত রায়	১৯৯৪
হুইল চেয়ার	তপন সিংহ	১৯৯৪

ছবির নাম	**পরিচালক**	**মুক্তিকাল**
আবির্ভাব	পীযূষ দেবনাথ	১৯৯৫
চরাচর	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	১৯৯৫
পতিব্রতা	নিতাই গোস্বামী	১৯৯৫
সংঘর্ষ	হরনাথ চক্রবর্তী	১৯৯৫
পরিক্রমা	শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৯৬
বনফুল	শমিত ভঞ্জ	১৯৯৬
মিস মৈত্রেয়ী	বীরেশ চট্টোপাধ্যায়	১৯৯৬
লাঠি	প্রভাত রায়	১৯৯৬
দামু	রাজা সেন	১৯৯৭
পিতা মাতা সন্তান	স্বপন সাহা	১৯৯৭
বকুল প্রিয়া	স্বপন সাহা	১৯৯৭
ভালোবাসা	শমিত ভঞ্জ	১৯৯৭
মাতৃভূমি	মিলন ভৌমিক	১৯৯৭
সমাধান	নারায়ণ ঘোষ	১৯৯৭
আজব গাঁয়ের আজব কথা	তপন সিংহ	১৯৯৮
শিমূল পারুল	স্বপন সাহা	১৯৯৮
হঠাৎ বৃষ্টি	বাসু চট্টোপাধ্যায়	১৯৯৮
হিংসা	শ্রীদীপ ঘোষ	১৯৯৮
আমার সাথী	সলিল দত্ত	১৯৯৯
আলো	তরুণ মজুমদার	২০০৪
বালিগঞ্জ কোর্ট	পিনাকী চৌধুরী	২০০৭
তিনমূর্তি	রাজা সেন	২০০৮
জানালা	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	২০০৮
লক্ষ্য ভেদ	রাজা মুখোপাধ্যায়	২০০৯

উৎস—মনোজ মিত্রের নাটক : পাঁচ দশক (ড. জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র)

অপার্থিব

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে মনোজ মিত্র অভিনীত নাটকগুলির তালিকা :

নাটকের নাম	নাট্যকার	নির্দেশক	প্রযোজক	মনোজ মিত্রের চরিত্রের নাম
পথের পাঁচালী (১৯৫৮)	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	সুন্দরম	প্রণব
সিঁড়ি (১৯৫৮)	অতনু সর্বাধিকারী	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	সুন্দরম	—
মৃত্যুর চোখে জল (১৯৫৯)	মনোজ মিত্র	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	সুন্দরম	বঙ্কিম
ডাকঘর (১৯৬০)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	সুন্দরম	—
মোরগের ডাক (১৯৬০)	মনোজ মিত্র	শ্যামল ঘোষ	গন্ধর্ব	
নীলকণ্ঠের বিষ (১৯৬১)	মনোজ মিত্র	শ্যামল ঘোষ	নক্ষত্র	
পথের ডাক (১৯৬৩)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়		বিশ্বনাথ চৌধুরী	সুন্দরম
নীলা (১৯৬৫)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	ঋতায়ন	
নেকড়ে (১৯৬৮)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	ঋতায়ন	হুক্কা
পরবাস (১৯৭০)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	গজমাধব
অশ্বত্থামা (১৯৭২)	মনোজ মিত্র	বিভাস চক্রবর্তী	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	যম
নরকগুলজার (১৯৭৪)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	থিয়েটার ওয়ার্কশপ	যম
সাজানো বাগান (১৯৭৬)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	বাঞ্ছারাম
মেঘ ও রাক্ষস (১৯৭৯)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	কঙ্ক
নৈশভোজ (১৯৮৩-৮৪)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	চক্রধর
দম্পতি (১৯৮৫)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	কর্তা
অলকানন্দার পুত্রকন্যা (১৯৮৮)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	বাদল
শোভাযাত্রা (১৯৯০)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	ধনগোপাল

নাটকের নাম	**নাট্যকার**	**নির্দেশক**	**প্রযোজক**	**মনোজ মিত্রের চরিত্রের নাম**
গল্প হেকিমসাহেব (১৯৯২-৯৩)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	ওয়ালী খাঁ
ছায়ার প্রাসাদ (১৯৯৭)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	দ্বৈপায়ন
মুন্নি ও সাতচৌকিদার (২০০১)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	ধৃতিকান্ত
অপারেশন ভোমরাগড় (২০০৩)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	মামাজি
রঙের হাট (২০০৪)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	ফজলু
যা নেই ভারতে (২০০৫)	মনোজ মিত্র	মনোজ মিত্র	সুন্দরম	কুঞ্চকি

——————

উৎস—মনোজ মিত্রের নাটক : পাঁচ দশক (ড. জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র)